

“বিত্ততিত্বশ্বণের উপন্যাসে  
ঐতিহ্য ও আধুনিক চেতনা : একটি পুনর্বিবেচনা”

উপস্থাপক  
অজিত কুমার সিংহ

“পিএইচ. ডি উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা  
সন্দর্ভের সারসংক্ষেপ”

পঞ্জীয়নক্রম : পিএইচ. ডি / ১৬৭ / ২০০৩

তারিখ - ২৯/০৪/২০০৩

তত্ত্বাবধায়ক - ড° বেলা দাস  
বাংলা বিভাগ



আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলং

২০০৭

ভূমিকা :-

বাংলা সাহিত্যের নানা শাখা-প্রশাখার মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাখা হল 'উপন্যাস'। উপন্যাস প্রধানত: নর-নারীর জীবন নির্ভর কাহিনী। তাই উপন্যাসে থাকে মানব জীবনের সুস্পষ্ট অখণ্ডরূপের 'শিল্পিত বিন্যাস' এবং সম-সাময়িক জীবনবোধ। জীবনরস সমৃদ্ধ গল্প রচনা উপন্যাসের মূলকথা হওয়ায় সমকালের বাস্তবতাকে লেখক এড়িয়ে যেতে পারেন না। অর্থাৎ উপন্যাসের মধ্যে ফুটে ওঠে সমকালীন সমাজ ও সময়ের বাস্তব রূপ। আসলে, বর্তমান সমাজ ও সময়ের কর্মপরিধি প্রকাশ করার উপযুক্ত বাহন-ই হল উপন্যাস। উপন্যাসের বিষয় সম্পর্কে ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন-

“উপন্যাসের প্রধান বিশেষত্ব এই যে ইহা সম্পূর্ণ আধুনিক সামগ্রী। পুরাতন যুগের আকাশ বাতাসের মধ্যে ইহার জন্ম সম্ভবপর নয়। আধুনিক যুগের সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে ইহার সম্পর্ক একেবারে ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ।”<sup>১</sup>

উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে বিশেষ করে একটি মৌল বৈশিষ্ট্য এবং এই মৌল বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে প্রধান হল, সাধারণ মানুষের আবেগ, অনুভূতির প্রকাশ ও তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ। বর্তমান সময়ের মানুষ ব্যক্তিত্ববোধে সচেতন এবং তার মননবীক্ষা ধূলা-বালিময় পৃথিবীমুখী। সমাজ ও ধর্মের গতিবদ্ধ পরিসর থেকে মুক্ত হয়ে প্রান্তিকায়িত মানুষের যখন জাগরণ ঘটল, তখন সেই ব্যক্তি স্বাধীনতাবোধে আলোকিত - তার আনন্দ-কষ্টের কাহিনী-ই জায়গা পায় সাহিত্যের নবতর রূপ উপন্যাসের প্রতিবেদনের মধ্যে।

বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের জগতে প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক হলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের পরে বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের জগতে উপস্থিত হলেন রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের মত আরও অনেক ঔপন্যাসিক। তবে বিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে বাংলা সাহিত্যের জগতে নতুন প্রজন্মের একদল ঔপন্যাসিকের আবির্ভাব ঘটে। তাঁদের লক্ষ্য ছিল নিজ নিজ কক্ষপথে ঘুরে জীবনের তাৎপর্য ও রহস্য খুঁজে বের করা। এসব সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রধান হলেন, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সময়ের সাহিত্যিকরা জীবনের নানা রঙে অলঙ্কিত বা অস্বলঙ্কিত দিকে আলো ফেলে তাকে নিরীক্ষণ করতে উৎসাহী হন এবং তাঁরা নানাধরনের বিচরণভূমি থেকে পুনর্নির্মাণের সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করেন। প্রচলিত রীতি-নীতি তথা ঐতিহ্যকে ভেঙে নতুন বয়ন তৈরি করা এসব সাহিত্যিকদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। আর তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিভূতিভূষণ যখন বাংলা উপন্যাসের জগতে পদার্পন করেন তখন বাস্তবতার প্রতিকূলতা-অনুকূলতায় বিক্ষুব্ধ ও বিপন্ন। কারণ, এইসময়ে ভারতবর্ষের শাসনভার ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির হাতে ছিল। ব্রিটিশরা আসার আগে আমাদের সমাজ-ব্যবস্থায় প্রচলিত ছিল সামন্ততান্ত্রিক রীতি-নীতি। এসব রীতি-নীতি আজও আমাদের মানসিকতায় কম-বেশি লালিত রয়েছে। তবে অতীতের এসব রীতি-নীতিকে ঐতিহ্য হিসেবে মেনে নেওয়া যায় না। কারণ, অতীত ও ঐতিহ্য একই নয়; উভয়ের মধ্যে পার্থক্যও রয়েছে। পূর্বে যা চলে গিয়েছে তা-ই অতীত কিন্তু ঐতিহ্য হল পূর্ব থেকে বর্তমান পর্যন্ত দ্ব্যর্থিকতার মধ্যদিয়ে যা কম-বেশি প্রচলিত রয়েছে। ঐতিহ্য কখনও কোনকিছুকে আঁকড়িয়ে ধরে না; নানাধরনের চেতনা সম্পন্ন উপাদান আমাদের ঐতিহ্যে ও সংস্কৃতিতে সহজেই মিশে যায়। ঐতিহ্য কখনও সীমায়িত নয়; অসীম। এজন্যেই সমালোচক ডঃ তপোধীর ভট্টাচার্য বলেছেন-

“এই অসীমতার অক্ষয় ভান্ডার ঐতিহ্য নিশ্চয় এবং ঐতিহ্য’মানে আমরা অতীতে যা হিলাম, কিন্তু তাতে অতীত ও ঐতিহ্য একাকার হয়ে যায় না। আমরা যখন ‘ঐতিহ্য’ শব্দটি প্রয়োগ করি নিশ্চয় তাকে একরৈখিক মনে করি না; বরং মনে রাখি, নিরন্তর স্বপ্নের মধ্যদিয়ে অর্থাৎ দ্বিবাচনিকতা ও সমান্তরাল অপরতার স্বতঃসিদ্ধ স্বীকৃতির মধ্যদিয়ে তার এগিয়ে যাওয়া। তাই অস্বীভূত অতীত ও চিরস্পন্দমান ঐতিহ্য এক কথা নয় কখনো।”<sup>২</sup>

তা থেকে স্পষ্ট, অতীত ও ঐতিহ্যের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মানুষ অতীত থেকে কিছুই সংগ্রহ করতে পারে না। কিন্তু ঐতিহ্য থেকে অনেক সংবিদ সংগ্রহ করতে পারে। তাই মানসিকতা, অভিজ্ঞতা, নিজস্ব প্রয়োজনীয় আত্মিক উপলব্ধি অনুযায়ী ঐতিহ্যের তাৎপর্য নানাধরনের হয়।

আর এই ঐতিহ্যের বিনির্মাণ ঘটে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির হস্তক্ষেপের মধ্যদিয়ে। ব্রিটিশ শক্তি আগমনে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় এক নতুন বার্তার সূচনা ঘটে। কারণ, এই শক্তির তথা সমাজের সভ্যতা, শিক্ষা, সংস্কৃতির সংস্পর্শে বাঙালি সমাজ তথা ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় নতুন চেতনার সূচনা ঘটে। ফলস্বরূপ আমাদের দীর্ঘদিন থেকে লালিত ধর্মবিশ্বাস, সংস্কার, আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-নীতির উপর আঘাত আসে। এই আঘাতের মধ্যদিয়ে ঐতিহ্যের বিনির্মাণ ঘটে। সেই সময়ে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র প্রমুখ ব্যক্তির ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সমাজ সংস্কারে হাত দেন। এঁদেরকে যোগ্যতা সহকারে সাহায্য করেন ডেভিড হেয়ার, ডিরোজিও প্রমুখ ইংরেজ কর্তা ব্যক্তির। অনেক ভারতীয় যুবক এসব কর্তা ব্যক্তির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এইসব যুবকেরা ‘ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠী’ গঠন করে ভারতীয় রীতি-নীতি, সংস্কৃতিকে পরিত্যাগ করে উগ্র ঐতিহ্যবিরোধী হয়ে ওঠে। ঐতিহ্য বিরোধী হওয়ার ফলে সমাজে যে

নতুন পরিসরের সূচনা ঘটে তাকেই আধুনিকতা বলা যায়। আর এই আধুনিকতা ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্কে পরিত্যাগ করেই সমাজে কিংবা সাহিত্যে উপস্থিত হয়। এজন্যেই প্রাবন্ধিক ড: তপোধীর ভট্টাচার্য বলেছেন-

"ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ না ঘটিয়ে নিজেকে কখনো জাহির করে না আধুনিকতাবাদ..।"<sup>৩</sup>

আবার এই আধুনিকতার সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে উপনিবেশবাদের। তাই সমালোচক ড: তপোধীর ভট্টাচার্য বলেছেন-

"আধুনিকতাই ঔপনিবেশিক সমাজের অবভাস হিসেবে গড়ে উঠেছিল। স্করিস্কু সামন্তবাদের সঙ্গে গভীর ব্যবহারিক স্বার্থে পদে পদে আপস করে উপনিবেশবাদ এদেশে ধনতন্ত্রের যে নতুন আদল তৈরি করেছিল, তারই বিচিত্র ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় আধুনিকতার সূচনা।"<sup>৪</sup>

এই আধুনিকতার লক্ষণ হিসেবে দেখতে পাওয়া যায় নানাধরনের সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কাজ, ঐতিহ্যের বিনির্মাণ, প্রতীচ্যের রীতি-পদ্ধতি গ্রহণ ইত্যাদি। আর বাংলা সাহিত্যে এই তথাকথিত আধুনিকতার সূচনা হয়েছে সাধারণত: শ্রীরামপুর মিশন কিংবা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার মধ্যদিয়েই। জনৈক সমালোচকের ভাষায় বলা যায়-

"ফোর্ট উইলিয়ম প্রতিষ্ঠার বছর থেকে আধুনিক পর্বের শুরু, সাহিত্যের ইতিহাসে লেখকেরা অন্তত এভাবেই তাদের সন্দর্ভ তৈরি করেছেন।"<sup>৫</sup>

এভাবেই আমাদের ঐতিহ্যলালিত সন্দর্ভের মধ্যে আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে।

এই সময়ের ঔপনিবেশিক বেড়াঙ্কালকে সহ্য করতে না পেরে তরুণ মন যৌবনের দুরন্ত আবেগে শুধুমাত্র পুরনো মূল্যবোধকে বিনির্মিত করতে চেয়েছিল। তবে এইসব তরুণ লেখক সম্প্রদায় পুনর্নির্মিত মূল্যবোধকে সম্পূর্ণভাবে করায়ত্ত্ব করতে পারেননি। ফলস্বরূপ তাঁদের মানসিকতায় দেখা দিয়েছিল অন্তর্দ্বন্দ্ব। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব-ই হল সমকালীন লেখক সম্প্রদায়ের মানস যন্ত্রণার উৎস। এই দ্বন্দ্ব লেখক বিভূতিভূষণের উপন্যাসেও প্রতিফলিত হয়েছে।

বিভূতিভূষণ হলেন রবীন্দ্রোত্তর যুগের একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক তথা ঔপন্যাসিক। তাঁর জন্ম ১২-ই সেপ্টেম্বর ১৮৯৪ খ্রি: কাঁচড়াপাড়া হালি শহরের কাছে মুরাতিপুর গ্রামে এক মৃত্যু হয় ১ লা নভেম্বর ১৯৫০ খ্রি:। তাঁর সাহিত্য জীবনের সূত্রপাত ঘটে কলেজ পত্রিকার একটি কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার মধ্যদিয়ে। বিভূতিভূষণের প্রথম গল্প 'উপেক্ষিতা' (১৩২৮) প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত

হয়। এটি শুধু তাঁর প্রথম গল্প নয়; এই গল্পে লেখকের মৌলিক চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটে। এই গল্পটি পড়ে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বলেছেন-

"তোমার গল্পটি বড়ই মনোরম হইয়াছে। রচনা যেমন সুললিত; তেমনি  
প্রাঞ্জল।...তুমি চেষ্টা করিলে এ বিষয়ে সুনাম অর্জন করিতে পারিবে।" \*

এরপর তিনি দুইশত উনিশটি (২১৯) গল্প এবং চৌদ্দটি (১৪) উপন্যাস রচনা করেছেন। এ ছাড়াও তিনি ভ্রমণ কাহিনী, কিশোর পাঠ, দিনলিপি ও বিবিধ জাতীয় পাঠকৃতি রচনা করেন।

বিভূতিভূষণ যে চৌদ্দটি উপন্যাস রচনা করেছেন, এগুলি হল 'পথের পাঁচালী' (১৯২৯), 'অপরাজিত' (১৯৩২), 'দৃষ্টিপ্রদীপ' (১৯৩৫), 'আরণ্যক' (১৯৩৯) 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' (১৯৪০), 'বিপিনের সংসার' (১৯৪১), 'দুইবাড়ি' (১৯৪১), 'অনুবর্তন' (১৯৪২), 'দেবযান' (১৯৪৪), 'কেদাররাজা' (১৯৪৫), 'অখৈজল' (১৯৪৭), 'ইছামতী' (১৯৫০), 'দম্পতি' (১৯৫২) ও 'অশনিসংকেত' (১৯৫৯)। 'দম্পতি'কে আমাদের আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। গবেষণা সন্দর্ভের কাঠামো অনুযায়ী বিভূতিভূষণের উপন্যাসগুলিকে পাঁচটি বর্গে বর্ণীকরণ করতে পারি। এই বর্গগুলি হল- (১) ঔপনিবেশিক মনন ও আধুনিক চেতনার অসীমসংসিত দ্বন্দ্বভিত্তিক উপন্যাস : 'আরণ্যক', 'আদর্শ হিন্দুহোটেল', 'অনুবর্তন', 'অশনিসংকেত'; (২) ঔপনিবেশিক মনন থেকে আধুনিক চেতনার উত্তরণ : 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত'; (৩) ঐতিহ্য থেকে আধুনিক চেতনার দিকে অভিযাত্রা : 'দৃষ্টিপ্রদীপ', 'কেদাররাজা', 'ইছামতী'; (৪) কাক্ষিক ও অনাকাক্ষিক জীবনের দ্বন্দ্বভিত্তিক উপন্যাস : 'বিপিনের সংসার', 'দুইবাড়ি', 'অখৈজল'; (৫) বিভূতিভূষণের দৃষ্টির রক্ততামূলক উপন্যাস : 'দেবযান'।

### প্রথম অধ্যায়

ঔপনিবেশিক মনন ও আধুনিক চেতনার অসীমসংসিত দ্বন্দ্বভিত্তিক উপন্যাস : 'আরণ্যক',  
'আদর্শ হিন্দু হোটেল', 'অনুবর্তন', 'অশনিসংকেত'।

ইংরেজি 'colonialism' শব্দের বঙ্গানুবাদ 'উপনিবেশবাদ'। সাধারণত: অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ভাবে কলোনিয়াল শক্তির শাসন, শোষণ, প্রভুত্ব চালানোর নীতিকেই 'উপনিবেশবাদ' বলা যায়। পূর্বে ঔপনিবেশিক শক্তি শাসন প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করলেও বর্তমানে তথ্য-প্রযুক্তি, অর্থনীতি-প্রভৃতির মধ্যদিয়ে তাদের নীতিকে প্রয়োগ করে। এরফলে ঐতিহ্যগত রীতি-নীতির বিনির্মাণ ঘটে। এই বিনির্মাণের মধ্যদিয়েই আবার আধুনিকতার সূচনা। এ জন্যেই উপনিবেশবাদের সঙ্গে আধুনিকতার সম্পর্ক

অতি ঘনিষ্ঠ। সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ থাকলেও আধুনিকতার একটি অর্থ স্বাভাবিকতার বিরোধিতা, সমাজের বিপরীত তাত্ত্বিকতা। সমালোচক ড: তপোধীর ভট্টাচার্যের ভাষায় বলা যায়-

“বিরোধিতা আর আত্মঘাত দিয়ে গড়ে উঠেছে ঔপনিবেশিক আধুনিকতার প্রতিবেদন, প্রতিমূল্যবোধ ও প্রতিবাস্তবতার চাষ হয়েছে সর্বত্র।”<sup>৭</sup>

তবে বিভূতিভূষণ ঔপনিবেশ সৃষ্ট আধুনিকতাকে গ্রহণ করেননি; করেছেন ভারতীয় জীবন দর্শনজাত আধুনিকতাকে। এই আধুনিকতা ঔপনিবেশজাত আধুনিকতারই বিকল্প বিন্দু। বিশেষত: বলা যায়, আধুনিকতা সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব ধারণা ছিল। নিজস্ব ধারণাতেই বিভূতিভূষণ প্রকৃতিকে সাহিত্যের মধ্যে উপস্থাপিত করেছেন।

‘আরণ্যক’ উপন্যাসে রয়েছে এক নতুন ধরনের বয়ন এবং পটভূমি একেবারে বাস্তব আঁধারে রচিত। উপন্যাসের প্রথমেই অতীত ইতিহাসের এবং ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থার কথা রয়েছে। ব্রিটিশরা ভারতবর্ষে আসার পর তাঁদের ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি আমরা আকৃষ্ট হয়ে পড়ি এবং আমাদের মানসিকতারও পরিবর্তন ঘটে। উপন্যাসের নায়ক সত্যচরণ বি.এ পাশ করে কিছুদিন বেকার থাকার পর পূর্ণিয়া জেলায় একটি মহালের ম্যানেজার হিসেবে যোগ দেয়। ঔপনিবেশিক শাসকের মত সেখানে প্রজা বসিয়ে জমিদারী পত্তন করে। সেখানে সত্যচরণ আলাদা ঘরে থাকে এবং অন্য আরেকটি ঘরে থাকেন সাত-আটজন কর্মচারী। ঔপনিবেশিক শাসকের মত সত্যচরণ কর্মচারীদের থেকে একটু আলাদা থাকেন। কিন্তু নায়ক সত্যচরণ কর্মচারীদের থেকে আলাদা থাকলেও গরীব প্রজাদেরকে অত্যন্ত ভালবাসতেন এবং প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে মেলামেশাও করতেন। উপন্যাসিকের ভাষায় বলা যায়-

“কেন জানি না, ইহাদের হঠাৎ এত ভাল লাগিল।”<sup>৮</sup>

ইংরেজি শিক্ষা-সংস্কৃতি নায়ক সত্যচরণের সংস্কারাচ্ছন্ন মনকে বিনির্মিত করে। এই বিনির্মাণ-ই হচ্ছে আধুনিক মানসিকতার পরিচায়ক। তাই নায়কের মনে যেমন রয়েছে ঔপনিবেশিক পরিসর তেমনি রয়েছে আধুনিক মানসিকতা। আর এখানেই স্পষ্ট, উপন্যাসিকের ঔপনিবেশিক মনন ও আধুনিক চেতনার অমীমাংসিত দ্বন্দ্ব।

‘আদর্শ হিন্দু হোটেল’ উপন্যাসে দেখা যায়, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির সংস্পর্শে এসে কিছু ভারতীয় মানুষ স্বাক্ষর-বাণিজ্য করে প্রচুর ধন-সম্পদের অধিকারী হয়ে উঠেন। আবার বাজার-ঘাট ছাড়াও অনেক অখ্যাত স্থানের উন্নতিও ঘটে। ‘আদর্শ হিন্দু হোটেল’ উপন্যাসে বর্ণিত একটি অখ্যাত হোটেলের উন্নতির কথা লেখক এভাবে আমাদেরকে জানান-

“কয়েক বছরের মধ্যে রাণাঘাট রেলবাজারের অসম্ভব রকমের উন্নতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হোটেলটির অবস্থা ফিরিয়া যায়।” ৯

এই ‘উন্নতি’ ঔপনিবেশিক সত্তার উন্নতিত। হোটেলটির একসময়ের কর্মচারী হাজারি ঠাকুর ঔপনিবেশিক শক্তির সংস্পর্শে এসে প্রচুর অর্থের মালিক হন। শুধু অর্থের মালিক নয়, সম্মানীয় ব্যক্তিও হয়ে উঠেন। হাজারি তার জীবনযাত্রার ক্রম উন্নতির দায়ভার রাখাবল্লভ ঠাকুরকেই অর্পণ করে। এমনকি রেলস্টেশনে হোটেল চালানো, সুদূর বোম্বাই যাত্রা, পদ্মঝি-র মানসিক পরিকর্তন-সবকিছুই যেন অদৃশ্য শক্তির অঙ্গুলি হেলনে ঘটে বলেই সে মনে করে। ঔপনিবেশিক শাসন প্রক্রিয়ার মধ্যে থেকেও হাজারি মাঝে মাঝে মুক্ত আকাশের নীচে চূর্ণী নদীর ধারে বসে এই প্রক্রিয়া থেকে মুক্তি পাওয়ার চিন্তায় মগ্ন হয়ে থাকতেন। অথচ সেখান থেকে ফিরে আসাও সম্ভব নয়। এভাবেই ফুটে উঠেছে ‘আদর্শ হিন্দু হোটেল’ উপন্যাসে ঔপনিবেশিক মনন ও আধুনিক চেতনার মধ্যে অমীমাংসিত দ্বন্দ্ব।

‘অনুবর্তন’ উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই, প্রতীচ্যের শিক্ষা-সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে কিছু লোক তাদের ছেলে-মেয়েকে ইংরেজি শেখানোর জন্য ইংরেজ শিক্ষক কিংবা ইংরেজ পরিচালিত স্কুলে ভর্তি করে। তাই উপন্যাসে বর্ণিত ‘মডার্ন ইনস্টিটিউশন’ এর মহিলা শিক্ষক মিস্ সিবসনের কাছে ভাল ইংরেজি শেখার জন্য ছাত্র-ছাত্রীরা যায়। স্কুলের প্রধান শিক্ষক ক্লার্কওয়েল সাহেব অন্যান্য শিক্ষকের সঙ্গে ঔপনিবেশিক শাসকের মত ব্যবহার করেন। অনেকেই তার শাসন প্রণালীর বিরুদ্ধে কথা বললেও শেষপর্যন্ত প্রধান শিক্ষকের মতামতকে মেনে নিতে বাধ্য হন। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধের করাল ছায়া ঔপনিবেশিক শক্তির ভিত্তিকে নাড়িয়ে দেয়। স্কুল শিক্ষক যদুবাৰু, নারায়ণাবাবুর মত ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে। অন্যশিক্ষক ক্ষেত্রাবাবু পুরনো চায়ের দোকানে বসে বসে ভাবেন -

“... আজ কেউ নাই কোনদিকে। সবছত্রভঙ্গ।” ১০

দুর্দুঃখতাপ ক্লার্কওয়েল সাহেবের মত শিক্ষাব্রতীর জীবনে নেমে আসে চরম দুঃবস্থা। আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেকেই শঙ্কিত। যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে হাতে গোনা ছাত্র নিয়ে ক্লাস আরম্ভ হলেও অনেক শিক্ষক আর স্কুলে ফিরে আসেননি। ছাত্র না থাকায় স্কুলের ভবিষ্যৎ যেমন অন্ধকার তেমনি যুদ্ধ ঔপনিবেশিক শাসনের ভিত্তিকেও নাড়িয়ে দেয়। ফলে ঔপনিবেশিক মনন ও আধুনিক চেতনার মেলবন্ধনও থেকে যায় অমীমাংসিত।

‘অশনিসংকেত’ উপন্যাসের জনসমাজ প্রাক-ঔপনিবেশিক জগতের জন সমাজ। এই জনসমাজ যুদ্ধজনিত দুর্ভিক্ষে সর্বহারা হয়ে ধ্বংসমুখে পতিত। ইহামতীর চরে নতুন গড়ে ওঠা গ্রামে প্রাক-ঔপনিবেশিক ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কারপূর্ণ যে সমাজ ব্যবস্থা প্রচলিত তার-ই বাস্তব ছবি এই উপন্যাসে

উপস্থিত। উপন্যাসের নায়ক গঙ্গাচরণ ও তাঁর পরিবার কাপালী-গোয়ালী অধুষিত গাঁয়ের একমাত্র ব্রাহ্মণ পরিবার। ব্রাহ্মণ গঙ্গাচরণ পেশায় ও ব্যবসায় প্রাণিকায়িত মানুষের উপর তাঁর আধিপত্য বজায় রাখে। স্ত্রী অনঙ্গ বৌকে সে বলে-

“রও, সবদিক থেকে বেঁধে ফেলতে হবে ব্যাটাঁদের।... মূলো বেঙন বলো- কোনো

জিনিষের অভাব হবে না।”<sup>১১</sup>

এই গঙ্গাচরণ ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কারেও আবদ্ধ। কিন্তু উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে আমরা দেখতে পাই, তাঁর মনেও দেখা দেয়, এক আধুনিক সত্তা। সে দুর্গাচরণকে বলে-

“যার জমি নেই এ বাজারে, তাকে উপোস করতেই হবে।”<sup>১২</sup>

এমনকি অনঙ্গবৌয়ের অনুরোধে নিম্নবর্ণের নারী মতির দেহ সংস্কার করতেও তাঁরা রাজি হয়। এই একাত্মতার মধ্যেই পরিস্ফুট উপন্যাসটির আধুনিক পরিসর। আর এখানেই স্পষ্ট ফুটে ওঠে ‘অশ্বিনিসংকেত’ উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের ঔপনিবেশিক মানসিকতা ও আধুনিক চেতনার অমীমাংসিত দ্বন্দ্বিক পরিসর।

### দ্বিতীয় অধ্যায়

ঔপনিবেশিক মনন থেকে আধুনিক চেতনার উত্তরণ : ‘পথের পাঁচালী’ ও ‘অপরাজিত’ উপন্যাস।

বিশ্বমন্দাকালীন সময়ে বিভূতিভূষণের ‘পথের পাঁচালী’ (১৯২৯) উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। এসময়ে শহর ছাড়াও বাংলার গ্রামে-গঞ্জে ব্রিটিশ উপনিবেশ ছড়িয়ে পড়ে। শহরে সভ্যতার প্রভাব কম-বেশি গ্রামের মানুষকেও আকৃষ্ট করে। গ্রাম-বাংলার চিরকালীন ঐতিহ্যে ভাঙন শুরু হয়। গড়ে ওঠে কৃষিনির্ভর অর্থনীতির পরিবর্তে ব্রিটিশ পরিচালিত আধুনিক শিল্পব্যবস্থা। এই শিল্পব্যবস্থার অন্তর্গত ছিল চটকল, রেলপথ, টেলিগ্রাফ- এসব কিছু বাংলার কৃষিনির্ভর অর্থনীতির উপর নিজের দখল কয়েম করে।

বিভূতিভূষণের ‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাসটি মূলত: হরিহর রায়ের পরিবারকে কেন্দ্র করেই রচিত। এই পরিবারে রয়েছে হরিহর রায়, সর্বজয়া, অপু, দুর্গা ও ইন্দির ঠাকরণ। ইন্দির ঠাকরণ হলেন হরিহরের দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়। উপন্যাসটির কথা বয়নে রয়েছে তিনটি অংশ-বল্লালী বালাই, আম আঁটির ভেপু, ও অন্ধুর সংবাদ। এই তিনটি অংশ জুড়ে ঔপনিবেশিক শাসন-সমাজ-পরিসর- ইতিহাস ও বিভিন্ন চরিত্রের উল্লেখ থাকলেও মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে প্রকৃতি। উপন্যাসে ইন্দির ঠাকরণের মৃত্যুর মধ্যদিয়েই যেন এক সময় পরিসরের সমাপ্তি ঘটে। এরপরেই মৃত্যু ঘটে হরিহরের মেয়ে দুর্গার। শেষপর্যন্ত হরিহর স্ত্রী-পুত্রকে



নিয়ে শহর কলকাতার উদ্দেশে রওয়ানা দেন। সেখানে আধুনিক জিনিসপত্র, সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে অপু পরিচিত হয়। সে বিদেশ ভ্রমণে যেতে চিন্তা-ভাবনাও করে। পুরোহিতগিরির মত ব্রাহ্মণ্যবাদী চিন্তাধারা থেকে দূরে থাকে। কিন্তু জন্মভিটে নিশ্চিন্দিপুরের কথা, দিদি দুর্গার কথা অপু কখনও ভুলতে পারে না। শহরের ঔপনিবেশিক পরিবেশ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য নিশ্চিন্দিপুরের প্রকৃতির ডাক সে শুনতে পায়-

"নিশ্চিন্দিপুুর তাহাকে দিনে রাতে ডাকে, শাঁখারী পুকুর ডাক দেয় ... দেবী  
বিশলাক্ষী ডাক দেন।" ১০

পথের দেবতার আহ্বানে অপু এগিয়ে যেতে প্রস্তুত হয়। এই এগিয়ে যাওয়াটাই হচ্ছে আধুনিকতায় উত্তরণ-যার পরিস্ফুরণ ঘটে পরবর্তী উপন্যাস 'অপরাজিত' এর মধ্যে। সর্বোপরি আলোচনা করে একথা কলা যায়, 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসে একদিকে ফুটে উঠেছে গ্রাম বাংলার জীবন এবং তার ভাঙনের প্রতিচ্ছবি। অন্যদিকে ঔপনিবেশিক নগরজীবনে আধুনিক জীবন যাপনের হাতছানি। শেষপর্যন্ত ব্যাপক না হলেও আধুনিক চেতনায় উত্তরণের পটভূমি।

'অপরাজিত' বিভূতিভূষণের দ্বিতীয় উপন্যাস। 'পথের পাঁচালী'র মধ্যে আধুনিকতার ছাপ আড়ালে-আবডালে দেখা যায়। বিশেষত 'পথের পাঁচালী'র যেখানে শেষ সেখান থেকে শুরু 'অপরাজিত' উপন্যাসটি। 'পথের পাঁচালী'র নায়ক অপু নিতান্ত শিশু ও নাবালক, কিন্তু 'অপরাজিত' উপন্যাসে সে সাবালক। 'পথের পাঁচালী'র মধ্যে অপুর সাবালক ও নাবালকত্বের সঙ্কলন না থাকলেও 'অপরাজিত' উপন্যাসে এই দুইয়ের সঙ্কলন দেখা যায়। ফলে, 'অপরাজিত' উপন্যাসে অপু এক জটিলতর চরিত্র। নক্ষণীয় বিষয়, এই জটিলতাই অপুকে অসাধারণ করে তুলে।

'অপরাজিত' উপন্যাসে অপু নানা সংগ্রামে জড়িত এবং প্রত্যেক সংগ্রামে সে জয়ীও হয়। অপুর মা সর্বজয়া বর্ণবাদে বিশ্বাসী। তিনি স্নান-আহ্নিক না করে ভাত রান্নাও করেন না। অপু একসময়ে মায়ের প্ররোচনায় পুরোহিতগিরির কাজও করে। কিন্তু আধুনিক নারী লীলার সংস্পর্শে এসে অপুর মন আর বদ্ধ থাকেনি। লীলার দেওয়া বই 'সাগরের কথা' থেকে নানা দেশ-বিদেশের কাহিনী সে জানতে পারে। অপু মায়ের বারণকে উপেক্ষা করে স্কুলে ভর্তি হয়। কলেজের পড়াশুনাও শেষ করে। এরই মধ্যে অপুর মনে গ্রাম নিশ্চিন্দিপুরের কথা বারবার মনে ভাসলেও আর সে পেছনের দিকে ফিরে তাকায়নি। গ্রাম্য মেয়ে অপর্ণাকে অপু বিয়ে করে। তাদের বিয়ের মধ্যদিয়ে যেন গ্রাম-শহরের মিলন ঘটে। অপুর বিভিন্ন চাকুরিরও অভিজ্ঞতা রয়েছে। অপর্ণা গ্রাম্য মেয়ে হলেও দেশ-বিদেশের নানা খবরাখবর রাখে। পুত্র কাজলের জন্মের কিছুদিন পরেই অপর্ণার মৃত্যু ঘটে। একসময়ে অপু পুত্র কাজলকে সঙ্গে নিয়ে নিশ্চিন্দিপুরের প্রকৃতি সন্দর্শনে যায়। তার মাধ্যমে গ্রামেও আধুনিক জীবন যাত্রার আভাস সঞ্চারিত হয়। নগর কেন্দ্রিক জীবন

যাত্রার প্রভাব গ্রামেও গিয়ে পৌঁছায়। এতে একদিকে ধরা পড়েছে লেখকের ঐতিহ্যের প্রতি টান; অন্যদিকে সূচিত হয়েছে গ্রামেও আধুনিক চেতনার উত্তরণ। বস্তুতঃ এই উপন্যাস দুটিতে নায়ক অপূর মানসিকতার ঔপনিবেশিক পরিসর থেকে আধুনিকতায় উত্তরণের প্রতিচ্ছবি লক্ষ করা যায়। আর এটা শুধু অপূর মানসিকতার উত্তরণ নয়; এটা ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণের মানসিকতার উত্তরণ।

### তৃতীয় অধ্যায়

ঐতিহ্য থেকে আধুনিক চেতনার দিকে অভিযাত্রা: 'দৃষ্টিপ্রদীপ' 'কেদার রাজা' ও 'ইছামতী' উপন্যাস।

ঐতিহ্য ও আধুনিকতা সবসময়ই দুটো মেরুতে অবস্থিত। ঐতিহ্য হচ্ছে দীর্ঘদিন থেকে আমাদের সমাজে লালিত বিশেষত: পুরুষাণুধর্মে প্রাপ্ত বিভিন্ন রীতি-নীতি আজও যা পালন করে যাচ্ছি। তবে ঐতিহ্য সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বারবার বিনির্মিত হয়ে সামাজিক স্তরে চালু থাকে। ঐতিহ্যের মধ্যে রয়েছে 'ধারাবাহিকতা, নিশ্চয়তা এবং স্থিতিশীলতা'। কিন্তু এর সম্পূর্ণ বিপরীত হচ্ছে আধুনিকতা। প্রতীচ্যের সংস্পর্শে এসে আমাদের চিরকালীন রীতি-নীতি পুনর্নির্মিত হয় এবং এই পুনর্নির্মিত পরিসরকে আধুনিকতা বলা যায়। আধুনিকতার সাধারণ পরিসর থেকে বিভূতিভূষণের উপন্যাসের পরিসর একটু আলাদা। বিভূতিভূষণ সমাজের গণ্ডি বা ঐতিহ্য থেকে মুক্ত থাকার জন্য বারবার প্রকৃতির কাছে আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি প্রকৃতিকে উপন্যাসের উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেছেন। প্রকৃতিকে আধুনিক দৃষ্টিতে দেখেছেন।

উপনিবেশ শাসিত বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতিতে ইউরোপীয় নবজাগরণের ঢেউ এত সহজ স্রলভাবে প্রবেশ করতে পারেনি। বস্তুত নবজাগরণের ঢেউ বাংলাদেশে আছড়ে পড়লে বাঙালি মানসিকতায় তখনও ঐতিহ্য আর আধুনিকতার দ্বন্দ্ব ছিল। এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব বিভূতিভূষণের সাহিত্যে যেমন প্রতিফলিত হয়েছে তেমনি তা থেকে উত্তরণের ছবিও এই পর্যায়ের উপন্যাসগুলির মধ্যে দেখা যায়। 'দৃষ্টিপ্রদীপ' উপন্যাসটির নায়ক জিতুর মধ্যদিয়ে উপন্যাসিক নিজের মানসিকতাকে পাঠক সমাজের সামনে তুলে ধরেছেন। উপন্যাসটির প্রথমেই দেখা যায়, গ্রাম বাংলার যৌথ পরিবারের সমাজচিত্র। যে সমাজ ছিল সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় আবদ্ধ।

ইংরেজদের আগমনে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ভাঙন শুরু হয়। যৌথ পরিবারের কাঠামো ভেঙে গড়ে ওঠে আত্মপরায়ণ স্বতন্ত্র পরিবার। এসব পরিবারে আগ্রিত মানুষদেরকে অনেকেই পরগাছা হিসেবে মনে করত। চা বাগানের প্রাক্তন কর্মচারী ভূষণবাবু ও তার স্ত্রী, পুত্র-কন্যাদেরকে নিয়ে সম্পর্কিত ভাইয়ের বাড়িতে আশ্রয় নেন। ফলস্বরূপ, তাদের সহ্য করতে হত নানা লাঞ্ছনা-গজনা। ভূষণবাবুরা

আধুনিক শিক্ষা-সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত থাকার ফলে গ্রাম্য সংস্কারকে মেনে নিতে পারেন না। তাই সংস্কারের উদ্দেশ্য থাকেন ভূষণবাবুর সমস্ত পরিবারই। জিতু তার জ্যাঠাইমাদের পূজো-অর্চনার চেয়ে কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' কে উপযুক্ত ধর্মগ্রন্থ বলে মনে করে। এমনকী বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত মালতী ধর্মীয় গোড়ামির উদ্দেশ্য ওঠে লেখা-পড়া শিখে। জিতু ও মালতীর মধ্যে প্রেমের সম্পর্কও গড়ে ওঠে। তবে শেষপর্যন্ত জিতু হিরন্ময়ী নামে এক ছাত্রীকে বিয়ে করে সংসার গড়ে তুলে। হিরন্ময়ী সামাজিক রীতিকে বিনির্মাণ করে শিক্ষক জিতুকে বিয়ে করে আধুনিকতার পরিচয় দেয়। প্রতীচ্যের ভাবধারায় পরিপুষ্ট জিতু তথা ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ নারীর প্রেমকে মর্যাদা দিয়ে আধুনিক মানসিকতার পরিচয় দেন। আর এখানেই 'দৃষ্টিপ্রদীপ' উপন্যাসের পরিসর ঐতিহ্য থেকে আধুনিকতার দিকে অভিযাত্রা করে।

'কেদার রাজা' উপন্যাসের প্রথমেই রয়েছে গ্রামীণ ঐতিহ্যনির্ভর জমিদারদের যৌথ মালিকানা স্বত্ব নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদের কথা। এছাড়াও রয়েছে জমিদার কর্তৃক প্রজাদের শোষণ ও শাসন করার কথা। কেদার এই উপন্যাসের নায়ক। শুধু নায়ক নয়; সে লুপ্তপ্রায় একটি রাজবংশের একমাত্র পুরুষ সদস্য। ব্রিটিশ পর্বে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চাকুরির প্রতি ঝোঁক ছিল প্রবল। কিন্তু কেদার দুঃখ-কষ্টের মধ্যদিয়ে জীবন অতিবাহিত করলেও চাকুরি গ্রহণ করেনি। অন্যের অধীনে চাকুরি করা কেদারের রাজবংশের ঐতিহ্যবিরোধী কাজ ছিল। কিন্তু উপন্যাসের শেষপর্যায়ে আমরা দেখি কেদার বিশেষ পরিস্থিতির জন্য চাকুরি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। রাজলক্ষ্মী, শরৎসুন্দরী-এসব নারী নিজ নিজ ক্ষেত্রে নারীব্যক্তিত্বকে তুলে ধরেছে। রাজলক্ষ্মী নিজের বিয়েতে সখিসম বিধবা শরৎসুন্দরীকে আমন্ত্রণ জানিয়ে বলে-

"তোমার মত মানুষ আমার বিয়েতে গিয়ে দাঁড়ালে আমার অকল্যাণ হবে না

শরৎসুন্দরী।" ১৪

শরৎসুন্দরীকে বিয়েতে উপস্থিত থাকার অনুরোধ জানিয়ে রাজলক্ষ্মী চিরাচরিত প্রথাবদ্ধ গড়িকে অতিক্রম করে আধুনিক মানসিকতার পরিচয় দেয়। উপন্যাসের বিভিন্ন কুশীলব নিজ ব্যক্তিত্বকে স্বাধীনভাবে তুলে ধরে কিংবা পুরনো ঐতিহ্যকে বিনির্মাণ করে নতুন মানসিকতার পরিচয় দেওয়ার মধ্যেই ফুটে ওঠে 'কেদার রাজা' উপন্যাসের আধুনিকতার পরিসর।

'ইছামতী' উপন্যাসের পটভূমিকায় রয়েছে একটি নদীর কথা। এই নদীটি কোথায় থেকে আরম্ভ হয়েছে এবং কোথায় শেষ হয়েছে নদীতীরবর্তী যশোর অঞ্চলের মানুষ খবর রাখে না। নদীটি ভাঙন-গড়নের মধ্যদিয়ে নিজের ঐতিহ্য বজায় রেখেছে। ব্রিটিশরা মোরাহাটিতে নীলচাষ আরম্ভ করার পর

সেখানকার ঐতিহ্যলানিত সমাজের বিনির্মাণ ঘটে। ইংরেজ শিপ্টন সাহেবকে এই অঞ্চলের মানুষ যেমন ভয় করে তেমনি ঘৃণাও করে। কিন্তু তার আধিপত্য সবাই স্বীকার করে নেয়। ইংরেজদের আধিপত্য স্বীকার করলেও তাঁদের সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রভাবে বাঙালির জাতিভেদ প্রথা, আচার-নিষ্ঠা, চাল-চলন সবকিছুর-ই পরিবর্তন ঘটেতে শুরু হয়। ভবানীবাবুর কাছে শ্রী তিলুর বিদ্যা-শিক্ষা অর্জন, নালু পালের বাড়িতে ব্রাহ্মণ ভোজন, কড়ির পরিবর্তে তামার পয়সার ব্যবহার, স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে দিনের বেলায় পাড়াপাঁয়ের মধ্যদিয়ে হেঁটে যাওয়া, নিস্তারিণীর গোপন প্রেম, ভবানীর পুত্র রাজেশ্বরের ইংরেজি পড়াশুনার ইচ্ছা- এসবই আধুনিকতার নামান্তর। উপন্যাসের শেষপর্যায়ে এসে আমরা দেখি, নীলকুঠির বড় সাহেবের গোরস্থানে দুইবর্ণের নর-নারী প্রসন্ন ও গয়ামেমের মিলন। এই মেলবন্ধন এক নতুন যুগের বার্তাবাহক। কলা যায়, উপন্যাসের পরিসর ঐতিহ্য থেকে আধুনিকতার দিকে অভিযাত্রার পরিচায়ক।

### চতুর্থ অধ্যায়

কাজিকত ও অনাকাজিকত জীবনের দ্বন্দ্বভিত্তিক উপন্যাস : 'বিপিনের সংসার' 'দুইবাড়ি', ও 'অবৈজল'।

ব্রিটিশ রাজশক্তির প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ হস্তক্ষেপে আমাদের পুরনো মূল্যবোধ, রীতি-নীতি, চাল-চলন, এমনকি অর্থনীতির বনিয়াদে পরিবর্তন ঘটে। মূলতঃ গ্রামীণ সমাজের পারিবারিক কাঠামোও ভাঙন ধরে। এই ভাঙনের মধ্যদিয়ে গড়ে ওঠে নতুন মূল্যবোধ। নতুন মূল্যবোধে বিশ্বাসী মানুষের আকাঙ্ক্ষার পরিধিও বৃহৎ হয়ে ওঠে। তবে অনেক সময় তাদের আকাঙ্ক্ষার পরিধিও অসম্পূর্ণ থাকে। আবার অনেক সময় জীবনে ঘটে যায় অনেক অনাকাজিকত ঘটনা। 'বিপিনের সংসার' উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই, নায়েব বিপিনের সঙ্গে জমিদার অনাদিবাবুর মেয়ে মানীর অবৈধ প্রেমের সম্পর্ক ছিল। কিন্তু সামাজিক অসাম্যের জন্য তাদের প্রেম পূর্ণ রূপ পায়নি। মানীর বিয়ে হয় অন্য এক পুরুষের সঙ্গে। বিপিনের কাজিকত প্রেম জীবনে থেকে যায় অনাকাজিকত। মানীর মত শান্তিও বিপিনকে ভালবাসে। কিন্তু বিপিন সামাজিক প্রতিকূলতার কথা ভেবেই শান্তির কাছ থেকে পালিয়ে আসে। প্রকৃতপক্ষে ঐতিহ্যের পরিসরে আত্মসমর্পণ করার ফলেই এই উপন্যাসের কোনও কুশীলব-ই মনের আকাঙ্ক্ষাকে পরিপূর্ণ করতে পারেনি। তাদের জীবনে ঘটেছে অনেক অনাকাজিকত ঘটনা। এভাবেই ধরা পড়ে 'বিপিনের সংসার' উপন্যাসে পাত্র-পাত্রীর কাজিকত ও অনাকাজিকত জীবনের দ্বন্দ্ব।

'দুইবাড়ি' উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই, কুড়ুলগাছির বিশিষ্ট ব্যক্তি রামতারণবাবুর বিরুদ্ধে নাছ ব্যকসায়ী ছনু কাছারীর নায়েকের কাছে নালিশ জানায়। নায়েক কর্তৃক রামতারণবাবু তিরস্কৃত হন। তিরস্কৃত হয়ে তিনি ভাবেন-

“কালে কালে সবই সম্ভব হইয়া উঠিল” ১৫

সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবন পরিসর, আকাঙ্ক্ষা সবকিছুরই পরিবর্তন ঘটে। বিনির্মিত জীবন পরিসরে অশেষসংখ্যক সমাজ ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে আধুনিক জীবন প্রবাহের দিকে এগিয়ে যায়। নিম্ন শ্রেণীভুক্ত নায়েব কিংবা ছনুর কাছে তিরস্কৃত হওয়া রামতারণবাবুর কাছে ছিল একেবারেই অনাকাঙ্ক্ষিত। এছাড়াও আমরা দেখতে পাই, রামতারণবাবুর বন্ধু যদুবাবু মোক্তারি করে আদালত থেকে পকেট পুরে টাকা-পয়সা উপার্জন করেন। তাই রামতারণবাবু অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ছেলে নিধুকে মোক্তারি করতে আদালতে পাঠান। কিন্তু নিধু আদালতে তেমন মক্কেল ধরতে পারে না। নিধু নিজগ্রামের প্রতিবেশি জজ সাহেবের কন্যা মঞ্জুকে মনে প্রাণে ভালবাসলেও তাদের ভালবাসা জীবনে পরিপূর্ণতা পায়নি। এভাবেই এই উপন্যাসের বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর কাল্পনিক জীবনে ঘটে যায় অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা।

‘অখৈজল’ উপন্যাসের নায়ক শশাঙ্ক ছিলেন একজন নামী ডাক্তার। একসময়ে তিনি ঔষধ প্রেম ভালবাসাকে অত্যন্ত ঘৃণা করতেন। তিনি ছিলেন ঐতিহ্যে বিশ্বাসী। বালবিধবা মেয়ে শান্তির সঙ্গে রামপ্রসাদের ঔষধ সম্পর্কের বিষয় নিয়ে গ্রাম্য বিচার সভায় উপনিবেশিক শাসকের মতই শশাঙ্কবাবু বিচারকের ভূমিকা পালন করেন। কিন্তু তিনিও একদিন খেমটাওয়ালী পান্নার প্রেমে মজে যান। পান্নার প্রেমে আসক্ত হয়ে সতী-সাক্ষী স্ত্রী সুরবালাকে মন থেকে প্রায় সরিয়ে দেন। কিন্তু এই পান্নাও কিছুদিন তার সঙ্গে একত্রে বসবাস করে অন্যত্র চলে যায়। শশাঙ্ক কোনদিন ভাবেননি তার জীবন পরিসরে এসব ঘটনা ঘটবে। এরই মধ্যে সুরবালাও কোথায় যেন হারিয়ে যায়। শশাঙ্কের কাল্পনিক দাম্পত্য জীবন থেকে যেমনভাবে সুরবালা হারিয়ে গিয়েছে, ঠিক তেমনি অনাকাঙ্ক্ষিত ভাবে পান্নাও তার জীবন পরিসর থেকে হারিয়ে যায়। উপন্যাসের অন্তিম পর্যায়ে শশাঙ্ক যেন তাই ‘অখৈজল’ এ।

### পঞ্চম অধ্যায়

বিভূতিভূষণের উপন্যাসে দৃষ্টির রুদ্ধতা: দেবযান।

বিভূতিভূষণ সর্বমোট যে কয়েকটি উপন্যাস রচনা করেছেন, এগুলির মধ্যে ‘দেবযানের’ অন্যতম স্থান দশম। উপন্যাসটি রচনার প্রাক-পর্বে বিভূতিভূষণ অনেক চিন্তা-ভাবনা করেছেন, তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় বিভিন্ন পত্র-দিনলিপির মধ্যে। বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন অভিজ্ঞতাকে একত্রিত করে মৃত্যুলোকের অবস্থান নিয়ে বিভূতিভূষণ ‘দেবযান’ উপন্যাসটি রচনা করেন। ‘দেবযান’ উপন্যাসটি ‘দেবতার ব্যাখ্যা’ নামক রচনার রূপান্তরিত রূপ। তাঁর রচনায় সমকালীন উপকরণের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অনাধুনিক,

অলৌকিক, অসম্ভব ও ঐতিহ্যবোধ। বিশেষতঃ যাকে আমরা উপন্যাসিকের দৃষ্টির রুদ্ধতা হিসেবে আখ্যায়িত করেছি।

‘দেবযান’ বিভূতিভূষণের এক বিতর্কমূলক উপন্যাস। মৃত্যু পরবর্তী সময়ে মানুষের আত্মার অবস্থান ও অস্তিত্বের বিষয়ই উপন্যাসটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। তিনি আধুনিক যুগের লেখক হয়েও ধর্মীয় রীতি-নীতির সীমাবদ্ধতার তার গভিকে অতিক্রম করতে পারেননি। তাই, তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে বারবার ফুটে উঠেছে অলৌকিকতার পরিসর। ‘দেবযানের’ মূল বিষয়বস্তুই প্রেতলোকের কাহিনী। মৃতুলোকের পারে প্রত্যেক আত্মাই কম-বেশি অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। এসব আত্মারা আধুনিক শহর-নগরের ক্রোদাত্ত পরিবেশ থেকে দূরে থাকতে চায়। জনৈক এক মহাপুরুষ বলেন-

“আমি পৃথিবীতে যাই, জনপদে বা তোমাদের বড় বড় নগরে যাই না।” ১৬

উপন্যাসের প্রধান চরিত্র যতীন উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও ধর্মীয় গণ্ডিবদ্ধ জীবনের বাইরে বের হতে পারেনি। যতীন বিশ্বাস করে, পৃথিবীর মায়া ও মোহ পরিত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন বলেই মানুষকে মৃত্যুর পরেও আবার জন্ম নিতে হয়। এই বিশ্বাস শুধু নায়ক যতীনের নয়; তা হল উপন্যাসিক বিভূতিভূষণেরও। আসলে আধুনিক যুগের আধুনিক উপন্যাসিক হয়েও সংস্কার, ঐতিহ্য, অসম্ভব, কল্পনা প্রসূত বিষয় নিয়ে রচিত ‘দেবযান’ উপন্যাসটি লেখকের রুদ্ধ দৃষ্টির বা রুদ্ধ মানসিকতারই পরিচায়ক।

### উপসংহার

বিশশতকে বাংলার ঔপনিবেশিক রাজশক্তির করাল গ্রাস থেকে মুক্তির জন্য সমকালীন লেখক সম্প্রদায় বিভিন্ন পথ অবলম্বন করেন। সেই সময়ে কিছু লেখক রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী হয়ে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে ঔপনিবেশিক শক্তির বিরোধিতায় নেমে পড়েন। অনেকে আবার ঔপনিবেশিক শক্তির সহযোগিতায় ঔপনিবেশিক আধুনিকতাকে গ্রহণ করে নতুন সমাজ গঠনে মনোনিবেশ করেন। কেউ করেন ঐতিহ্যের স্বীকৃতি, কেউ করেন ঐতিহ্যের পুনর্নির্মাণ। আরেকদল সাহিত্যিক রোমান্টিক জগতে ডুব দেন। উপন্যাসিক বিভূতিভূষণ সে পথের পথিক না হয়ে এক স্বতন্ত্র ধারার সৃষ্টি করেন। তৎকালীন সময়ের ঔপনিবেশিক শক্তির করাল ছায়া, আধুনিকতা ও ঐতিহ্যকে স্বীকার করেও বিভূতিভূষণ গ্রাম বাংলার প্রকৃতির কাছে আশ্রয় নেন। প্রকৃতিই তাঁর উপন্যাসের মূল চাবিকাঠি এবং প্রকৃতির মধ্যে তিনি খুঁজে পান মুক্তির দ্যোতনা। তাঁর আধুনিকতার পরিসরকে প্রকৃতিই চিহ্নিত করেছে।

বিভূতিভূষণের উপন্যাসের কথাবয়নে সমকালীন সমাজ-বাস্তবতা অর্থাৎ উপনিবেশ ও ঔপনিবেশিক মনন, আধুনিকতা, ঐতিহ্যপ্রীতি সমানতালে পরিস্ফুট। উপন্যাসের বয়নে ঔপনিবেশিক

চেতনা থেকে আধুনিকতার পথে যাত্রা করলেও তাঁকে অনেক সময় মাঝপথে থমকে দাঁড়াতে হয়েছে। অনেক সময় দীর্ঘদিনের প্রচলিত সংস্কার রীতি-নীতি তথা ঐতিহ্যকে বিনির্মাণ করে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টাও করেছেন। এই প্রচেষ্টায় সফলতা থাকলেও বিফলতার সংখ্যাও কম নয়। সংস্কারের গতিতে অতিক্রম করতে না পেরে রুদ্ধ মানসিকতারও পরিচয় দিয়েছেন। সর্বোপরি আলোচনা সাপেক্ষে কলা যায়, ঔপনিবেশিক পরিসর এক তা থেকে মুক্তির প্রয়াস, ঐতিহ্য ও আধুনিকতার দ্বন্দ্ব, আধুনিক মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তি হয়েও ধর্মীয় সংস্কারকে অতিক্রম করতে না পারা-এসবই ছিল বিভূতিভূষণের উপন্যাসের কথাবয়নের মূল বিষয়বস্তু। এই বহুৈখিকতাকে স্বীকার করেই বিভূতিভূষণের উপন্যাসগুলিকে এক তাঁর মানসিকতার স্বরূপকে মূল্যায়ন করা হয়েছে। সবশেষে আমরা বলতে পারি, বিভূতিভূষণ যেমন আধুনিক মননের পরিচয় রেখেছেন তার সাহিত্যে তেমনি খুব স্বাভাবিক ভাবেই ফিরে দেখেছেন ঐতিহ্যকে। এজন্যেই কলা যায়, বিভূতিভূষণ সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আধুনিকতার পথে যাত্রা করেও ঐতিহ্যের শেকড় সজ্ঞানী।

## উল্লেখপত্রঃ -

- ১। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, ১৯৯২, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ ,  
কল - ৭৩ , পৃঃ ১
- ২। তপোধীর ভট্টাচার্য : আধুনিকতা : পর্ব থেকে পর্বান্তর, ১৯৯৫, পুস্তক বিপণি,  
কল-৯, পৃঃ ৫১
- ৩। তদেব : পৃঃ ১৯৩
- ৪। তদেব : পৃঃ ১৩
- ৫। তদেব : পৃঃ ১১
- ৬। সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায় : 'বিভূতিভূষণ : জীবন ও সাহিত্য' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত , ১৯৯৫, সাহিত্যায়ন,  
কল - ৯, পৃঃ ১৮
- ৭। সমীর রায়চৌধুরী (সম্পাদিত) : হাওয়া - ৪৯, 'ঔপনিবেশিক মূল্যবোধ : একটি প্রস্তাবনা'-  
তপোধীর ভট্টাচার্য , পৃঃ ৮৯
- ৮। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিভূতি রচনাবলী - জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ (৫ম খণ্ড) , ১৪০৩,  
মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স
- ৯। " : বিভূতি রচনাবলী- জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ (৪র্থ খণ্ড) ১৪০৩,  
মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স , পৃঃ ৩
- ১০। " : বিভূতি রচনাবলী-জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ (৭ম খণ্ড) , ১৪০৪,  
মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স , পৃঃ ১৩৩
- ১১। " : বিভূতি রচনাবলী জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ (১০ম খণ্ড), ১৪০৪,  
মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স , পৃঃ ৬
- ১২। তদেব : পৃঃ ৭৯
- ১৩। " : বিভূতি রচনাবলী-জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ (১ম খণ্ড) , ১৪০১,  
মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স , পৃঃ ১৭৯





- বন্দ্যোপাধ্যায় , পার্থপ্রতিম : উপন্যাস রাজনৈতিক : বিভূতিভূষণ , ১৯৯২, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন,  
কল - ৯
- ভট্টাচার্য, তপোধীর : আধুনিকতা : পর্ব থেকে পর্বান্তর , ১৯৯৫, পুস্তক বিপণি ,  
কল - ৯
- ভট্টাচার্য, তপোধীর : প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব , ১৯৯৭, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ ,  
মেদিনীপুর - ০১
- .. : বাথতিন তত্ত্ব ও প্রয়োগ , ১৯৯৬ , পুস্তক বিপণি ,  
কল - ৯
- ভট্টাচার্য, সুতপা : কথা সাহিত্যের একলা পথিক বিভূতিভূষণ , ১৯৯৫ , পুস্তক বিপণি,  
কল - ৯
- রায় , সতেন্দ্রনাথ : বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা , ২০০০ , দে'জ পাবলিশিং ,  
কল - ৭৩
- রায়চৌধুরী , গোপিকানাথ : বিভূতিভূষণ : মন ও শিল্প , ১৯৯৬, দে'জ পাবলিশিং ,  
কল - ৭৩
- রায়চৌধুরী, সমীর (সম্পাদিত) : 'পোস্টকলোনিয়ালিজম : উত্তরঔপনিবেশিকতা' , ১৯৯৬,  
হাওয়া উনপঞ্চাশ প্রকাশনী , কল - ৭০
- সেন , অরুণ (সম্পাঃ) : বিভূতিভূষণ : আধুনিক জিজ্ঞাসা , ২০০৩ , সাহিত্য অকাদেমি ,  
কল- ৫৩
- সেন, রুশতি : বিভূতিভূষণ : দ্বন্দ্বের বিন্যাস, ১৯৯৩, প্যাপিরাস
- সেন, সুনীল ও প্রদীপ সিংহ : বাংলার আর্থিক ও সামাজিক ইতিহাস, ১৯৭৪, চ্যাটার্জী পাবলিশার্স,  
কলকাতা
- হাসান, বদরুল : উনিশ শতক : নবজাগরণ ও বাংলা উপন্যাস , ১৯৯০,  
জগৎমাতা পাবলিশার্স , কল - ৯

বিভূতিভূষণের উপন্যাসে  
ঐতিহ্য ও আধুনিক চেতনা : একটি পুনর্বিবেচনা

পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য প্রদত্ত  
গবেষণা সন্দর্ভ  
আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর  
ফেব্রুয়ারি, ২০০৭

অজিত কুমার সিংহ

# ASSAM UNIVERSITY, SILCHAR

## DEPARTMENT OF BENGALI



### TO WHOM IT MAY CONCERN

*This is to certify that Sri Ajit Kumar Singha, Ph.D. Registration No. Ph.D/167/2003, Date 29-04-2003 has prepared his dissertation entitled, "Bibhutibhusaner Upanyase Aitijhya O Adhunik Chetana : Ekṭi Punarbibechna", under my supervision for the award of Ph.D. Degree by Assam University. I further testify that Sri Ajit Kumar Singha has faithfully followed provisions of the relevant Assam University Ordinance. His thesis is an original work and the result of sustained academic pursuits. Hence I recommend and forward the above mentioned thesis for adjudication by the Board of Examiners.*

**Dr. (Mrs.) Bela Das**  
Supervisor  
Deptt. of Bengali  
Assam University, Silchar

## প্রাক্কথন

সাহিত্য সমাজের দর্পণস্বরূপ। তাই সাহিত্যে সমাজের প্রতিফলন ঘটে। আমাদের মনে রাখা একান্ত প্রয়োজন, মানবজীবনকে নিয়ে সমাজ গঠিত এবং মানুষের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটান পর সমাজের পরিবর্তন ঘটে। এবং এই পরিবর্তন ঘটাই স্বাভাবিক। আবার সমাজ বা বিশ্বপট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের আঙিনায় যতসব শাখা-প্রশাখা রয়েছে সেগুলিরও পরিবর্তন ঘটে।

উনিশ শতকে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে যেমন পরিবর্তনের ঢেউ লাগে, তেমনি উনিশ শতকের শেষভাগ থেকেই সমগ্র বিশ্বে এক আমূল পরিবর্তনের সাড়া পড়ে যায়। বিশেষতঃ রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিসরের দ্রুত পরিবর্তন শুরু হয়। এই সময়েই প্রতীচ্যে ঘটে শিল্পবিপ্লব, গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার প্রসার। সর্বোপরি মার্ক্সীয় তত্ত্ব, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার প্রাক-মুহূর্তের অস্থিরতা মানব সমাজে পরিবর্তন আনে। অন্যদিকে মনোজগতেও এক বিশাল আলোড়নের সৃষ্টি করে।

বিশ্বের এই ভাঙা-গড়ার প্রভাব আমাদের বাংলাদেশের উপরও পড়ে। বাংলাদেশে ঔপনিবেশিক শাসক সম্প্রদায়ের শিক্ষা-সংস্কৃতির সংস্পর্শে এবং বিশ্ব আলোড়নের প্রভাবে আমাদের ঐতিহ্যগত ধ্যান-ধারণার কাঠামোরও পরিবর্তন ঘটতে শুরু হয়। আমাদের চিন্তা-চেতনার পরিসরে জেগে উঠতে থাকে নতুন নতুন ভাবনা। তবে নতুন চিন্তা-ভাবনার জন্ম নিলেও সম্পূর্ণভাবে ঐতিহ্যকে পরিত্যাগ করতে পারেনি বাংলাদেশের জনসমাজ। ফলে

বাঙালি মনন-বীক্ষায় দেখা দেয় নতুন চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে ঐতিহ্যের দ্বন্দ্ব।

ঔপনিবেশিক সমাজ পরিসরেই বাংলাদেশে আধুনিকতার সূত্রপাত হয়। ফলে মানব মনের মণিকোঠায় লুকিয়ে থাকে 'ঔপনিবেশ' নামক এক আগ্রাসী মনোভাব। এ সব হাওয়া বাংলা সাহিত্যের আঙিনার প্রতিটি শাখাকে নতুন রূপে নতুনভাবে নির্মিত করে। সাহিত্যের আধুনিকতম শাখা উপন্যাসও এর ব্যতিক্রম নয়। নতুন সময়ের নতুন পরিসরে সৃষ্টি হয় নতুন জীবনদর্শন। নতুন জীবনদর্শনের প্রভাব অশেষবাসী নারীসমাজের মধ্যেও পড়ে। নারী তার নিজ অধিকার আদায় করতে সচেষ্ট হয়। যদিও অনেক ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা ততোপাখির মত। তবে এরজন্য দায়ী পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা। এই সময়ে নর-নারীর সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও বিনির্মাণ ঘটে। মানুষের যৌন আকাঙ্ক্ষা ও অনুভূতিই সমস্ত সম্পর্কের ভিত্তি রচনা করে। বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারের ফলে মানুষ অলৌকিকতা, ধর্ম, ভগবান, ভূত, আত্মা ও ভালবাসার প্রতি পুরনো বিশ্বাসকে হারিয়ে ফেলে। বিভূতিভূষণ বিস্ত্র পরাদৃষ্টির মাধ্যমে অনুভব করে রচনা করলেন স্বর্গের এক কল্পলোকের কাহিনী। আধুনিক যুগে আধুনিক মানসিকতা নিয়ে বিভূতিভূষণ উপন্যাস রচনা করলেও অন্যান্য আধুনিক সাহিত্যিকদের থেকে আলাদা। তিনি ঔপনিবেশিক জাল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য শান্ত-স্নিগ্ধ প্রকৃতির কাছে আশ্রয় নেন। প্রকৃতিই তাঁর উপন্যাসে আধুনিক পরিসরের সৃষ্টি করে।

দীর্ঘ-জীর্ণ, অস্থির সমাজে, অস্থির পরিস্থিতিতে বাংলা সাহিত্যে নতুন যুগের সূচনা ঘটলেও ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ ছিলেন একটু স্বতন্ত্র। সমাজের সর্বশ্রেণীর মানুষের কথা তাঁর সাহিত্যিক প্রতিবেদনে স্থান পেয়েছে। ঔপনিবেশ, ঔপনিবেশিক মনন, ঐতিহ্য, আধুনিকতা, যুদ্ধোত্তর সমাজের অভাব-অনটন, হতাশা-ব্যর্থতা, বেকারত্ব, মূল্যবোধের অবক্ষয়, ব্যবসায়ীদের

কালোবাজারি, রাজপুত ও জমিদার শ্রেণীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, ঈশ্বরভাবনা ও অলৌকিকতা, প্রকৃতি, মানুষের কাঙ্ক্ষিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত জীবন পরিসর এসব কিছু তাঁর উপন্যাসের মূল বিষয়। ঔপনিবেশিক পরিস্থিতিতে নতুন জীবনদর্শন তথা আধুনিকতা, নতুন সমাজ ও মূল্যবোধের সঙ্গে ঐতিহ্যের দ্বন্দ্ব ও উত্তরণ, ধর্মীয় গোঁড়ামির প্রতি আকর্ষণ ও বিশ্বাস - এ সব কিছুর সংমিশ্রণে গঠিত বিভূতিভূষণের উপন্যাস। তাঁর উপন্যাসগুলিকে পাঁচটি অধ্যায়ে বর্গীকরণ করে আলাদাভাবে উপন্যাসগুলির উপর আলোকপাত করা হয়েছে। ঔপন্যাসিকের জীবনবীক্ষা বা জীবনদর্শন, গল্প বয়নের শক্তি ও কলাকৌশল এবং ‘উপন্যাস’ নামক সাহিত্যের আঙিনায় তাঁর স্বতন্ত্রতা প্রকাশের উদ্দেশ্য নিয়েই আমাদের প্রয়াস।

গবেষণা সন্দর্ভের কাঠামোটি রচনা করতে গিয়ে আমরা অনেকের কাছ থেকে অনেকরকম সাহায্য-সহযোগিতা পেয়েছি। আমার পূর্বে যেসব সাহিত্য-সমালোচক বিভূতিভূষণের সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেছেন, তাঁদের কাছে আমি পরোক্ষভাবে ঋণী। এই গবেষণা সন্দর্ভটি রচনায় যাঁর কাছে আমি প্রত্যক্ষভাবে ঋণী তিনি হলেন আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রাক্তন ডীন ড. তপোধীর ভট্টাচার্য। তাঁর অনুপ্রেরণায় এই গবেষণা সন্দর্ভের সূত্রপাত। গবেষণা সন্দর্ভটি রচনায় যাঁর অকৃপণ ও অব্যাহত সাহায্য পেয়েছি তিনি আমার পথের দিশারী, তত্ত্বাবধায়ক ড. বেলা দাস। তাঁর সময়োপযোগী ও প্রয়োজনীয় নির্দেশ না পেলে আমার মত ছন্নছাড়া ব্যক্তির পক্ষে একাজ করা সম্ভব হত না। তাঁর প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতায় আমি ঋণবন্দী।

কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানাই আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের আমার অন্যান্য শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও শিক্ষিকাদিগকে, বিশেষ করে প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান ড. সুবীর কর, বর্তমান

বিভাগীয় প্রধান ড. রমা ভট্টাচার্য ও প্রভাষক ড. বিকাশ রায়কে। যাঁদের সতর্ক ও সহানুভূতিশীল দৃষ্টি ও অনুপ্রেরণা এবং সাহায্য আমাকে এই কঠিন কর্মে সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। প্রতিষ্ঠিত কবি ও সমালোচক, আমার কলেজ জীবনের শিক্ষাগুরু, নবীনচন্দ্র কলেজের প্রাক্তন প্রভাষক শ্রী কিরণশঙ্কর রায় মহাশয়কে জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম, গবেষণাকর্ম আরম্ভ করার সময় থেকেই তাঁর মূল্যবান পরামর্শ উপদেশের জন্য। তাঁর আন্তরিক সাহায্য কোনদিনই ভুলবার নয়।

গবেষণা সন্দর্ভটি রচনা করতে গিয়ে বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সাহায্য ভুলে যাওয়ার মত নয়। লাইব্রেরীর মধ্যে রয়েছে, আসাম বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী, গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী, এ.ডি.পি. কলেজ লাইব্রেরী। এছাড়াও রয়েছে তত্ত্বাবধায়ক বেলা দাস ও কিরণশঙ্কর রায়ের ব্যক্তিগত লাইব্রেরী।

এ ছাড়া যেসব ব্যক্তিবর্গ নানাধরনের সাহায্য-সহযোগিতা, উৎসাহ জুগিয়েছেন অনবরত, তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন, এ.ডি.পি. কলেজের বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অণিমা ভট্টাচার্য, প্রাণীবিজ্ঞানের প্রভাষক সুরঞ্জন ভাওয়াল ও কলেজের অধ্যক্ষ ড. সরিফ উদ্দিন আহমেদ। কলেজের অন্যান্য বিভাগের প্রভাষকদের মধ্যে রয়েছেন খগেন্দ্রচন্দ্র মাহেলা, ড. নিত্যানন্দ পট্টনায়ক, নীতা শর্মা, অরিন্দম বরকটকী ও কলেজের লাইব্রেরীয়ান ঋষিকেশ ভূঞা। এদের প্রত্যেককেই জানাই কৃতজ্ঞতা।

জীবনসঙ্গিনী কল্পনা সংসারের দায়-দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে আমাকে মুক্ত মনে গবেষণার কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছে। একাজ সম্পন্ন করার পেছনে তার অবদানও স্বীকার্য।



## সূচীপত্র

|                  |   |                                                                                                                                                 |
|------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| প্রাক্কথন        | : |                                                                                                                                                 |
| ভূমিকা           | : | পৃষ্ঠা - ০১                                                                                                                                     |
| প্রথম অধ্যায়    | : | ঔপনিবেশিক মনন ও আধুনিক চেতনার<br>অমীমাংসিত দ্বন্দ্বভিত্তিক উপন্যাস : 'আরণ্যক',<br>'আদর্শহিন্দু হোটেল', 'অনুবর্তন', 'অশ্বনিসংকেত'<br>পৃষ্ঠা - ৩৫ |
| দ্বিতীয় অধ্যায় | : | ঔপনিবেশিক মনন থেকে আধুনিক চেতনার উত্তরণ :<br>'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত'<br>পৃষ্ঠা - ১২০                                                          |
| তৃতীয় অধ্যায়   | : | ঐতিহ্য থেকে আধুনিক চেতনার দিকে অভিযাত্রা :<br>'দৃষ্টিপ্রদীপ', 'কেদার রাজা', 'ইছামতী'<br>পৃষ্ঠা - ১৮১                                            |
| চতুর্থ অধ্যায়   | : | কাঙ্ক্ষিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত জীবনের দ্বন্দ্বভিত্তিক<br>উপন্যাস : 'বিপিনের সংসার', 'দুইবাড়ি', 'অথৈজল'<br>পৃষ্ঠা - ২৪৩                               |
| পঞ্চম অধ্যায়    | : | বিভূতিভূষণের দৃষ্টির রক্ততামূলক উপন্যাস : দেবযান।<br>পৃষ্ঠা - ২৭৯                                                                               |
| উপসংহার          | : | পৃষ্ঠা - ৩০২                                                                                                                                    |
| গ্রন্থপঞ্জি      | : | পৃষ্ঠা - ৩০৮                                                                                                                                    |

## ভূমিকা

বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা প্রশাখার মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাখা হল উপন্যাস। উপন্যাস মূলত নর-নারীর জীবননির্ভর কাহিনী। যাতে থাকে মানবজীবনের সুস্পষ্ট অখণ্ডরূপের ‘শিল্পিত বিন্যাস’ এবং সমসাময়িক জীবনবোধ। জীবনরস সমৃদ্ধ গল্প রচনা উপন্যাসের মূলকথা হওয়ায় সমকালের বাস্তবতাকে লেখক এড়িয়ে যেতে পারেন না। অর্থাৎ উপন্যাসের মধ্যে ফুটে ওঠে সমকালীন সমাজ ও সময়ের বাস্তব রূপ। আসলে, বর্তমান সমাজ ও সময়ের কর্মপরিধির প্রকাশ করার উপযুক্ত বাহন-ই হল উপন্যাস। উপন্যাসের বিষয় সম্পর্কে ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন –

“উপন্যাসের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ইহা সম্পূর্ণ আধুনিক সামগ্রী।  
পুরাতন যুগের আকাশ বাতাসের মধ্যে ইহার জন্ম সম্ভবপর নয়।  
আধুনিক যুগের সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে ইহার সম্পর্ক একেবারে  
ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ।”<sup>১</sup>

উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে বিশেষ কয়েকটি মৌল বৈশিষ্ট্য এবং এই মৌল বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে প্রধান হল, সাধারণ মানুষের আবেগ, অনুভূতির প্রকাশ ও তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ। বর্তমান সময়ের মানুষ ব্যক্তিত্ববোধে সচেতন এবং তার মননবীক্ষা খুলা-বালিময় পৃথিবীমুখী। সমাজ ও ধর্মের গণ্ডিবদ্ধ পরিসর থেকে মুক্ত হয়ে প্রান্তিকায়িত মানুষের যখন জাগরণ ঘটলো, তখন সেই ব্যক্তি স্বাধীনতা বোধে আলোকিত-তার আনন্দ-কষ্টের কাহিনীই জায়গা পায় সাহিত্যের নবতর রূপ উপন্যাসের প্রতিবেদনের মধ্যে।

আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার ও জ্ঞানের সীমাহীন চর্চার ফলে পণ্ডিত তথা বুদ্ধিজীবীদের চিন্তাকে সমকালীন জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার জন্য এবং ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষিত রাখতে উদ্ভব ঘটে মুদ্রণযন্ত্র বা ছাপাখানা। এই ছাপাযন্ত্রের আবিষ্কারের পর আত্মপ্রকাশে উদ্গ্রীব মানুষ তার তাৎক্ষণিক চিন্তা ও আদর্শকে সমসাময়িকদের মধ্যে প্রসারিত করার লক্ষ্য নিয়ে প্রকাশ করে নানাধরনের সাময়িক পত্রিকা। এসব সাময়িক পত্রিকার প্রকাশ গল্প, উপন্যাসের বয়ন তৈরিতে উৎসাহিত করেছে। প্রাক-আধুনিক যুগের দেবনির্ভর মানুষ আধুনিক যুগের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে প্রান্তিকায়িত মানুষের সুখ-দুঃখের কাহিনী শুনার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছে। প্রান্তিকায়িত মানুষের এরকম আত্মপ্রকাশের অধীর উন্মুখতা থেকেই অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে আখ্যানবহুল উপন্যাসের উদ্ভব ঘটে। আধুনিক যুগের মুদ্রণযন্ত্র যখন মানুষের হাতে পৌঁছে দিল অসংখ্য গ্রন্থ, তখন যুক্তিশীল মানুষ আর বটতলার কথকের মুখোচ্চারিত কাহিনীর শুধুমাত্র বাকরুদ্ধ শ্রোতা হয়ে থাকতে চায়নি। এজন্যেই প্রাক-আধুনিক যুগের শ্রোতা জনসাধারণ পর্যবসিত হল পাঠক জনসাধারণে। আধুনিক পাঠকবর্গের সীমাহীন গল্পরস-পিপাসা উপন্যাসের উদ্ভবকে পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে। সমালোচক Arnold Kettle উপন্যাসের উদ্ভব সম্পর্কে বলেছেন –

"Novel arose with the growth for the first time of a large widely distributed reading public." <sup>2</sup>

ভূবিশ্বে প্রান্তিকায়িত মানুষের হাতে শাসন ক্ষমতা আসার পর এই শ্রেণীর মানুষের গণতান্ত্রিক ভাবনা তাকে সমাজ, সম্প্রদায়, গোষ্ঠী - এ সব কিছুর বেড়াজাল থেকে মুক্ত করে আত্মপ্রকাশের সুযোগ করে দেয়। এই শ্রেণীর মানুষ উপলব্ধি করে –

“সমাজের চেয়ে মানুষ বড়ো, সম্প্রদায়ের চেয়ে মানুষ বড়ো, শ্রেণীর  
চেয়ে মানুষ বড়ো, সংঘের চেয়ে মানুষ বড়ো।” ৩

জীবশ্রেষ্ঠ যে মানুষ সত্য-সেই ব্যক্তিমানুষ তার ব্যক্তি স্বাধীনতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সাহিত্যে আত্মপ্রকাশের  
জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে। এতদিন যে প্রান্তিকায়িত শ্রেণী উঁচু শ্রেণীর মানুষের প্রভাব-প্রতিপত্তির  
আড়ালে আচ্ছন্ন ছিল, এই প্রান্তিকায়িত শ্রেণী আজ মুক্ত নীতির প্রভাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে  
তার নিজের কথাকে সাহিত্যিক প্রতিবেদনে প্রকাশ করতে উদগ্রীব হয়ে ওঠে। এই উদগ্রীবতার  
ফসল হিসেবে প্রকাশ পায় উপন্যাস নামক নতুন পাঠকৃতির বয়নশিল্প। এই বয়নশিল্পের মুখ্য  
বিষয় হল প্রান্তিকায়িত তথা সাধারণ ব্যক্তিমানুষ। ইংরেজ সমালোচক রবার্ট লিডেলের ভাষায়

“The novel deals with the individual ...” ৪

প্রাক-আধুনিক কাল থেকেই মানুষ সাহিত্য রচনা করে আসছে। কিন্তু সেইসব সাহিত্যে  
প্রান্তিকায়িত মানুষ দেব মাহাত্ম্যের লক্ষণরেখাকে অতিক্রম করে নিজেকে আত্মপ্রকাশ করার  
সুযোগ পায়নি। কিন্তু আধুনিক যুগে এসে মানুষ উপন্যাসের বয়নের মধ্যে নিজ সত্তাকে পরিপূর্ণ  
শিল্পরূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছে। প্রতীচ্যের বিশিষ্ট সমালোচক Ralph fox বলেছেন —

“The novel is not merely fictional prose, it is the  
prose of man's life, the first art to attempt to take  
the whole man and give him expression.” ৫

তাই মুক্ত মনের বিস্তার ও সাধারণ মানুষের মনে গণজাগরণ, ‘পাঠক জনসাধারণ’ এর  
আত্মপ্রকাশ এবং ব্যক্তিমানুষের মনুষ্যত্বের উজ্জীবন-সাধারণ মানুষের আত্মমর্যাদাবোধকে

স্বীকৃতি দেয়। এই স্বীকৃতির মধ্যদিয়েই প্রকাশ পায় আধুনিক যুগের প্রান্তিকায়িত মানুষের আত্মবিস্তারের অন্যতম সার্থক বাহন-উপন্যাসের।

আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় আধুনিকতার সূচনা ঘটে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার সময় থেকে। সেই সময়ে বঙ্গভূমির তথা ভারতবর্ষের বাঞ্ছিত আধুনিকতার যা-কিনা ভাববেদনার সত্য, তা এসেছে প্রতীচ্যের রেনেসাঁসের ধ্যান-ধারণা থেকে। ‘রেনেসাঁস’ বলতে আমরা সাধারণতঃ বুঝে থাকি ‘নবজাগরণ’। নবজাগরণ-ই একরকম মোহমুক্তি। নবজাগরণ ভারতীয় জাতিসত্তাকে মধ্যযুগীয় কুপমণ্ডুক ধ্যানধারণার বৃত্ত থেকে মুক্ত করে এক নতুন জীবনমস্ত্রে দীক্ষিত করে। এই নতুন জীবনমস্ত্র তথা আধুনিক জীবনযাত্রা মধ্যযুগের মত জড় নয়; গতিশীল। গতিশীলতাই নবজাগরণের প্রাণধর্ম। তাই চিরায়ত সমাজ, সংস্কৃতি, ধ্যানধারণা, রীতি-নীতি, আচার-আচরণ সম্বন্ধে নতুন করে কৌতূহলী হয়ে ওঠে। মানুষের মনে জেগে ওঠে নানাধরনের প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসা। সবকিছুকেই পুনর্বিচার, পুনর্মূল্যায়ন, পুনরারস্ত করতে উদ্বীণ হয়ে ওঠে। ফলে মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণার সঙ্গে আধুনিক যুগের সাংস্কৃতিক ও আর্থ-সামাজিক সম্পর্কের বিচ্ছেদ ঘটে নবজাগরণের যুগে এবং সেদিক থেকে নবজাগরণকে আধুনিক যুগের প্রথম সূর্যোদয় পর্ব বলা হয়।

বাংলাদেশের নবজাগরণের লক্ষণগুলোকে আমরা এভাবে সূত্রায়িত করতে পারি -

- (১) ধর্মীয় রীতি-নীতির সঙ্গে সময়ের বহুমানতায় যেসব সামাজিক সংস্কার ও কুপ্রথা যুক্ত হয়েছে, মুক্ত মনে সেগুলো পুনর্বিবেচনার আগ্রহ।
- (২) গণ্ডিবদ্ধ জীবনের পরিবর্তে বহুমুখী জীবনপরিসরে অভিযানের বাসনা।
- (৩) পঠন-পাঠনের মাধ্যমে বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা এবং সবকিছুকেই বুদ্ধি ও যুক্তির মাধ্যমে বিচার-

বিবেচনা করা।

- (৪) ব্যক্তিসত্তা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের জাগরণ।
- (৫) নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ। স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন।
- (৬) সভা-সমিতি গঠনের মাধ্যমে আত্মসমালোচনা ও আত্মপ্রকাশের তৎপরতা এবং এরই সঙ্গে ঘটেছে জাতীয় চেতনার উন্মেষ।
- (৭) মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে বই ও পত্র-পত্রিকার প্রকাশ এবং শিল্প-সাহিত্যকে জনসাধারণের পাশে দাঁড় করানোর প্রয়াস।

উনিশ শতকের বাঙালির নবজাগরণ প্রতীচ্যের অভিজ্ঞতা সম্ভোগের ফল। প্রতীচ্যের ঔপনিবেশিক শাসন সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে প্রতীচ্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-সংস্কৃতি-দর্শন এবং অর্থনীতির সঙ্গে বাঙালির পরিচয় ঘটে। পরিচয় ঘটলেও এসব নতুন উপলব্ধি গ্রহণ করতে বাঙালিমানস দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে ওঠে। তবে ধীরে ধীরে এই নতুন উপলব্ধি বাঙালি জাতির জীবনচর্চার মূল উপাদানে পর্যবসিত হয়। এই উপাদানকে নিঙড়িয়ে মূল নির্যাসটুকু গ্রহণ করে বাঙালি নবজীবনবোধকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। শুধু প্রতিষ্ঠিত নয় ; নতুন ভাবনার উন্মেষে বাঙালির মধ্যে সংস্কার বাসনাও জেগে ওঠে। শুরু হয়, বাঙালির জীবন চর্চায় ঐতিহ্যের বিনির্মাণ।

উনিশ শতকের নবজাগরণের ঢেউ এর দোলা লাগে আমাদের ঐতিহ্যগত শিক্ষাব্যবস্থার উপর। কয়েকজন ইংরেজি শিক্ষিত ভারতবাসী ও প্রতীচ্যের কিছু ব্যক্তি ও সংস্থার সহযোগিতায় বাংলায় নতুন শিক্ষার আলো ফুটে ওঠে। এখানে ঐতিহাসিক নিম্নোক্ত সাধন বসুর একটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য –

"The foundation of Asiatic Society, the Serampore Mission and the Fortwilliam College and the resulting impact prepared the ground for the inauguration of a new epoch." ৬

ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে অনেক স্কুল-কলেজ। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য ছিল মানুষকে কৃপমগ্নত্বের পরিসর থেকে মুক্তি দিয়ে বৃহৎ পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় করে দেওয়া।

আধুনিক শিক্ষার অন্যতম ফসল স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার। সেই সময়ে কিছু প্রগতিবাদী ব্যক্তি বা সংস্থা অনুভব করেন, জীবনকে সুস্থ ও সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে হলে, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে সহযোগিতা ও সহমর্মিতার ক্ষেত্র প্রস্তুতির স্বার্থে স্ত্রী-শিক্ষার যে প্রয়োজন - এই সত্য গভীরভাবে মানুষের মনে অনুভূত হল। ডেভিড হেয়ার, ডিরোজিও, বেথুন সাহেব থেকে আরম্ভ করে ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠী, কৃষ্ণমোহন সেন, রাধাকান্ত দেব, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, বিদ্যাসাগর, মদনমোহন, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তির স্ত্রী-শিক্ষার প্রসারে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। এমনকী রাধাকান্ত দেব রক্ষণশীলদের প্রতিনিধি হয়েও নারীশিক্ষার পীঠস্থান বেথুন স্কুলকে নিজের বাড়িতে স্থানান্তরিত করেন। গৌরমোহন বিদ্যালয়কার স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের জন্য 'স্ত্রী-শিক্ষা বিধায়ক' গ্রন্থ (১৮৮২) রচনা করেন এবং এখরনের গ্রন্থ রচনা করার জন্য রাধাকান্ত দেব তাঁকে সাহায্যও করেন। স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারণের জন্য রাজা বৈদ্যনাথ বিশ হাজার টাকা দান করলেন। ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে নারীকেন্দ্রিক ও নারীস্বাধীনতা বিষয়ক বিভিন্ন আন্দোলন। সমালোচক রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য এখানে উল্লেখনীয় —

“উনিশ শতকে আমাদের দেশে ইংরেজ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার

পর নব্য বঙ্গসমাজে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে পুরুষের মতোই নারীর শিক্ষা ও স্বাভাবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনও ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে থাকে। বাংলায় নারীকল্যাণমুখী সামাজিক আন্দোলনগুলি তারই ফলশ্রুতি।” ৭

উনিশ শতকের নারী-কেন্দ্রিক আন্দোলনের অগ্রভাগে ছিলেন আলেকজান্ডার ডাফ, রামতনু লাহিড়ী, শিবনাথ শাস্ত্রীর মত অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ। তাঁদের সাহায্য-সহযোগিতায় বাংলাদেশে শুরু হয় সতীদাহ প্রথা নিবারণ, স্ত্রী-শিক্ষা আন্দোলন, বিধবা বিবাহ ও বহুবিবাহ আন্দোলন, বালাবিবাহ বন্ধ আন্দোলন ছাড়াও কিছু গৌণ সংস্কারমূলক আন্দোলন। এসব গৌণ আন্দোলনের মধ্যে রয়েছে —

- (১) পৈতৃক সম্পত্তিতে নারীর অধিকার দাবির আন্দোলন
- (২) পণপ্রথার বিলোপ আন্দোলন
- (৩) পর্দাপ্রথার বিলোপ আন্দোলন
- (৪) অসবর্ণ বিয়ের প্রচলন ও অসম বিয়ের লোপ আন্দোলন।

এসব আন্দোলনের সমর্থনে ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠী ছাড়াও অনেকেই হাতে কলম নেন। সাময়িক পত্রিকাগুলিও স্ত্রী-শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারে অশেষ ভূমিকা পালন করে। স্ত্রী-শিক্ষার বিরোধীও তৎকালীন সময়ে কম ছিলেন না। স্ত্রী-শিক্ষা বিরোধীদের কটাক্ষ করে দ্বারকানাথ রায় ‘সুলভ’ পত্রিকায় লেখেন —

“এ প্রশ্নে আমরা হাস্য সম্বরণ করিতে পারি না। .... কিন্তু পত্নী পণ্ডিত হইলে যে পতির প্রাণবিয়োগ হয় এ কথা অতি চমৎকার।” ৮



আমাদের সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতির বিনির্মাণের ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক শাসক সম্প্রদায়ের অবদান অনস্বীকার্য। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি ভারতবর্ষে আসার আগে আমাদের সমাজে প্রচলিত ছিল সামন্ততান্ত্রিক রীতি-নীতি। অতীতের এইসব সামন্ততান্ত্রিক রীতি-নীতি আমাদের মানসিকতায় আজও কম-বেশি লালিত রয়েছে। দীর্ঘদিন থেকে সমাজে প্রচলিত রীতি-নীতিকেই সাধারণতঃ ঐতিহ্য বলা যায়। কিন্তু অতীতের সঙ্গে ঐতিহ্যের পার্থক্য রয়েছে। পূর্বে যা চলে গিয়েছে, তা-ই অতীত কিন্তু ঐতিহ্য হল পূর্ব থেকে বর্তমান পর্যন্ত দ্বন্দ্বিকতার মধ্যদিয়ে যা কম-বেশি আজও সমাজে লালিত। ইংরেজি 'Tradition' শব্দটির বাংলাবাদ হল 'ঐতিহ্য'। বংশানুক্রমিক প্রাপ্ত রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, যা কালের পরিবর্তনের মালিন্যকে উপেক্ষা করে নিত্যকালীন, তাকেই আমরা 'ঐতিহ্য' বলতে পারি। শুধু ব্যক্তিগত জীবনে নয়, সমষ্টিগত কোনও জাতির জীবনে অপরিবর্তনীয় ধারায় প্রবাহিত কলা-সংস্কৃতিও ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত। তাই ঐতিহ্য কখনও সীমায়িত নয় ; অসীম। এ সম্পর্কে বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ড. তপোধীর ভট্টাচার্যের একটি মন্তব্য এখানে উল্লেখনীয় -

“এই অসীমতার অঙ্কুর ভাঙার ঐতিহ্য নিশ্চয় এবং ঐতিহ্য মানে আমরা অতীতে যা-ছিলাম, কিন্তু তাতে অতীত ও ঐতিহ্য একাকার হয়ে যায় না। আমরা যখন 'ঐতিহ্য' শব্দটি প্রয়োগ করি, নিশ্চয় তাকে একমাত্রিক ও একরৈখিক মনে করি না ; বরং মনে রাখি, নিরন্তর দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে অর্থাৎ দ্বিবাচনিকতা ও সমান্তরাল অপরতার স্বতঃসিদ্ধ স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে তার এগিয়ে যাওয়া। তাই অশ্লীলত অতীত ও চিরস্পন্দমান ঐতিহ্য এক কথা নয় কখনো।” \*

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মানুষ অতীতের কাছ থেকে কিছুই পায় না কিন্তু ঐতিহ্য থেকে অনেক উপকরণ সংগ্রহ করতে পারে। তাই মানসিকতা, অভিজ্ঞতা, নিজস্ব প্রয়োজনীয় আত্মিক উপলব্ধি অনুযায়ী ঐতিহ্যের তাৎপর্য নানাধরনের হয়।

ঔপনিবেশিক শক্তির সভ্যতা, শিক্ষা, সংস্কৃতির সংস্পর্শে আমাদের বাঙালি তথা ভারতীয় সমাজে যেমন এক নতুন চেতনার সূচনা ঘটে, তেমনি উদ্ভব ঘটে এক নতুন শ্রেণীর মানুষ ; যাকে আমরা মধ্যবিত্ত শ্রেণী হিসেবে অভিহিত করি। আমাদের বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কাঠামো মূলতঃ কৃষিনির্ভর। কিন্তু ইংরেজ সরকার কিংবা তাদের অধীনস্থ জমিদার শ্রেণী বাংলার কৃষির উন্নতির প্রতি নজর না দেওয়ায় কৃষি ব্যবস্থা ধ্বংসমুখী হয়ে পড়ে। গ্রামীণ কৃষি শিল্প ধ্বংস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেমন বিস্তার ঘটে নগর কলকাতার তেমনি গ্রাম-বাংলার সমাজ-সংস্কৃতিতেও পরিবর্তন ঘটে। গ্রামীণ মানুষ যেমন হয়েছে শহরমুখী তেমনি পরিস্থিতির প্রভাবে মানুষের নাগরিক চেতনাও বৃদ্ধি পায় ধীরে ধীরে। উপনিবেশবাদীদের তৈরি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে নতুন ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক কাঠামোর বিন্যাসের মধ্যদিয়ে এবং জটিল ভূমি ব্যবস্থার মধ্যদিয়ে বাংলায় তথা ভারতবর্ষে ‘মধ্যবিত্ত’ নামে এক নতুন শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গঠন সম্পর্কে ড. রামেশ্বর শ. বলেন -

“উনবিংশ শতাব্দীতে এই স্বয়ংসম্পূর্ণ আত্মতৃপ্ত গ্রামীণ সমাজকে

ভেঙ্গে ইংরেজ বের করে এনেছিল এক নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী।” ১০

ইংরেজ সৃষ্ট চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের একটি উদ্দেশ্যই ছিল বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিষ্ঠা করা।

এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল ইংরেজ সরকারের সম্পূর্ণ আশা ভরসার পাত্র। তারা ইংরেজি শিক্ষা অর্জন করে সরকারের বিভিন্ন বিভাগে চাকুরি গ্রহণ করে আনন্দের সঙ্গে দিন যাপন

করতে থাকে। ঐতিহাসিক সুমিত সরকার এইসব মধ্যবিত্তদের স্বরূপ এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন

" ..... The contrast was perhaps clearest in Bengal.

Here the nineteenth-century intelligentsia diligently cultivated the self image of a 'middle class'

(Madhyabitta Sreni) below the zamindars but above the labours." <sup>১১</sup>

মধ্যবিত্তদের মধ্যে বেশিরভাগ ছিল সরকারি ও বেসরকারি অফিসের কেরানি। এখানে ড রামেশ্বর শ-য়ের একটি মন্তব্য উল্লেখনীয় –

“গ্রাম থেকে নগরে এসে কৃষি ও কুটির-শিল্প ছেড়ে যারা ইংরেজি শিক্ষা নিয়ে কেরানির চাকরিতে ঢুকল তারাই হয়ে উঠল ঊনবিংশ শতাব্দীর বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত।” <sup>১২</sup>

এই সময়ে নব্য জন্মলাভ করা মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রতিপদে ইংরেজ শাসক সম্প্রদায়কে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছে। তবে তাঁরা সাহায্য-সহযোগিতা করলেও প্রতীচ্যের শিক্ষা-সংস্কৃতি, যুক্তিবাদ, নবজাগরণ মধ্যবিত্তের চেতনায় জন্ম দিয়েছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের এবং তা থেকে জন্ম নিয়েছে সচেতন অধিকারবোধ। এই অধিকারবোধ থেকেই পরবর্তী সময়ে দেখা দিয়েছে জাতীয়তাবাদ নামক গণসচেতনা।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সচেতনাবাদী ব্যক্তিবর্গ ইংরেজদের সহযোগিতায় আমাদের সমাজে দীর্ঘদিনের লালিত ধর্মবিশ্বাস, সংস্কার, আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-নীতির বিনির্মাণ করেন। রামমোহন

রায়, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র প্রমুখ ব্যক্তির ইংরেজি শিক্ষা-সংস্কৃতির স্পর্শে এসে সমাজ সংস্কারে হাত দেন। এঁদেরকে যোগ্যতা সহকারে সাহায্য করেন ডেভিড হেয়ার, ডিরোজিও প্রমুখ কর্তব্যক্তির। রামমোহনের জীবন সাধনা-ই ছিল বূর্জোয়া নীতিবোধকে জাতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে খাপ খাইয়ে গ্রহণ করা। তাই রামমোহন ১৮২৩ সালে ভারতের তৎকালীন বড়লাট আমহার্স্টকে একটি চিঠিতে লেখেন —

“.... এদেশীয়দিগকে ইংরেজী ভাষা ও পাশ্চাত্যবিজ্ঞান শিক্ষা না

দিলে, ইহাদের জাতীয় জীবনের উন্নতি হইবে না।” <sup>১৩</sup>

রামমোহনের এই মন্তব্যটি তৎকালীন সময়ের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাঁর এই চিঠিটিকে নবযুগের সামরিক শঙ্খধ্বনির সঙ্গে তুলনা করা হয়। এইসব মনীষীদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে কিছু ভারতীয় যুবক ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর সভ্য হয়ে ভারতীয় রীতি-নীতি, সংস্কৃতিকে পরিত্যাগ করে উগ্র ঐতিহ্যবিরোধী হয়ে ওঠে। সমাজে সূচিত হয় এক নতুন পরিসরের ; যাকে আমরা উনিশ শতকের আধুনিকতার পরিসর হিসেবে গন্য করি। আধুনিকতা সবসময়ই ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে উপস্থিত হয়। জনৈক সমালোচকের ভাষায় বলা যায় —

“ ..... ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ না ঘটিয়ে নিজেকে কখনো

জাহির করে না আধুনিকতাবাদ .....।” <sup>১৪</sup>

আধুনিকতা বলতেই আমরা সাধারণতঃ বুঝি, ঐতিহ্যের সঙ্গে বিচ্ছেদ, জাতীয় সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা থেকে বিচ্ছেদ, পূর্বপুরুষের ধ্যান-ধারণার সংস্কার থেকে বিচ্ছেদ। তাকেই আমরা আধুনিকতা বলতে পারি, যা নির্বিচারে বিজাতীয় রসে পুষ্ট। প্রতীচ্যের ‘রেনেসাঁস’ ও ‘হিউম্যানিজম’ এর নামে অজ্ঞান হওয়াটা আধুনিকতার একটি প্রধান লক্ষণ। আধুনিকতার বিপরীত হচ্ছে

ঐতিহ্য। ঐতিহ্যের মধ্যে রয়েছে স্থিতিশীলতা, ধারাবাহিকতা এবং সমালোচনা কিন্তু আধুনিকতা এই সমালোচনার মাপকাঠিতে ভঙ্গুর ও পরিবর্তনশীল, নষ্ট ও পতন। ঐতিহ্যে অন্তর্ভুক্ত এক সার বিশ্বাস এবং বিধি, এ সব থেকে উৎসারিত সত্য এক জীবনবোধ। এই জীবনবোধের মধ্যে রয়েছে এক বিশেষ ধারাবাহিকতা এবং সে বোধ বিশ্লেষিত হয় ধারাবাহিকতার নিশ্চয়তা থেকে। এজন্যই ঐতিহ্য হচ্ছে, ধারাবাহিকতা, নিশ্চয়তা ও স্থিতিশীলতা। আধুনিকতা এ সব কিছু সম্পূর্ণ বিপরীতে অবস্থান করে। এই আধুনিকতা সম্পর্কে বোরহানউদ্দিন খান বলেছেন

“সেজন্য আধুনিকতা কেবল ভঙ্গুর এবং মুহূর্ত আক্রান্ত নয়, আধুনিকতা আরোপিতও, এই আরোপণ পশ্চিম উদ্ভূত, সাম্রাজ্যবাদ ভিত্তিক, ঔপনিবেশিকতা আক্রান্ত, সেই সঙ্গে বৈশ্বিক। ঐতিহ্য তাই এক আদর্শিক পর্যায়, অতীত ব্যাখ্যা করার এক পদ্ধতি। অতীতের যে অংশ বর্তমানে ক্রিয়াশীল, সেই বর্তমানতা সত্য নতুন প্রভাব এবং পরিবর্তন আক্রান্ত। এ প্রভাব এবং আক্রান্তবোধ হচ্ছে ঔপনিবেশিকতা এবং পশ্চাদপদতা পর্যালোচনার কেন্দ্র, ভিত্তি, মূল।”<sup>১৫</sup>

আধুনিকতার একটি অর্থ স্বাভাবিকতার বিরোধিতা, সমাজের বিপরীত তাত্ত্বিকতা। আধুনিকতা শব্দটি থেকে তৈরি হয় ধারাবাহিকতা এবং পরিবর্তন, ঐতিহ্য এবং উদ্ভাবন বিষয়ক ইঙ্গিতময়তা।

আমাদের দেশে ঔপনিবেশিক আধুনিকতার সূচনা ঘটে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার সময়ে। ঔপনিবেশিক পরিসর কিংবা উপনিবেশ বলতে আমরা বুঝি কোনও সমাজ বা গোষ্ঠী যখন অন্য সমাজ বা গোষ্ঠীকে গ্রাস করার জন্য নানাস্তরে প্রচেষ্টা চালায় কিংবা তাদের

উপর অধিকার কায়েম রাখার জন্য রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক কিংবা মানসিকভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে নিজ মুষ্টিবদ্ধ করে নেওয়ার নীতি বা তত্ত্ব গ্রহণ করার নীতিকেই উপনিবেশবাদ বলা যায়। আর, এই সময়ে যেসব সাহিত্য রচিত হয়েছে এগুলিকে সাধারণতঃ ঔপনিবেশিক সাহিত্য বলা হয়। ঔপনিবেশিক সাহিত্য সম্পর্কে সমালোচক মলয় রায়চৌধুরী বলেছেন —

“ঔপনিবেশিক সাহিত্য বলতে বোঝায় যে-সমস্ত লেখালিখি ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, মূলত সাম্রাজ্যের সদরবাসীদের লেখা। অবশ্য তা দোআঁশলা এবং দেশীয়দের লেখাপত্রও হতে পারে, যেগুলি উপনিবেশের সময়ে লেখা।”<sup>১৬</sup>

এই উপনিবেশবাদের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে আধুনিকতার। কারণ উপনিবেশকে বাস্তবে রূপান্তরিত করতে গিয়ে নানাধরনের নতুন নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করে ঔপনিবেশিক সমাজ। এই সমাজ নতুন নতুন পদ্ধতি স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা করে প্রয়োগ করে। এইজন্যই ঔপনিবেশিকতার হাত ধরেই চলে এসেছে আধুনিকতা এবং এই দুই সত্তার সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। এ সম্পর্কে জনৈক সমালোচকের একটি মন্তব্য এখানে উল্লেখনীয় —

“আধুনিকতা তাই ঔপনিবেশিক সমাজের অবভাস হিসেবে গড়ে উঠেছিল। ক্ষয়িষ্ণু সামন্তবাদের সঙ্গে গভীর ব্যবহারিক স্বার্থে পদে-পদে আপস করে উপনিবেশবাদ এ দেশে ধনতন্ত্রের যে নতুন আদল তৈরি করেছিল, তারই বিচিত্র ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় আধুনিকতার সূচনা।”<sup>১৭</sup>

এই আধুনিকতার বস্তুগত গতি এসেছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি থেকে, উৎপাদন পদ্ধতির নতুনত্ব থেকে কিংবা ক্রমিক শিল্পায়নের সত্য থেকে। বিশেষতঃ অষ্টাদশ শতকের মধ্যবর্তী

সময় থেকে, বলা যেতে পারে বাংলার সর্বশেষ স্বাধীন নবাব সিরাজের পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর থেকে বাঙালি জাতির যে রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন আরম্ভ হল, তাকে পুরনো কালের ভাঙনের এবং নতুন কালের শুরু বলে গ্রহণ করা যায়। সমাজ আধুনিক হতে গিয়ে অনেক বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে। আমাদের জাতীয় জীবনে তখন একদিকে নতুন আদর্শের প্রতি টান, অন্যদিকে পুরনোর দিক থেকে সেই টান কেটে ফেলার চেষ্টা, যাকে আমরা সহজ করে বলতে পারি, আধুনিকতা আর ঐতিহ্যের দ্বন্দ্ব। ভাল হোক আর মন্দ হোক, এর মধ্যদিয়ে আমাদের তথাকথিত নবজাগরণ ঘটেছে, এরই মধ্যদিয়ে সমাজের বদল ঘটেছে।

‘উপন্যাস’ আধুনিক কালের সন্তান বলেই জন্মসূত্রে বর্তমানের কাছে দায়বদ্ধ। তবে অতীতের কথাও বর্তমানের আঁধারে ‘উপন্যাসে’ পর্যবসিত হয়। বর্তমানের আঁধারে পর্যবসিত করতে গিয়ে ‘উপন্যাস’ প্রত্যেক পর্বে আধুনিক হয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলা উপন্যাসের দেড়শ বছরের ইতিহাসে দেখা যায়, চলার পথে অনেক সময়ে ‘উপন্যাস’ নামক পরিসরটি বিশ্রাম নিয়েছে ; এই বিশ্রামেই একটি নতুন পর্বের জন্ম হয়েছে। নতুন পর্বেই উপন্যাসের আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর পরিবর্তন, ভাষার পরিবর্তন এবং উপন্যাসিকের দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনের মধ্যদিয়ে বাংলা উপন্যাস প্রত্যেক পর্বেই আধুনিক হয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। এই আধুনিকতা তার ‘সমকালীন জীবনের সঙ্গে আত্মীয়তার সূচক, তার প্রত্যক্ষ জীবনগত তাৎপর্যের সূচক’। উপন্যাস সবসময়-ই যুগসত্যকে প্রকাশ করে বলেই তাকে আধুনিক যুগের ফসল বলে অভিহিত করা হয়। আধুনিক সাহিত্যে আধুনিক সমাজের-ই কথা ব্যক্ত করা হয়। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস পর্ব থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেক পর্বে সমকালীন সমাজের কথা-ই ব্যক্ত

হয়েছে। আসলে, যে সমাজ তার বিশেষ পরিসরের সঙ্গে মিলেমিশে চলতে সমর্থ, যে সমাজ তার বিশেষ পরিসরে মানব ইতিহাসের অগ্রগতির শরিক, যে সমাজ উন্নততর ভাবী সমাজের পথ নির্মাতা, তাকেই আমরা আধুনিক সমাজ হিসেবে স্বীকার করি।

সমাজের আধুনিকতা আর সাহিত্যের আধুনিকতার মধ্যে সম্পর্ক যদিও নিবিড়, তবুও এই বিষয় দুটি কখনও এক নয়। এদের প্রকাশের রূপও সম্পূর্ণ আলাদা পরিসরযুক্ত ; কর্মক্ষেত্রও সম্পূর্ণ আলাদা। আধুনিক সমাজ সাধারণভাবে আধুনিক সাহিত্যেই নিজেকে প্রকাশ করে, সমাজ প্রাচীনপন্থী হলে আধুনিকতার সন্ধান পাওয়া যাবে না। সমাজের মধ্যে আধুনিকতার সঞ্চার ঘটলেই সাহিত্যে খুব তাড়াতাড়ি আধুনিকতার ছায়া পড়ে, চিন্তার অনুভবে এবং কাজে প্রাচীনতার জের দীর্ঘকাল বাহিত হতে থাকে। অন্যদিকে সাহিত্যে আধুনিকতার সঞ্চার ঘটলেই বুঝতে হবে সমাজে অনিবার্যভাবেই পরিবর্তন ঘটে শুরু করেছে। ফলে আধুনিক সমাজব্যবস্থা-সংস্কৃতিতে যে নতুনত্বের জন্ম দেয়, উপন্যাসের আধুনিকত্ব সেই নতুনত্বের একটি শিল্পগত প্রকাশ।

গ্রাম সমাজের পরিবর্তনের কথা, স্থিতিশীল পরিবারকেন্দ্রিক জীবন ব্যবস্থায় এই যে গোঁড়া ঘেঁষা পরিবর্তন, এর প্রথম ধাক্কাটা আসে বঙ্গভূমিতে। তাঁত ও চরকার ধ্বংস, গ্রামের ঘরে ঘরে ছোট-বড় যে কুটির শিল্প, পারিবারিক শিল্প ছিল, তার বিনষ্টি মধ্যযুগীয় গ্রামকেন্দ্রিক অর্থনীতির ভিত্তিকে ভেঙ্গে দিয়ে যে নতুন ধরনের অর্থনীতি গড়ে তুলল, তার-ই নাম ঔপনিবেশিক অর্থনীতি। এই ঔপনিবেশিক যন্ত্রের সাহায্যেই পুঁজিবাদ পরাধীন দেশে তার শোষণকে সক্রিয় রাখে। ধনতন্ত্রের এই ঔপনিবেশিক অর্থনীতির যন্ত্রই সেদিন প্রথমে বাংলাদেশে, তারপর সম্পূর্ণ ভারতবর্ষে একটা নতুন পালার সূচনা করে, অলঙ্ঘ্য একটি অর্থনৈতিক সামাজিক বিপ্লব ঘটে।



এই অলঙ্ঘ্য বিপ্লবের দিকে তাকিয়েই বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক কার্ল মাক্স বলেন—

"England, is true, in causing a social revolution in Hindustan was actuated only by the vilest interests ..... whatever may have been the crime of England she was the unconscious tool of history in bringing about that revolution." <sup>১৮</sup>

অর্থনৈতিক-সামাজিক বিপ্লবকে বড়ভাবে সংগঠিত করতে পারলে, আমাদের বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের শিল্পায়ন পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারত, কিন্তু প্রতীচ্যের এই গোষ্ঠীটি নিজের স্বার্থেই এই বিপ্লবকে ততোটা গড়ে ওঠার সুযোগ দেয়নি।

কিন্তু ইতিহাস যে ঔপনিবেশিক প্রভুর খুশিমত রাশ টেনে ধরার চেষ্টাকে শেষ পর্যন্ত মেনে নেয় না, দুটি বিশ্বযুদ্ধ এসে সেই সত্যকে মানুষের চোখের সামনে প্রমাণ করে দিয়েছে। ইতিহাসের এই সত্যতাকে স্বীকার করেই আমাদের বাংলা সাহিত্যে এই তথাকথিত বিপ্লবের ফসল ফলতে আরম্ভ করে। কারণ, বিপ্লবের দৌলতেই বাংলায় স্থাপিত হয় শ্রীরামপুর মিশন কিংবা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। এসব প্রতিষ্ঠানের দৌলতেই বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার যাত্রা শুরু হয়। এখানে ড. তপোধীর ভট্টাচার্যের একটি মন্তব্য উল্লেখনীয় —

“ফোর্ট উইলিয়াম প্রতিষ্ঠার বছর থেকে আধুনিক পর্বের শুরু, সাহিত্যের

ইতিহাসে লেখকেরা অন্তত এভাবেই তাদের সম্বর্ভ তৈরি করেছেন।”<sup>১৯</sup>

এভাবেই আমাদের ঐতিহ্যলালিত সম্বর্ভের মধ্যে আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে।

এই সময়ে ঔপনিবেশিক বেড়াজালকে সহ্য করতে না পেরে তরুণ মন যৌবনের দুরন্ত

আবেগ শুধুমাত্র পুরনো মূল্যবোধকে তথা ঐতিহ্যকে বিনির্মিত করতে চেয়েছিল। যদিও পুনর্নির্মিত মূল্যবোধকে এইসব লেখক সম্প্রদায় সম্পূর্ণ করায়ত্ত করতে পারেননি। কারণ, বাংলাদেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তন ইউরোপের মত শিল্প বিপ্লবের মধ্যদিয়ে আসেনি; এসেছে ঔপনিবেশিক শাসনের রক্তহীন শোষণের ভিতর দিয়েই। ইউরোপের নবজাগরণের পটভূমি এবং এদেশে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও বাংলার নব্যশিক্ষিত মানুষ ইউরোপীয় রীতিকে গ্রহণ করতে চেষ্টা করেছে। তবে তাঁরা এদেশের সামন্ততান্ত্রিক ভাবধারা থেকে মুক্ত হতে পারেনি। তাই মধ্যযুগীয় ধ্যানধারণা অথবা আরও প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা ব্রাহ্মণ্য ধ্যান-ধারণায় নিমজ্জিত মানুষ শহরের জীবনচর্যা গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে কিংবা দু-চার লাইন ইংরেজি পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই মধ্যবিশ্বের মন থেকে প্রাচীন প্রথা বা ঐতিহ্য মুছে যাবে - এসব ভাবা বাস্তবসম্মত নয়। তবে এতে প্রাচীন প্রথা ক্ষয়িষ্ণু হল কিন্তু সম্পূর্ণ লুপ্ত হল না। পুরনো কালের বেশ কিছু শেকড় কাটা পড়লেও অনেক শেকড় বেঁচে থাকল এবং সেই কারণে মধ্যবিশ্বের মনে নতুন পুরনোর জগা-খিচুড়ি অনেক পরিমাণে থেকে গেল। ফলস্বরূপ, তাদের মানসিকতায় দেখা দেয় অন্তর্দ্বন্দ্ব। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব-ই উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর লেখক বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মানস যন্ত্রণার উৎস।

উনিশ শতকের মধ্যবিশ্ব বুদ্ধিজীবীরা জাতীয় জীবনে নিয়ে এসেছিল নবজাগরণ, আর বিশশতকে এইসব বুদ্ধিজীবীরা এসে দাঁড়ায় মৃত্যুর সামনা-সামনি। চাকুরির আশায় উনিশ শতকে বাঙালিরা ইংরেজি শিখেছিল, গড়ে উঠেছিল মধ্যবিশ্ব শ্রেণী। কিন্তু বিশ শতকে শিক্ষিত মানুষের তুলনায় চাকুরির সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে। সর্বস্বহারা গ্রামীণ শিক্ষিত শ্রেণীর মানসিকতায় জায়গা করে নেয় অলসতা। ঔপনিবেশিক শাসকদের কেরানি-করা শিক্ষা ব্যবস্থা চাকুরিহীন

মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে তৈরি করল এভাবে—

"British Indian educational system has fostered a sophisticated, over- literary mind, promoted drift from the manual to the soft occupations and blocked and adoptive social and economic transformation". ২০

এই সর্বস্বহারা মধ্যবিত্ত শ্রেণী সমাজের নানা প্রতিকূল অবস্থানের জন্য জীবনে তীব্র আঘাত পায়। এই সময়ে, বিশেষতঃ শ্রমিক আন্দোলন, শিল্পধর্মঘট, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ - এসবের জন্য বাংলার অর্থনৈতিক মেরুদণ্ডকে ভেঙে দেয়। মধ্যবিত্ত জীবনে নেমে আসে এক তীব্র আঘাত। এই সময়ের একটি সরকারী রিপোর্টে দেখা যায় —

"..... The middle classes who subsist by professional or clerical employment were hard hit by the rise of prices. .... The pressure of high prices on these classes was indeed .....". ২১

বিশ্বশতকে আধুনিক বাংলার রূপগঠনে শিল্পের ভূমিকা অপরিসীম। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর্বেই শিল্পের বিশেষ অগ্রগতি হয়। এ সম্পর্কে সমালোচক আর. সি. যোশী বলেছেন —

"From the beginning of this century, especially since the last world war (1st world war) spectacular progress in industrialisation has been made in the

country". ২২

শিল্পের দ্রুতগামী প্রসারের ফলে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে বাংলার সমাজজীবনে তার প্রভাব পড়েছে। এই সময়ে শহরাঞ্চলে দ্রুতহারে জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় জনসাধারণের স্বাস্থ্য সম্পদের অবনতি ঘটে, সমাজে দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ, দুঃখ-দারিদ্র্য ও মন্বন্তর। এরই সঙ্গে যুক্ত হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের করাল আক্রমণ। মধ্যবিত্তরা বেকারত্বের জ্বালায় আত্মহত্যা করতেও পিছপা হয়নি। গ্রাম বাংলা থেকে আরম্ভ করে শিল্পাঞ্চলের শ্রমিক শ্রেণীর মানুষের জীবনে যেমন নেমে আসে রিক্ততা, শূন্যতা তেমনি মধ্যবিত্তের জীবনে নেমে আসে দারিদ্র্য ও কৃচ্ছ্রসাধনা। এই বাস্তব চিত্রটি বিশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকের বিভিন্ন উপন্যাসে আপন রূপে ধরা পড়েছে।

বিশ শতকে গ্রাম-বাংলায় ম্যালেরিয়া, শিল্পাঞ্চল ক্ষয়রোগ আমাদের আধুনিক জীবন পরিসরে বৃহৎ রোগ হিসেবে উপস্থিত হয়। এই সময়ের একটি স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়—

"At least a hundred million people suffered from malaria every year, and either directly or indirectly two million annually died of it". ২৩

ঔপনিবেশিক শাসক সম্প্রদায়ের প্রত্যক্ষ সাহায্য-সহযোগিতায় এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রসারিত হওয়ার ফলে কিছুটা হলেও মহামারী প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়। এছাড়াও সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ও অন্যান্য কারণে বাংলার সমাজ ব্যবস্থাকে দুর্বল করে তুলে।

বিশ শতকের বিভিন্ন সংঘাতে বাঙালির সমাজ-জীবন, মানবীয় সত্তা, রীতি-নীতি সবকিছুতেই ভাঙন ধরে। এছাড়াও বাঙালি তথা ভারতীয় সমাজে দীর্ঘদিন থেকে চলে আসা

ঐতিহ্যস্বরূপ বর্ণভেদ প্রথা ও একান্নবর্তী সংসার ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। ঔপনিবেশিক শাসকদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিচার ব্যবস্থা সমাজের উচ্চবর্ণের হাত থেকে নিম্নবর্ণের মানুষ কেড়ে নেয়। ফলে নিম্নবর্ণের মানুষ আগের মত উচ্চবর্ণের কর্তা-ব্যক্তিদের ভয় ও শ্রদ্ধা করেনি। মানুষের মধ্যে জেগে ওঠে আত্মস্বাতন্ত্র্যবোধ। যন্ত্র সভ্যতা, শিল্পের প্রসার ও বাণিজ্য বিস্তারের ফলেও ব্যক্তি তার জাতিগত কর্মকে ত্যাগ করে ব্রিটিশ সরকারের চাকুরি ও ব্যবসার মাধ্যমে নতুন নতুন ক্ষেত্রে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে থাকে। এই সময়ে অর্থাৎ দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে নীচবর্ণের মানুষ চাকুরি বা ব্যবসা করে বিজ্ঞান হতে থাকে এবং একসময়ের প্রতিপত্তিশালী ব্রাহ্মণ সমাজের ঐতিহ্যগত পুরোহিতগিরি পেশাও কিছুটা নিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ায় এই সমাজেও দেখা দেয় দারিদ্র্য, বেকারত্ব। ধীরে ধীরে এই সম্প্রদায় সমাজে গুরুত্ব হারাতে থাকে। ফলে তারাও নিজ জাতি গৌরবকে ভুলে গিয়ে নিম্নবর্ণের পেশা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

এভাবেই, উনিশ শতকে যে পরিস্থিতি বাঙালি মধ্যবিত্তের তথা বাংলার নবজাগরণের অনুকূল ছিল, বিশ শতকের কিছু আগে থেকেই একটু একটু করে সেই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে শুরু করে। উনিশ শতকে যেখানে উচ্চবর্ণের মানুষ বিনা প্রতিযোগিতায় সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, উপার্জন করেছে - সেখানে বিশ শতকে এসে তাঁরা নিম্নবিত্ত ও ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে কঠিন প্রতিযোগিতায় সামিল হয়েছে।

পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানসিকতারও পরিবর্তন ঘটে এবং স্বাভাবিকভাবেই সাহিত্যের উপর এর প্রভাব পড়বে। বিশেষতঃ বিশ শতকের গল্প-উপন্যাসে সমাজ-পরিবর্তনের এই বিশেষ ছাপ লক্ষ করা যায়। একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙনের ছবি কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাসে খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপিত। শহরমুখী জীবনের প্রতি, প্রতীচ্যের

জীবনচর্যার প্রতি মুগ্ধতা এবং সেইসঙ্গে দেশের সঙ্গে বিচ্ছেদের ছবি পাওয়া যায় কল্লোল - কালিকলম - প্রগতির সময়কার সাহিত্যিকদের সন্দর্ভের মধ্যে। ব্যক্তিগতভাবে এইসব সাহিত্যিকরা প্রতীচ্যের শিক্ষায় শিক্ষিত, ঔপনিবেশিক সত্তাভিমুখী। তারা মনে-প্রাণে নাগরিক কিংবা নাগরিক হওয়ার প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। তবে কমবেশি ছিন্নমূল। এই বিচ্ছিন্নতাকে এঁরা আধুনিকতা হিসেবে গ্রহণ করেছে। শুধু সমাজের বিচ্ছিন্নতা নয়; নিজের ব্যক্তিগত জীবনের বিচ্ছিন্নতা ও নানা-ধরনের উপকরণ এঁদের সাহিত্যিক প্রতিবেদনে স্থান পেয়েছে। এসব সাহিত্যিকদের রচনায় আমরা উনিশ শতক ও বিশ শতকের পার্থক্য লক্ষ করি। রবীন্দ্রনাথের 'গোরা', 'চতুরঙ্গ' কিংবা 'শেষের কবিতা' উপন্যাস পাঠ করলেই এই দুই শতকের পার্থক্য আমাদের সামনে ফুটে ওঠে।

বিশ শতকের তিনের দশক থেকে পাঁচের দশক পর্যন্ত (১৯২১-১৯৫০) এই ত্রিশটি বছর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক স্বর্ণময় অধ্যায়। এই সময়ে ইউরোপ দেশের মানচিত্রের ভূমিক ভাঙন, সমাজতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনার প্রসার, বর্ণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, ঈশ্বর-প্রকৃতি-লোকায়তদর্শন নিয়ে নতুন চিন্তা-ভাবনা, নাগরিক চেতনা ও নগরায়নের ক্রমপ্রসার, মনোবিকলন ও মানব মনের দুর্জ্জ্বল রহস্য উন্মোচন, অস্থির মনোভাব ও নাস্তিক্য চেতনার কালোছাপ, যৌনচেতনা ও অপরাধপ্রবণতা, যৌথ পরিবারের ভাঙন, অলৌকিক শক্তির তথা ঈশ্বরের পরিবর্তে ব্যক্তি আমি আধিপত্য, ভোগ-বিনাস জাতীয় জিনিষপত্রের অবিশ্বাস্য বাহার - এসব নিয়ে এই সময়কার সাহিত্যকে বিচিত্র বর্ণরূপ চমকিত করে। এই সময়কার কথা সাহিত্যিকদের রচনায় ফুটে উঠেছে সমকালীন সময়ের একমুখীন বৈশিষ্ট্যগুলি -

(১) ত্রিশ থেকে পঞ্চাশের দশকের প্রধান কুশীলবরা বাস্তবঘেঁষা, চিন্তাশীল। অন্তর্মুখীন,

উদ্ভাস্ত নয়। তাদের মধ্যে মানসিক দ্বন্দ্ব ও জটিলতা রয়েছে। তবে এ ধরনের দ্বন্দ্ব অতিক্রমণের চেষ্টাও রয়েছে।

- (২) উপন্যাসের শৈলীর পরিবর্তন ঘটে নাটকীয়তা, চিত্রধর্মিতা ও আঞ্চলিকতা স্থান পেয়েছে।
- (৩) উনিশ শতকে নব্যসৃষ্ট কর্মবিমুখ ও বুদ্ধিসর্বস্ব মধ্যবিত্তের চূড়ান্ত অবনমন ঘটে বিশশতকে এসে। যৌথ পরিবারের ভাঙন, জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে গ্রাম থেকে শহরাভিমুখী হয় এবং শহরের আধুনিক উপকরণ গ্রামের মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়ে গ্রামের স্বতন্ত্রতা নষ্ট করা - এসবই ছিল তৎকালীন লেখকদের লেখার বিষয়বস্তু।
- (৪) রুচিবিকার ও বিকারগ্রস্থ মনের অতৃপ্ত, অবৈধ যৌন সম্পর্ক ও সম্ভোগ - এসব উপন্যাসে স্থান পেয়েছে।
- (৫) দেশবিভাগ, দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ - এসবও উপন্যাসে স্থান পেয়েছে।
- (৬) প্রান্তিকায়িত তথা অন্ত্যজ মানুষের কথা উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে।
- (৭) প্রাচীন ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, লোকাচার, আচার-আচরণ, রীতি-নীতি এককথায় প্রান্তিকায়িত শ্রেণীর বা জীবন সম্পৃক্ত তা-ই উপন্যাসে স্থান করে নেয়। এছাড়াও অনেক বৈশিষ্ট্য বিশ শতকের সাহিত্যের মধ্যে দেখা যায়।

বিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে যে নতুন প্রজন্ম বাংলা সাহিত্যের পাদপ্রদীপের আলোয় আলোকিত হন, তাঁদের প্রায় সবার-ই লক্ষ্য ছিল নিজ নিজ কক্ষপথে ঘুরে জীবনের তাৎপর্য ও রহস্য খুঁজে বের করা। এই সময়ে তারাসঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় উপস্থিত হন। এই তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমকালে আরও কয়েকজন বড়মানুষের কথাশিল্পীকে আমরা বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় পাই।

এইসব উল্লেখযোগ্য কথাশিল্পীরা হলেন বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত, প্রবোধ কুমার সান্যাল, সুবোধ ঘোষ, মনোজ বসু, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ী, জীবনানন্দ দাশ প্রমুখ। এঁদের মধ্যে অনেকেই উঁচু মানের কথাশিল্পী হলেও প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। এই সময়েই যে আধুনিকতার লক্ষণ তৈরি হয়েছিল তার একটি বিশেষতা হয়ে উঠেছে নাগরিকতা ও নগরজীবন অভিমুখিতা। এঁদের মধ্যে অনেকের প্রতিবেদনে গ্রাম-বাংলার কথা থাকলেও এসবের প্রেরণার উৎস ছিল নগরজীবন। এই শতকের আধুনিকতার একটি ধারা যেমন নগর অভিমুখী, জটিলতা অভিমুখী, ঠিক তেমনি এই আধুনিকতার আরেকটি ধারা ছিল এর বিপরীতমুখী। অথাৎ গ্রাম-বাংলা ও কৃষিজীবন অভিমুখী, জনজীবন অভিমুখী; যাকে এককথায় আমরা ঐতিহ্যমুখী বলতে পারি।

বঙ্কিমচন্দ্র - রবীন্দ্রনাথ - শরৎচন্দ্র পরবর্তী বাংলা কথাসাহিত্যে তিন বন্দ্যোপাধ্যায়-ই প্রায় একই সময়ে আবির্ভূত হন এবং এই তিনজন তিনটি গিরিশৃঙ্গের ন্যায় সাহিত্যের আঙিনায় বিরাজিত। উপন্যাসের জগতে তারাশঙ্করের হাতেকড়ি একটু দেরিতে হলেও ১৯৩৫ এর মধ্যে তিনি বেশ কিছু উঁচুমানের ছোটগল্প লিখে ফেলেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই সময়ের মধ্যে ‘পদ্মানদীর মাঝি’র মত সফল উপন্যাস রচনা করেন। আর বিভূতিভূষণ উপন্যাস, ভ্রমণ সাহিত্য - এসব রচনা করে সাহিত্যের জগতে এক নতুন আলোড়নের সৃষ্টি করেন। এই তিনজন রবীন্দ্র-শরৎের যুগে আবির্ভাব হয়েও রবীন্দ্র-শরতের আধুনিকতার ঝড় সাহিত্যিক পরিসরে নিয়ে আসেন। তারাশঙ্কর গ্রাম-বাংলার প্রান্তিকায়িত মানুষের মধ্যে মুক্তির সন্ধান পান। বিভূতিভূষণ পল্লীবাংলার প্রকৃতি, গভীর জঙ্গলের সহজ-সরল মানুষের মধ্যে এক নতুন সত্য আবিষ্কার করলেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মানব-মনের অসচেতনার জটিলতায় এক নতুন



সত্যের সামনে দাঁড়ান।

এই তিন কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে যতটুকু মিল রয়েছে তারচেয়ে বেশি রয়েছে অমিল।

তাঁদের বিশ্ববীক্ষার পার্থক্য নিয়ে সমালোচক শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন -

“বিভূতিভূষণ যে মানব জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন তা সারল্যে অসাধারণ। শরৎচন্দ্রের বহু নরনারীতে জটিলতা আছে, বিভূতিভূষণে নেই। শ্রেণী হিসেবে বিভূতিভূষণের মানুষেরা অধিকাংশ নিম্নমধ্যবিত্ত। এই নিম্নমধ্যবিত্তদের নিয়ে লিখতে গিয়ে ‘জননী’তে বা পুতুলনাচে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অতিরিক্ত জটিল, কখনো সঙ্কেতাশ্রয়ী। তারাশঙ্করের লোকজন একেবারে নিম্নস্তরের শ্রমজীবী, অথবা পড়ন্ত জমিদার। মনস্তাত্ত্বিক জটিলতায় মানিকের সমকক্ষ না হলেও বিভূতিভূষণের তুলনায় এমনকি শরৎচন্দ্রের তুলনায়ও তারাশঙ্কর এগিয়ে। তারাশঙ্করের মানুষেরা একটু বেশি আদিম বলিষ্ঠ বিকৃত বর্বর। মানিকবাবুর শ্রমজীবীরাও যেমন, ‘পদ্মানদীর মাঝি’তে বাইরে অনেক শান্ত, ভেতরে যদিও বক্র। বিভূতিবাবুর মানুষেরা সরল শান্ত ক্ষুদ্র, প্রাত্যহিক জীবনের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে যখন তারা অরণ্যচারী, তখনো সহিষ্ণু এবং নির্বিরোধ।” ২৪

এই সময়ের প্রত্যেক কথাশিল্পী জীবনের নানা রঙে অলঙ্কিত বা অল্পলঙ্কিত দিকে আলো ফেলে তাকে নিরীক্ষণ করতে উৎসাহী হন এবং তাঁরা নানাধরনের বিচরণভূমি থেকে পুনর্নির্মাণের সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করেন। প্রচলিত রীতি-নীতি তথা ঐতিহ্যকে ভেঙে নতুন বয়ন তৈরি করা এসব সাহিত্যিকদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। এসব সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রধান হলেন

ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি যখন বাংলা উপন্যাসের জগতে পদার্পন করেন তখন বাস্তবতার প্রতিকূলতা- অনুকূলতায় বিক্ষুব্ধ ও বিপন্ন। এই দোলাচল অবস্থায় নতুন এক পরিসর নিয়ে সাহিত্যের আঙিনায় তিনি উপস্থিত হন। এ সম্পর্কে সমালোচক দীপঙ্কর মল্লিক লিখেছেন -

“দেশজ সংস্কৃতি, বৃহত্তর পল্লীবাংলার চিরপরিচিত ছবি, প্রকৃতির স্নেহাঞ্চলে ফিরে আসার আহ্বান বিভূতিভূষণের কথাশিল্পে বক্ষ্যমান।”<sup>২৫</sup>

বিভূতিভূষণ যে আধুনিকতার পরিসরকে তার উপন্যাসে স্থান দিয়েছেন তা সমকালীন ইউরোপীয় আধুনিক পরিসর থেকে আলাদা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বাংলাদেশে ঔপনিবেশিক শাসকের শোষণ, শিল্প প্রসার ও যন্ত্রপ্রগতি, বিশ্বযুদ্ধের প্রচণ্ড অভিঘাত, দারিদ্র, মহামারী প্রভৃতি কারণে বাংলাদেশ তথা ভারতীয় সমাজে ও জীবনে ব্যাপক ভাঙন ও অবক্ষয় দেখা দেয়। সেইসঙ্গে অন্তরের শূণ্যতা ও শুষ্কতা বৃদ্ধি পায় এবং মানবীয় মূল্যবোধগুলি বিপর্যস্ত হয়। এসব দুরাবস্থা যুদ্ধোত্তর পর্বের আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু আমাদের এই অর্থনৈতিক ও সামাজিক দুরাবস্থার পাশাপাশি ছিল একটি ব্যাপক জাতীয় জাগরণ ও আত্মিক অভ্যুত্থান। এই জাগরণের প্রকাশ ঘটেছে জাতীয় আন্দোলনে, নানাধরনের সামাজিক সংস্কার, পিছপড়া সম্প্রদায়ের সংঘবদ্ধ অধিকার প্রতিষ্ঠায়, ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে ভারত-আত্মার চিরকালীন বাণীর পুনর্যোষণায় এবং শিক্ষা ও দর্শনে নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও আশাবাদী মতবাদের জন্ম ও প্রতিষ্ঠায়।

ঔপনিবেশিক প্রক্রিয়া থেকে জন্মজাত আধুনিকতার সঙ্গে বিভূতিভূষণের আধুনিকতা তথা ভারতীয় আধুনিকতার মিল নেই। ভারতীয় আধুনিকতা নিয়ে সমালোচক সুজিৎ চৌধুরী

বলেছেন -

“ঔপনিবেশিক পটভূমিতে দেশজ উৎস থেকে রস সংগ্রহ করে যে চিন্তা-চেতনা এদেশের অতীত ও বর্তমানকে নূতন করে বুঝতে চেষ্টাছিল তাই হচ্ছে যথার্থ ভারতীয় আধুনিকতা।” ২৬

তিনি বাংলার প্রকৃতিকে নতুনরূপে, নতুনভাবে জারিত করে উপন্যাসের প্রতিবেদনে উপস্থাপিত করেছেন। এ সম্পর্কে সমালোচক প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন -

“..... প্রকৃতিকে জীবনের উপাদান রূপে গ্রহণ ও স্বীকার নূতন যুগের লক্ষণ, সে নূতনযুগ এখনও পুরাতন হয় নাই। .... এই উপাদানটি সবচেয়ে বেশি আধুনিক, শ্রমিক-ধনিক সংঘাত বা সর্বজনীন অসন্তোষের চেয়েও অনেক বেশি আধুনিক।” ২৭

রবীন্দ্রনাথের পরে বিভূতিভূষণই সবচেয়ে বেশি প্রকৃতিকে নিয়ে ভেবেছেন এবং লিখেছেন। ঔপনিবেশিক পরিবেশ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তিনি প্রকৃতিকে গ্রহণ করেছেন। প্রকৃতিকে উপন্যাসের মূল উপাদান হিসেবে গ্রহণ করার বিষয় নিয়ে তিনি নিজেই ‘তৃণাকুর’ বইটিতে লিখেছেন -

“প্রকৃতির নিরাবরণ মুক্তরূপের স্পর্শে এই অনুভূতি খোলে। ..... প্রকৃতি তাই আমার বড় বিশল্যাকরণী - মৃত মূর্ছিত চেতনাকে জাগ্রত করতে অতবড় ঔষধ আর নাই।” ২৮

তাই বিভূতিভূষণের রচনায় প্রকৃতি শুধু প্রাকৃতিক বর্ণনায় উপস্থিত নয় ; এই প্রকৃতি তথা প্রাকৃতিক বর্ণনার মধ্যে রয়েছে গভীর জীবনবীক্ষা।

তাঁর এই জীবনবীক্ষার পরিসরে ফুটে উঠেছে উনিশ শতকের শেষভাগের বিশেষতঃ বিশ শতকের সমাজ জীবনের দ্বিবাচনিক সত্তার দ্বান্দ্বিক পরিসর। সমকালীন সময়ের গ্রাম-বাংলার সামাজিক জীবন, কৌলিন্য-প্রথা, সহমরণ প্রথা, অনেক নারীকে বিয়ে করা, পণপ্রথা-এইসব ছিল সামাজিক অসুখের আক্রমণ ও সংক্রমণের প্রতিচ্ছবি। তবে এসব সমস্যার বা প্রথার বিরুদ্ধেও সেসময়ে প্রতিবাদ উঠেছিল এবং তা ঔপন্যাসিক তাঁর উপন্যাসের প্রতিবেদনে তুলে ধরেছেন। গ্রাম্য জীবন যাপনের পরিবর্তে গড়ে ওঠে শহুরে সংস্কৃতি, শহরের প্রতি টান ও নব্য আধুনিকতার প্রতি ঝোঁক' এসবই বিভূতিভূষণের উপন্যাসের প্রতিবেদনে পাওয়া যায়। সমালোচক সৌরেন বিশ্বাস লিখেছেন –

“উনিশ শতকের গ্রাম-বাংলার জীবন ছিল অপেক্ষাকৃত নিরুদ্বেগ, শান্ত ও স্বাভাবিক। দুঃখ-দৈন্যের হাহাকার, জটিল সমস্যার আবেগে জীবনের মূল্যমানগুলির পরিবর্তন তখনও তেমন ভাবে ঘটেনি। ..... বিশ শতকের সমাজ নগরমুখী শিল্পবিকাশ প্রভাবিত জটিল এবং প্রকৃতিবিচ্ছিন্ন। এই সমাজের ভারকেন্দ্র গ্রামীণ কৃষি অঞ্চল থেকে বৃহৎ শিল্প এলাকায় সরে এসেছে। বিভূতিভূষণের উপন্যাসে এই বিবর্তনের ধারাটি সুস্পষ্ট।”<sup>২৯</sup>

বিভূতিভূষণ হলেন রবীন্দ্রোত্তর যুগের একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক তথা ঔপন্যাসিক। তাঁর জন্ম ১২-ই সেপ্টেম্বর ১৮৯৪ সালে কাঁচড়াপাড়া - হালিশহরের কাছে মুরাতিপুর গ্রামে। তাঁর মৃত্যু হয় ১লা নভেম্বর ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে। বিভূতিভূষণের সাহিত্যিক জীবনের উন্মেষ ঘটে কলেজ পত্রিকার একটি কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার মধ্যদিয়ে। এরপর তাঁর প্রথম গল্প

‘উপেক্ষিতা’ (১৩২৮) প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এটি শুধু তাঁর প্রথম গল্প নয়; এই গল্পে লেখকের মৌলিক চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটে। এই গল্পটি পড়ে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বলেছেন —

“তোমার গল্পটি বড়ই মনোরম হইয়াছে। রচনা যেমন সুসজ্জিত;  
তেমনি প্রাঞ্জল। ..... তুমি চেষ্টা করিলে এ বিষয়ে সুনাম অর্জন করিতে  
পারিবে।” ৩০

তিনি মাত্র একুশ (২১) বছরের সাহিত্যিক জীবনে অবিরাম সাহিত্যসৃষ্টি করে ৬১ টি গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। অপ্রকাশিত রচনার সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। তাঁর রচনার মধ্যে উপন্যাস, ছোটগল্প, ভ্রমণ ও দিনলিপি জাতীয় রচনা, অনুবাদাত্মক কাহিনী যেমন রয়েছে তেমনি কিশোরদের জন্য রয়েছে কিছু গল্প এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান জাতীয় পাঠকৃতি। তাঁর রচিত গল্পের সংখ্যা হল দুইশত উনিশটি (২১৯টি) এবং উপন্যাসের সংখ্যা হচ্ছে চৌদ্দটি (১৪টি)। বিভূতিভূষণের রচনা সম্পর্কে সমালোচক শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন —

“উপন্যাস ও ছোটগল্প, ভ্রমণ - দিনলিপি এবং কিশোরদের উপযোগী  
রচনা - গদ্য সাহিত্যে এই চারটি কীর্তিস্তম্ভের উপরে বিভূতিভূষণের  
সাহিত্যিক কৃতিত্ব। এই চারটি কিন্তু একে অপরের থেকে কোনো  
অর্থেই ভিন্ন নয়। সূত্রে, বিষয় নির্বাচনে, প্রশান্ত চিত্তের সহৃদয়তায়  
এগুলি যেমন সরস তেমনি জীবনরসে পূর্ণ।” ৩১

বিভূতিভূষণ যে চৌদ্দটি (১৪) উপন্যাস রচনা করেছেন, এগুলি হল ‘পথের পাঁচালী’ (১৯২৯), ‘অপরাজিত’ (১৯৩২), ‘দৃষ্টিপ্রদীপ’ (১৯৩৫), ‘আরণ্যক’ (১৯৩৯), ‘আদর্শ হিন্দু

হোটেল' (১৯৪০), 'বিপিনের সংসার' (১৯৪১), 'দুইবাড়ি' (১৯৪১), 'অনুবর্তন' (১৯৪২), 'দেবযান' (১৯৪৪), 'কেদাররাজা' (১৯৪৫), 'অথৈজল' (১৯৪৭), 'ইছামতী' (১৯৫০), 'দম্পতি' (১৯৫২) 'অশনিসংকেত' (১৯৫৯)। 'দম্পতি' ও 'অশনিসংকেত' উপন্যাস দুটি বিভূতিভূষণের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়। 'দম্পতি' (১৯৫২) উপন্যাসকে আমাদের আলোচ্য গবেষণা সন্দর্ভে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। আমাদের গবেষণা সন্দর্ভের কাঠামো অনুযায়ী বিভূতিভূষণের উপন্যাসগুলিকে পাঁচটি বর্গে বর্গীকরণ করতে পারি। এই বর্গগুলি হল — (১) ঔপনিবেশিক মনন ও আধুনিক চেতনার অমীমাংসিত দ্বন্দ্বভিত্তিক উপন্যাস : 'আরণ্যক' 'আদর্শ হিন্দু হোটেল', 'অনুবর্তন', 'অশনিসংকেত'; (২) ঔপনিবেশিক মনন থেকে আধুনিক চেতনার উত্তরণ : 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত'; (৩) ঐতিহ্য থেকে আধুনিক চেতনার দিকে অভিযাত্রা : 'দৃষ্টিপ্রদীপ', 'কেদাররাজা', 'ইছামতী'; (৪) কাঙ্ক্ষিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত জীবনের দ্বন্দ্বভিত্তিক উপন্যাস : 'বিপিনের সংসার', 'দুইবাড়ি', 'অথৈজল'; (৫) বিভূতিভূষণের দৃষ্টির রুদ্ধতামূলক উপন্যাস 'দেবযান'।

প্রণালীবদ্ধ আলোচনার জন্য অভিসন্দর্ভটিকেও পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে আলোচনা করা হল। প্রথম অধ্যায়ে বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' 'অনুবর্তন' ও 'অশনিসংকেত' - এই চারটি উপন্যাসের প্রতিবেদনের মধ্যে সমকালীন সময়ের অর্থাৎ ঔপন্যাসিকের ঔপনিবেশিক মনন ও আধুনিক চেতনা উপন্যাসের বিভিন্ন কুশীলবের মধ্যদিয়ে কিভাবে প্রতিফলিত তা আলোচিত হয়েছে। এই দুটি চেতনা সাহিত্য ও জীবনের মধ্যে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত থাকার ফলে খুব স্বাভাবিকভাবেই এক ধরনের দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। তবে এই দ্বন্দ্ব শেষপর্যন্ত আলোচ্য উপন্যাসের মধ্যে অমীমাংসিত থেকেছে-তা সবিস্তারে এই অধ্যায়ে আলোচনার

করার চেষ্টা করেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে লেখকের সাহিত্য জীবনের প্রথম উপন্যাস ‘পথের পাঁচালী’ ও দ্বিতীয় উপন্যাস ‘অপরাজিত’ এর মধ্যে লেখকের মানসিকতা ঔপনিবেশিক প্রক্রিয়া থেকে আধুনিক চেতনায় উত্তরণ ঘটেছে - তা আলোচনা করে দেখানো হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি, বিভূতিভূষণের ‘দৃষ্টিপ্রদীপ’, ‘কেদাররাজা’ ও ‘ইছামতী’ - এই উপন্যাস তিনটির মধ্যে লেখকের জীবনবীক্ষা চিরকালীন রীতি-নীতি তথা ঐতিহ্যকে বিনির্মাণ করে আধুনিক ভাবনায় অভিযাত্রা লক্ষ করা যায়। আমাদের মানসিকতায় যুগ যুগ ধরে প্রচলিত রয়েছে যে রীতি-নীতি সেই রীতি-নীতি নানাধরনের ঘাত-প্রতিঘাতে তথা বিনির্মাণের মধ্যদিয়ে আজও আমাদের মনে লালায়িত রয়েছে, তাকেই ঐতিহ্য বলা যায়। এই ঐতিহ্য বারবার ভেঙে যখন পুনর্নির্মিত হয়ে বিভিন্ন সম্মিশ্র সংগ্রহ করে নতুন পথে এগিয়ে যাওয়াকেই আধুনিক চেতনার দিকে অভিযাত্রা বলা যায়। এই অভিযাত্রা উল্লিখিত উপন্যাস তিনটিতে ফুটে উঠেছে এবং এই অধ্যায়ে তা আলোচিত করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করেছি, আমাদের কাঙ্ক্ষিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত জীবনের চাওয়া পাওয়া। পৃথিবীর প্রত্যেক বস্তুই মানবজীবনের ঈঙ্গিত। তবে অনেক সময় জীবনে কাঙ্ক্ষিত বস্তুটি পাওয়া যায় না কিংবা যা আমরা আকাঙ্ক্ষা করি না তা-ই জীবনে ঘটে যায়, যাকে বলা যায় অনাকাঙ্ক্ষিত। বিভূতিভূষণের রচিত ‘বিপিনের সংসার’ ‘দুইবাড়ি’ ও ‘অথৈজল’ উপন্যাস তিনটির মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে কাঙ্ক্ষিত পৃথিবীতে কিভাবে মানুষের জীবনে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে।

পঞ্চম অধ্যায়ে বিভূতিভূষণের দৃষ্টির রুদ্ধতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ‘দেবযান’

উপন্যাসটির মধ্যে ঔপন্যাসিকের দৃষ্টির সীমাবদ্ধতা তথা রুদ্ধতা যেভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তা যথাযথ ভাবে আলোচনার চেষ্টা করেছি।

এবার বিভূতিভূষণের ঔপনিবেশিক মনন ও আধুনিক চেতনার অমীমাংসিত দ্বন্দ্বভিত্তিক উপন্যাসগুলি নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করা যাক।



## উল্লেখ পঞ্জি : -

- ১। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, ১৯৯২, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাঃলিঃ, কল - ৭৩, পৃ : ১।
- ২। George Eliot : 'An Introduction to the English Novel, Vol-1' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, Page No. - 31।
- ৩। অন্নদা শঙ্কর রায় : 'যুগ জিজ্ঞাসা' প্রবন্ধ (বাংলা সঙ্কলন গ্রন্থ) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ কোর্সের জন্য।
- ৪। Sisir Chatterjee : 'The Novel As the Modern Epic' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, P - 3।
- ৫। Ralph Fox : The Novel and the people, Moscow Ed., 1954, P - 2।
- ৬। ড. বদরুল হাসান : 'উনিশ শতক : নবজাগরণ ও বাংলা উপন্যাস' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, ১৯৯০, জগৎমাতা পাবলিশার্স, কল- ৯, পৃঃ ৬।
- ৭। রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় : উনিশ শতকে নারী মুক্তি আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য, ১৯৯৯, পুস্তক বিপণি, কল - ৯, পৃঃ ৯।
- ৮। তদেব - গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, পৃঃ ১৬।
- ৯। তপোধীর ভট্টাচার্য : আধুনিকতা : পর্ব থেকে পর্বান্তর, ১৯৯৫, পুস্তক বিপণি,

## প্রথম অধ্যায়

### ঔপনিবেশিক মনন ও আধুনিক চেতনার অমীমাংসিত দ্বন্দ্ব

ঔপনিবেশিক মনন ও আধুনিক চেতনার অমীমাংসিত দ্বন্দ্বভিত্তিক উপন্যাস গুলি হল :-

‘আরণ্যক’, ‘আদর্শ হিন্দু হোটেল’, ‘অনুবর্তন’ ও ‘অশনিসংকেত’। ঔপনিবেশিক মনন ও আধুনিক চেতনা সম্পর্কে একটু আলোকপাত করে এই শ্রেণীর উপন্যাসগুলোর প্রত্যেকটি নিয়ে স্বতন্ত্র আলোচনা করা যাক।

ইংরেজি ‘Colonialism’ শব্দের বঙ্গানুবাদ ‘উপনিবেশবাদ’। ইংরেজি এই শব্দটিকে ব্যাখ্যা করলে আমরা দেখি অর্থনৈতিক, রাজনৈতিকভাবে বলীয়ান শক্তির শাসন, শোষণ, প্রভুত্ব চালানোর নীতিকেই ‘উপনিবেশবাদ’ বলা যায়। পূর্বে ঔপনিবেশিক শক্তি শাসন প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করত ; বর্তমানে তথ্য-প্রযুক্তি, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতির মধ্যদিয়ে তাদের নীতিকেই প্রয়োগ করে। এরফলে ঐতিহ্যগত রীতিনীতির বিনির্মাণ ঘটে। এই বিনির্মাণের মধ্যদিয়েই আবার আধুনিকতার সূচনা। এ জন্যেই উপনিবেশবাদের সঙ্গে আধুনিকতার সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। বঙ্গভূমিতে আধুনিকতার উৎস সম্পর্কে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত বলেছেন —

“The British conquest of Bengal was not merely a Political revolution, but brought in a greater revolution in thought and ideas, in religion and social progress. The Hindu

intellect came in contact with all that is noblest and most healthy in European history and literature and profited by it.”<sup>১</sup>

উপনিবেশবাদের সঙ্গে আধুনিকতার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ থাকলেও আধুনিকতার একটি অর্থ-স্বাভাবিকতার বিরোধিতা, সমাজের বিপরীত তাত্ত্বিকতা। আধুনিকতা শব্দটি তৈরি হয় ধারাবাহিকতা এবং পরিবর্তন, ঐতিহ্য এবং উদ্ভাবন বিষয়ক ইঙ্গিতময়তা থেকে। এজন্যেই বিশিষ্ট সমালোচক ড তপোধীর ভট্টাচার্য বলেছেন -

“স্ববিরোধিতা আর আত্মঘাত দিয়ে গড়ে উঠেছে ঔপনিবেশিক আধুনিকতার প্রতিবেদন ; প্রতিমূল্যবোধ ও প্রতিবাস্তবতার চাব হয়েছে সর্বত্র। ”<sup>২</sup>

প্রতীচ্যের সভ্যতার ছোঁয়ায় ও সংঘাতে ভারতীয় সমাজের মধ্যে বিশেষতঃ বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে রূপান্তর আরম্ভ হয়েছিল। তারপর জাতীয় জীবনের উত্তেজনাময় অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি, দুটি মহাযুদ্ধ, সমাজসত্তার অবক্ষয়, কল্লোলীয়া দেহবাদের উদ্ভূত সংরাগ যে পরিবর্তিত জীবনবৃত্ত রচনা করেছিল ; সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ তার মৌলস্বরূপটি ধরতে পেরেছিলেন।

বিভূতিভূষণ উপনিবেশসৃষ্ট আধুনিকতাকে গ্রহণ করেননি ; করেছেন ভারতীয় জীবনদর্শনজাত আধুনিকতাকে। বিশেষতঃ বলা যায় আধুনিকতা সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব ধারণা ছিল। পুরোনোকে তিনি নতুন ভাবে আবিষ্কার করেছেন। ভারতীয় আধুনিকতা সম্বন্ধে সমালোচক ইন্দ্রনাথ চৌধুরী লিখেছেন -

“The question of modernity in Indian Literature cannot

be settled entirely as an outcome of the Indian exposure of westernisation. It needs to be defined as an experience rooted to the soil. Indian modernity emerged out of the Indian writers' changing attitude towards the past and the present and their inter-relationship, which was formed under colonial dispensation.”<sup>৩</sup>

এই আধুনিকতা উপনিবেশজাত আধুনিকতারই একটি বিকল্প বিন্দু। বিভূতিভূষণের জীবনবীক্ষা গড়ে ওঠে, বিশেষ এক স্থান-কালের পটভূমিতে। তাঁর সাহিত্যিক পরিসর খণ্ডকাল থেকে অখণ্ডকালের দিকে এগিয়ে যায়। ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের চাপাকলে আমাদের জাতীয় জীবনের স্বাধীন বিকাশকে পঙ্গু করেছে, বিকৃত করেছে, বিভূতিভূষণ তার প্রতিবাদেই নিজের সাহিত্যিক পরিসর গঠন করেন। এই বিকল্প পরিসর গঠন করতে গিয়ে তিনি প্রকৃতির আশ্রয় নেন। তাঁর প্রকৃতি নির্ভরতা নিয়ে জনৈক সমালোচক বলেছেন –

“বিভূতিভূষণ সমাজের ভাঙনে আর ইতিহাসের পুনরুজ্জীবন পান না, তাই তিনি প্রকৃতিকে অবলম্বন করেন, গুরুত্ব দেন প্রায়- প্রাকৃতিক সেই মানুষদের ওপর যারা এই প্রকৃতির প্রসারণ, যারা ঐ ঔপনিবেশিক বাস্তবের বাইরে। ‘আরণ্যকে’র প্রকৃতি ও মানুষ তাই।”<sup>৪</sup>

‘আরণ্যক’ (১৯৩৮) উপন্যাসের পটভূমি বাস্তব আঁধারে রচিত। উপন্যাসের প্রথমেই অতীত ইতিহাসের এবং ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার কথা রয়েছে। উপন্যাসে শুধু গম্ভীর বনভূমি আর অরণ্যপ্রান্তের কিছু অজ্ঞান আরণ্যক ও গ্রামীণ মানুষের ছবিই নয়, এখানে একটি

বৃহৎ এবং তাৎপর্যপূর্ণ সত্য আত্মপ্রকাশ করেছে। এই সত্যটি হল বঞ্চনার এবং ক্ষুধার সত্য। বহু বৃগ বৃগ ধরে এই বঞ্চনা ও ক্ষুধার সত্য চলে আসছে। আধুনিক যুগে দ্রষ্টা চক্ষুদিয়ে এসব বঞ্চনা, দারিদ্র্য ও ক্ষুধাকে উপলব্ধি করা যায়। 'আরণ্যক' উপন্যাসের অরণ্য পরিসর এবং অরণ্য পরিসরের জন-জীবনকে দেখা হয় শিক্ষিত ও শহরে মধ্যবিত্ত চোখ দিয়ে। এই শহরে মধ্যবিত্ত সমাজ না পেয়েছে পুরোপুরি ঔপনিবেশিক প্রক্রিয়াকে গ্রহণ করতে, না পেয়েছে ঔপনিবেশিক প্রক্রিয়া থেকে উদ্ধৃত আধুনিকতাকে রপ্ত করতে। তবে ঔপনিবেশিক শাসক গোষ্ঠী বঙ্গভূমিতে আসার পর তাঁদের ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বাঙালির মানসিকতারও কম-বেশি পরিবর্তন হয়। তাঁদের সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়ে বাঙালি আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে। বৃহৎ সমাজ থেকে নিজেকে গুটিয়ে রাখে। আসলে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণী সবসময়ই এই বৃহৎ সমাজ থেকে দূরে থাকতে চায়। উপন্যাসের নায়ক সত্যচরণ বি. এ. পাশ। উচ্চশিক্ষিত হয়েও সে দীর্ঘদিন থেকে কর্মহীন। কর্মহীন করে রাখা-ই ঔপনিবেশিক প্রভুদের বিশেষ কৌশল। ইউরোপীয় শিল্প বিপ্লবের সময় ভারতবর্ষে প্রচুর শিল্প স্থাপনের সুযোগ ছিল। তবে তা বাস্তবায়িত হয়নি। তবে মনে রাখা দরকার পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সংস্পর্শেই এদেশে সমাজ পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। বলাবাহুল্য তা অবশ্য তাদের সচেতন প্রয়াস নয়, বস্তুত তা তাঁদের স্বার্থ উদ্ধারের প্রয়োজনেই সূচিত হয়েছে। এ সম্পর্কে কার্লমাক্সের একটি মন্তব্য এখানে উল্লেখনীয় –

“England, is true, in causing a social revolution in  
Hindusthan was actuated only by the vilest interests .....  
whatever may have been the crime of England she was

the Unconscious tool of history in bringing about that revolution.”<sup>৫</sup>

স্রুত অর্থে ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থে এই বিপ্লবকে বড় হয়ে ওঠার সুযোগ না দিয়ে মাঝপথেই বিপ্লবের রাশ টেনে ধরে। শিল্পায়ন গড়ে উঠুক, দেশীয় পুঁজির ভিত্তি শক্তপোক্ত হয়ে ব্রিটিশের পুঁজির প্রতিদ্বন্দ্বী হোক-এটা কখনও ঔপনিবেশিক শক্তি চায়নি। উপনিবেশে নগরায়ন কিংবা শিল্পায়ন ঘটবে তাদের নিজেদের প্রয়োজনে, সচেতন ভাবে দেশীয়দের জন্যে তা হবে না - এই দ্বিবাচনিক প্রক্রিয়াই ঔপনিবেশিক শক্তির স্বাভাবিক প্রয়াস।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির দুমুখো নীতির জন্য বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ঐতিহ্যে ধস নামে। বাংলার তাঁত ও চরকার কুটির শিল্প, পারিবারিক শিল্প - এ সব কিছু নিয়ে যে ঐতিহ্যগত অর্থনীতির বনিয়াদ ছিল, তা ধ্বংস করে দিয়ে গড়ে ওঠে ঔপনিবেশিক অর্থনীতির বনিয়াদ। তাই এই উপন্যাসের মধ্যে আমরা দেখতে পাই ব্রিটিশদের সঙ্গে যুদ্ধের পর দোবরুপান্নার মত মহাপরাক্রমশালী রাজা কিংবা রাজ-পরিবারের অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয়রূপ ধারণ করে। লেখকের ভাষায় বলা যায় -

“তাহাকে গরু চরাইতে দেখিয়া প্রথমটা আশ্চর্য হইয়াছিলাম বটে, কিন্তু পরে মনে ভাবিয়া দেখিলাম, ভারতবর্ষের ইতিহাসে রাজা দোবরুপান্নার অপেক্ষা অনেক বড় রাজা অবস্থা বৈগুন্যে গোচারণ অপেক্ষাও হীনতর বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন।”<sup>৬</sup>

উপন্যাসের নায়ক সত্যচরণ আরণ্যক প্রদেশে আসার পর প্রথমদিকে তার মন বসেনি। তার উড়ু উড়ু মন দেখে কাছারির পুরানো কর্মী গোষ্ঠীবাবু বলেন -

“জঙ্গল আপনাকে পেয়ে বসবে। কোন গোলমাল কি লোকের ভিড়

ক্রমশ আর ভাল লাগবে না।” ৭

কিন্তু সত্যচরণ ভাবে আরণ্যক অঞ্চলে কোনও মানুষ নেই, লোক নেই, এদেশের সবাই বর্বর, মূর্থ মানুষ। তাই, সে চাকুরিতে ইস্তাফা দিয়ে আধুনিক শহর কলকাতায় ফিরে যেতে চায়।  
ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণের ভাষায় বলা যায় –

“..... একখানা লম্বা পত্র লিখিয়া চাকুরিতে ইস্তাফা দিয়া কলিকাতায়  
ফিরিয়া গিয়া সভ্য বন্ধুবান্ধবদের অভ্যর্থনা পাইয়া, সভ্য খাদ্য খাইয়া,  
সভ্য সুরের সঙ্গীত শুনিয়া, মানুষের ভিড়ের মধ্যে ঢুকিয়া, বহু মানবের  
আনন্দ-উল্লাসভরা কণ্ঠস্বর শুনিয়া বাঁচিব।” ৮

‘সভ্য’ শব্দটির মধ্যে লুকিয়ে আছে ঔপনিবেশিক চেতনা। ‘সভ্য’ ও ‘অসভ্য’ শব্দ দুটি দিয়ে  
সমাজকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। ‘সভ্য’ হচ্ছে বিত্তবান শাসক শ্রেণী আর ‘অসভ্য’ কে  
বলা যায় শোষিত, নিম্নবর্ণ শ্রেণীর মানুষ।

সত্যচরণ জমিদারের আদেশে বন-জঙ্গলের সৌন্দর্য ধ্বংস করে, প্রজাপত্তন করে,  
বসতি ও টোলা সৃষ্টি করে এক ঔপনিবেশিক জগতের সৃষ্টি করে। প্রকৃতির ধ্বংসে সত্যচরণ  
আশ্বেপ করে। প্রকৃতিকে রক্ষা করার জন্য সে প্রকৃতি প্রেমিক যুগলপ্রসাদকে মাসিক দশ  
টাকায় নিযুক্ত করে। যুগলপ্রসাদ নিঃস্বার্থে বিশাল অরণ্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য নিজেকে  
নিয়োজিত করে। তার কাছে সত্যচরণ শুনে –

“..... লবটুলিয়াতে যত বনের ফুল দেখেন, ফুলের লতা দেখেন,  
ও-সব আমি আজ দশ-বারো বছর আগে কতক পূর্ণিয়ার বন থেকে,

কতক দক্ষিণ ভাগলপুরের লছমীপুর স্টেটের পাহাড়ী জঙ্গল থেকে  
এনে লাগিয়েছিলাম। এখন একেবারে ও-সব ফুলের জঙ্গল বেঁধে  
গিয়েছে।” \*

এসব লতাপাতার পরিচর্যায় উৎসর্গীকৃত পুরুষ যুগলপ্রসাদ আরণ্যক সমাজ উদ্ভূত চরিত্র।  
সত্যচরণ জানে সরস্বতী কুণ্ডীর শেষ পরিণাম ভয়াবহ, তাসত্ত্বেও সে মহালিখারূপ পাহাড়ের  
প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে রক্ষা করার জন্য যুগলপ্রসাদের সহযোগী হয়। অনুরূপভাবে তথাকথিত  
পাগল কবি বেক্টেশ্বর প্রসাদের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে। বেক্টেশ্বরের স্বরচিত কবিতা পাঠ  
সত্যচরণ মনদিয়ে শুনে। দেহাতী নৃত্যশিল্পী ধাতুরিয়ার নাচ-গানও তাকে মুগ্ধ করে। ধাতুরিয়াকে  
পুরস্কার স্বরূপ কিছু জমি দিতে চায় সত্যচরণ। এরূপ দান করাই একধরনের ঔপনিবেশিক  
মানসিকতার কাজ। কিন্তু ধাতুরিয়া নৃত্যশিল্পী, চাষবাসে তার মন নেই। হঠাৎ-ই একদিন ট্রেন  
দুর্ঘটনায় শিল্পী ধাতুরিয়ার মৃত্যু ঘটে। ধাতুরিয়ার মৃত্যু সত্যচরণের কাছে ছিল অজ্ঞাত।  
দারিদ্র্যের মধ্যে থেকেও ধাতুরিয়া ছিল একজন সৎ, নির্লোভ ও খাঁটি নৃত্যশিল্পী। ঔপনিবেশিক  
যুগেও সে পুরনো ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে চেয়েছে, ফলে পুরনো ঐতিহ্যপূর্ণ নাচ নিখতে  
আগ্রহী। ঔপনিবেশিক সমাজে বসবাস করেও ধাতুরিয়া ঔপনিবেশিক মনন থেকে অনেক দূরে  
ছিল। এজন্যেই হয়তো লেখক ধাতুরিয়াকে উপন্যাসের পরিসর থেকে সরিয়ে দেন।

গরীব, নিঃস্ব ব্যক্তি রাজপুঁড়ে দরিদ্র অথচ কবিতা লেখা, আকাশ দেখা, এ সব-ই ছিল  
তার প্রিয় বিষয়। সে ছিল ঈশ্বরবিশ্বাসী। ঔপনিবেশিক শিক্ষা-সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত না  
হলেও রাজপুঁড়ে সমাজবিদ্যুত কুষ্ঠরোগাক্রান্ত গিরিধারীলালকে ঐতিহ্যপূর্ণ চিকিৎসার দ্বারা সুস্থ  
করে তুলে। ঔপনিবেশিক শিক্ষা-সংস্কৃতি ভারতীয় সমাজে নতুন আলোর সন্ধান দেয়।



গিরিধারীলালকে সুস্থ করার অন্তরালে প্রান্তিকায়িত নারী কুস্তার অবদান অপরিসীম। প্রান্তিকায়িত নর-নারীর জগৎ সম্বন্ধে লেখক সত্যচরণের মুখ দিয়ে বলেন -

“ রাজু, কি গণু মাহাতো, কি জয়পাল - এ ধরনের মানুষ আরও অনেক আছে জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে - ইহাদের মধ্যে একটি নূতন জগৎ দেখিতাম, যে জগৎ আমার পরিচিত নয়।” ১০

এখানে দুটো জগতের বৈপরীত্যের কাহিনী রয়েছে - একটি কথক সত্যচরণের পরিচিত ঔপনিবেশিক জগৎ আর অন্যটি প্রান্তিকায়িত শ্রেণীর জগৎ তথা আরণ্যক জীবন কাহিনী। আরণ্যক জীবন পরিসরের সঙ্গে সত্যচরণের কোনও পরিচিতি ছিল না। চাকুরিসূত্রে অরণ্য প্রদেশের মানুষের সঙ্গে পরিচিতি ঘটলেও মানসিকতার পার্থক্য থেকে যায়। অরণ্য অঞ্চলের মানুষের আচার-আচরণ, খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান, লোকাচার, ধর্মবিশ্বাস সবকিছুতেই রয়েছে ভিন্নধর্মিতা। অরণ্য অঞ্চলে সত্যচরণ এসেছে শহরে আধুনিক মানসিকতা নিয়ে। এই আধুনিক মানসিকতার অন্তরালে রয়েছে ঔপনিবেশিক আধিপত্যবোধ। শহর থেকে সে সাময়িক বিচ্ছিন্ন হলেও অরণ্যপ্রদেশে এসেও শহরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

সত্যচরণ শহর থেকে অনেক দূরে অরণ্য প্রদেশে চাকুরি করলেও সে নাগরিক জীবন ঘাপনে অভ্যস্ত। সে শুধু শহরের শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট নয় ; শহর-ই এই অরণ্য প্রকৃতির নিয়ামক। জমির মালিকের নির্দেশ-ই শহরের নির্দেশ। মালিক পক্ষ-ই হচ্ছে প্রকৃত শাসক। তাঁর মুখেই আমরা জানতে পারি -

“আমার উপরওয়ালারাক্রমাগত আমাকে চিঠি লিখিয়া তাগাদা করিতে লাগিলেন, কেন আমি এখানকার জমি প্রজাবিলি করিতেছি না।” ১১

প্রজাদেরকে জমি বিলি, তাদের ভালো-মন্দ ও কাজ-কর্মের উপর ঔপনিবেশিক শাসকের মত সত্যচরণ নজরদারী করে। ঔপনিবেশিক শাসকের মত আচার-আচরণ করলেও সে উদার প্রকৃতির লোক। অরণ্যবাসী নিঃস্ব-অসহায় মানুষের প্রতি তাঁর অপরিসীম স্নেহ-মমতা। মানুষের প্রতি স্নেহ-মমতা প্রকাশ করা একধরনের ঔপনিবেশিক মানসিকতার-ই প্রতিফলন। এখানে বিশিষ্ট তাত্ত্বিক মিশেল ফুকোর একটি মন্তব্য উল্লেখনীয় –

“It is a type of power which is constantly exercised by means of surveillance rather than in a discontinuous manner by means of a system of levies or obligations distributed over time.”<sup>১২</sup>

ইতিহাসের পটভূমিকায় দেখা যায়, বহিরাগত আর্যরা ভারতবর্ষে এসে আদিম জাতি অনার্যদের উপর নিজ শাসন চাপিয়ে দেয়। এমনকী, অনার্যদের অস্তিত্বকে আর্যরা কখনও গুরুত্ব দেয়নি এবং তাদেরকে নিম্নশ্রেণীর মানুষ হিসেবে গণ্য করত। সত্যচরণও অরণ্য অঞ্চলের মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিকে মেনে নিতে চায়নি। সে বলে –

“..... সম্পূর্ণ বন্ধনমুক্ত, ব্রাত্য ইহাদের জীবন - সমাজ নাই, সংসার নাই, ভিটার মায়া নাই .... বড় নদীর নির্জন চরে ইহাদের বাস। আজ এখানে, কাল সেখানে।”<sup>১৩</sup>

অরণ্য অঞ্চলের মানুষের জীবনপ্রবাহকে মেনে না নিলেও তাদের আশা - আকাঙ্ক্ষা সত্যচরণের কাছে নতুন ও অদ্ভুত। এসব মানুষের আশা - আকাঙ্ক্ষা শহরে নাগরিকের মত সীমাহীন নয়। তারা দু-চারটা গরু-মহিষ ও কোনও রকম পেটভরা খাওয়ার পেলেই খুশি।

এসব অনার্য, অসভ্য মানুষের প্রতি অন্যায় ব্যবহারের জন্য সত্যচরণ দুঃখও পায়। ঘন অরণ্যের মধ্যে সে অতীতযুগের নীল সমুদ্রের স্বপ্ন দেখে –

“..... সে লিপির পাঠোদ্ধার করিতে বিজয়ী আর্যজাতি কখনও ব্যস্ত হয় নাই। আজও বিজিত হতভাগ্য আদিম জাতিগণ তেমনই অবহেলিত, অবমানিত, উপেক্ষিত। সভ্যতাদর্পী আর্যগণ তাহাদের দিকে কখনও ফিরিয়া চাহে নাই, তাহাদের সভ্যতা বুঝিবার চেষ্টা করে নাই, আজও করে না।” ১৪

ইতিহাস চেতনা-ই একধরনের আধুনিকতা। ইতিহাসের মধ্যে থাকে নানা ঘটনাবলীর কার্যকারণ আবিষ্কার। একটি ঘটনা কী কারণে, কী রকমে, কেন ঘটেছিল- তার সন্ধান এবং এ সব ঘটনা পরম্পরার অর্থ আবিষ্কার করে ইতিহাস রচনা করা হয়। সমালোচক সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের একটি মন্তব্য এখানে উল্লেখনীয় –

“যাকে আমরা আধুনিকতা বলি তার একটা প্রধান কথাই হল ইতিহাস চেতনা, ইতিহাসকে বাস্তব কার্য কারণ-প্রবাহ রূপে দেখা, জীবনকে দেশকালের সঙ্গে যুক্ত ক’রে দেখা।” ১৫

যুগলপ্রসাদ ব্রাত্যসমাজে জন্ম গ্রহণ করেও অন্য ধাতের মানুষ। সে জমি-জমা, গরু-মহিষ নিয়ে আলোচনা করতে ভালবাসে না ; ভালবাসে জঙ্গলের পরিবেশকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে। সে সত্যচরণকে বলে –

“..... সরস্বতী কুণ্ডীর পূর্ব পাড়ের জঙ্গলে যতগুলো হংসলতা লাগিয়েছিলাম, সবগুলো কেমন ঝাঁপানো হয়ে উঠেছে .....।” ১৬

সরস্বতী কুণ্ডীর পাশে কিংবা লবটুলিয়ায় মানুষের বসতি স্থাপন করতে গিয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নষ্ট হয়। অরণ্য ঐতিহ্যকে ধ্বংস করে সত্যচরণ দুঃখ পায়। সে বলে –

“দুঃখ হয়, যুগলপ্রসাদের এত সাধের সরস্বতী কুণ্ডীর বনভূমি-কতদিন  
বা রাখিতে পারিব ? কোথায় দূর হইয়া যাইবে হংসলতা আর বন্য  
শেফালি-বন !” ১৭

প্রকৃতি-ই কলকাতার নাগরিক সত্যচরণকে দু-টানায় ফেলে। আরণ্যকের প্রকৃতি কলকাতা ও বাংলাদেশের প্রকৃতি থেকে আলাদা। এই ভিন্নতাই নায়ককে এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে। তাই সত্যচরণ বলে –

“বাংলাদেশ হইতে সদ্য আসিয়াছি, চিরকাল কলকাতায় কাটাইয়াছি,  
অরণ্যভূমির নির্জনতা যেন পাথরের মত বুকে চাপিয়া আছে বলিয়া  
মনে হয়।” ১৮

আরণ্যকের প্রকৃতির লক্ষণ-ই হল নির্জনতা। উপন্যাসের নায়ক যে সংসারের অধিবাসী তা প্রধানতঃ নির্জনতা বিরোধী। নায়কের তাই প্রধান কাজ, নির্জনতা দূর করে নতুন বসতি স্থাপন করা। তবে উপন্যাসের প্রতিবেদনে রয়েছে অরণ্য ও বসতির বিরোধ, নির্জনতা ও নবাগত মানুষের মধ্যে বিরোধ।

এসব বিরোধিতার মধ্যেও অপরিচিত রহস্যময় প্রকৃতি ও অন্যভাষী মানুষের সঙ্গে নায়ক সত্যচরণের ধীরে ধীরে পরিচয় ঘটে। পরিচয় ঘটলেও এই দুই সত্তার মধ্যে একটি পার্থক্য থেকেই যায়। কারণ, সত্যচরণ অরণ্যবাসী মানুষের চেয়ে আর্থিক শক্তিতে শক্তিবান; তাঁর প্রাধান্য প্রতিবাদ রহিত, তাঁর কাছে আরণ্য মানুষের প্রসাদভিক্ষা এবং তাদের সঙ্গে তাঁর

ভূমিকা আধিপত্যের। আরণ্যক প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্ব উত্তরোত্তর বাড়তে থাকলেও শেষপর্যন্ত প্রকৃতির কাছে হার মানেন। প্রকৃতির কাছে হার মানার ফলে সত্যচরণ বলে –

“ দিন যতই যাইতে লাগিল, জঙ্গলের মোহ ততই আমাকে ক্রমে  
পাইয়া বসিল। ... আজকাল ক্রমশ মনে হয় এই দিগন্তব্যাপী বিশাল  
বনপ্রান্তর ছাড়িয়া, ইহার রোদপোড়া মাটির তাজা সুগন্ধ, এই স্বাধীনতা,  
এই মুক্তি ছাড়িয়া কলিকাতার গোলমালের মধ্যে আর ফিরিতে পারিব  
না। ” ১৯

প্রকৃতিকে সে যেমন ভালবেসেছিল তেমনি প্রকৃতিকে ধ্বংস করে সেখানে প্রজাপত্তন করে নিজের ঔপনিবেশিক স্থিতিকে শক্ত করে তুলে। অরণ্যের প্রকৃতি নির্ভর মানুষের প্রতি, বিশেষতঃ অন্নভোজনলোলুপ মানুষের প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ দেখা যায়। এসব মানুষেরা একমাত্র বড়লোকের বাড়ির উৎসব - অনুষ্ঠানে ভাতের সন্ধান পায়। সাধারণতঃ প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন শাক-সজ্জী, কলাইয়ের ছাতু-এ সব খেয়ে তারা জীবনধারণ করে। প্রকৃতি-ই হচ্ছে এই উপন্যাসের আধুনিকতা। এখানে সমালোচক শুভঙ্কর ঘোষের একটি মন্তব্য উল্লেখনীয় –

“অরণ্যপ্রেমিক সত্যচরণ ধ্বংস করেছে অরণ্যের সৌন্দর্য, প্রজাপত্তন  
করেছে, বসতি ও টোলা সৃষ্টি করেছে, পরিবেশ বিজ্ঞান বা ইকোলজি  
ধ্বংস করেছে। সত্যচরণের এই সজ্ঞানতায় বা সচেতনায় আরণ্যকের  
আধুনিকতা। ” ২০

ঔপন্যাসিক প্রকৃতিকে আধুনিকতার সোপান হিসাবে ব্যবহার করেন। এজন্যই উপনিবেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বেড়াজালের পরিসর থেকে মুক্তি পাবার শক্তি হিসেবে বিভূতিভূষণ

প্রকৃতিকে দেখেন।

বিভূতিভূষণের প্রকৃতি চেতনার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ইতিহাসচেতনা। তাঁর প্রকৃতিচেতনা যেমন মানবিক তেমনি ঐতিহাসিকও। প্রকৃতিও এখানে ইতিহাসের অংশ বিশেষ। রাজা দোবরু পান্নার মুখ দিয়ে ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ বলেন –

“.... এই বটগাছ আগে এখানে ছিল না। অন্য অন্য গাছের বন ছিল। ... গুঁড়ি কেটে উপড়ে ফেললে দেখবেন ওর তলার কত পাথর চাপা পড়ে আছে। এইবার বুঝুন কত প্রাচীন সমাধিস্থান এটা!”<sup>২১</sup>

দোবরুপান্নার পূর্বপুরুষের ইতিহাসের পরিচয় প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মীভূত। বিভূতিভূষণের ইতিহাস চেতনার সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছে পুরাণ, লোককথা, লোকবিশ্বাস। তাঁর ইতিহাস চেতনা সম্বন্ধে জনৈক সমালোচক বলেছেন –

“মানুষের বাঁচা, মানুষের জীবনাচরণ, মৃত মানুষের ইতিহাস যুক্তিস্বাদী-  
বৈজ্ঞানিক আকরণে সর্বদা চলে না। বিশ্বাস-অতিকথা-কল্পনার, মনের  
নানা জটিল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এর অন্তর্গত।”<sup>২২</sup>

এজন্যই যুগলপ্রসাদ, রাজুপাঁড়ের মত প্রান্তিকায়িত ব্যক্তি এই প্রকৃতিলগ্ন ইতিহাস চেতনার অন্তর্গত। রাজুপাঁড়ের জগৎ অতিকথার, বিশ্বাসের জগৎ। সে মনে করে, রামধনু উইয়ের টিবি থেকে জন্মায়। এমনকি সূর্যের উদয় অস্ত সম্পর্কেও রাজু বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে বিশ্বাসী নয়। রাজুপাঁড়ে ঐতিহ্যের প্রতি সহানুভূতিশীল। সত্যচরণ বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে রাজুকে পৃথিবী তত্ত্ব বুঝালেও, সে বুঝতে চায় না। সে বলে –

“উদয়-পাহাড়ের যে গুহা থেকে সুরযনারায়ণ রোজ ওঠেন সে গুহা

এবার মুসেরের এক সাধু দেখে এসেছিলেন।” ২৩

বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের কাছে রাজপুঁড়ের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য না হলেও প্রান্তিকায়িত শ্রেণীর মানুষের কাছে তা ধ্রুবসত্য এবং লোকইতিহাসে এর তাৎপর্যও রয়েছে। সমালোচক পার্শ্বপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য এখানে উল্লেখনীয় —

“ইংরেজের ঔপনিবেশিক বিজ্ঞানমনস্ক, বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের এটা বাইরে নিম্নবর্ণীয় ইতিহাসের বিনির্মাণে এই চেতনার মূল্যায়ন সম্ভব।” ২৪

ঔপনিবেশিক ও প্রান্তিকায়িত সমাজ দুটোই আরণ্যকের মূল সমাজ ব্যবস্থার অন্তর্গত। প্রান্তিকায়িত শ্রেণীর ধাতাল সাহু, যুগলপ্রসাদ, রাজপুঁড়, গণু মাহাতো, ভানুমতী ছাড়াও আরও অনেক অরণ্যপ্রকৃতির স্নেহে, মায়ায়, পরিচর্যায় গড়ে ওঠা সহজ-সরল মানুষ। এছাড়া দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার পরিসরে ধরা পড়ে কুস্তা, মঞ্চী, ধাতুরিয়া, মটুকনাথ, বাঁকেশিং ও গিরিধারীলাল ইত্যাদি। ঔপনিবেশিক মানসিকতা নিয়ে সত্যচরণ উপন্যাসে উপস্থিত হলেও সে প্রান্তিকায়িত মানুষের সুখে-দুঃখে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অভাব জর্জরিত মটুকনাথ সম্পর্কে বলে —

“আমি জমি দিতে রাজী আছি, সে চাষবাস করুক, যেমন রাজু পুঁড়ি করিতেছে।” ২৫

কিন্তু মটুকনাথ পরম্পরাগত শাস্ত্রব্যবসা ছাড়তে চায় না। চতুর ঔপনিবেশিক শাসকের মত সত্যচরণ যথাসম্ভব মটুকনাথকে সাহায্য করে। এমনকী ধূর্ত ঠাকুরাজ মহাজনদেরকে মহাল থেকে বের করে দেয়। সে বলে —

“প্রজাদের এত কষ্টের ফসল আমার মহালে অন্তত কেহ ফাঁকি দিয়া লইতে পারিবে না।” ২৬

ঔপনিবেশিক শাসকেরা শুধু অত্যাচার করে না, রক্ষাও করে। কুলচুরির অপরাধে নির্যাতিত কুস্তাকে ইজারাদারের হাত থেকে রক্ষা করে। কুস্তার দুর্দশার জন্য সত্যচরণ মানসিক কষ্ট পায়।

এই সত্যচরণ সম্বন্ধে সমালোচক পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন -

“লেখক ব্যক্তিটির মধ্যে ঔপনিবেশিক সত্তার স্ববিরোধিতা, দীর্ঘতা বিভূতিভূষণ সচেতনতার সঙ্গে দেখান। এই ব্যক্তি অরণ্য ও তার মানুষদের ধীরে ধীরে যথার্থ-ই ভালবেসেছিল, শুধু তাই নয় নিজ ঔপনিবেশিক অস্তিত্ব থেকে সে এক নতুন সত্তায় উত্তরিত হতে চেয়েছিল। ... তিনি ঔপনিবেশিক শিক্ষা ও জ্ঞানের মারাত্মক প্রসারণের কুশীলব, শেষজীবনে তিষ্ঠ-হতাশ।” ২৭

অরণ্যপ্রান্তরের সমাজ ব্যবস্থার ধারণাকে দুটি শ্রেণীর মহাজন ব্যক্তির স্পষ্ট করে তুলে।

দুটি শ্রেণীর একটিতে রয়েছে ধাওতাল সাহু আর অন্য শ্রেণীতে বীরবল সিং, নন্দলাল ওঝা ও রাসবিহারী সিং। ধাওতাল বড় মহাজন, লাখপতি, তার খাতক প্রজা, জোতদার থেকে আরম্ভ করে ব্যবসারী, জমিদার প্রত্যেকেই। সে মহাজনী চরিত্রের বিনির্মিতরূপ। অন্যান্য মহাজনের মত চালাক-চতুর, মামলাবাজ নয় এবং ভোগবিলাসিতাও নেই। সে কাগজপত্র ছাড়া মানুষকে টাকা দেয়। সুদের লোভে মানুষকে টাকা দিয়ে অনেক সময় ফেরৎ পায় না। সে কোনদিন জোর-জবরদস্তি করে মানুষের কাছ থেকে টাকা আদায় করেনি। ঈশ্বরের প্রতি তার যেমন অগাধ বিশ্বাস তেমনি প্রত্যেক মানুষ-ই তার কাছে সমান, ভেদাভেদ নেই। সত্যচরণকে কাগজ-পত্র ছাড়া কয়েক হাজার টাকা ধার দেয়। মানুষের কাছে বারবার প্রতারণিত হয়েও সে বলে -

“টাকা কি বসিয়ে রাখলে চলে, সুদে না বাড়ালে চলে না হুজুর। এই



আমাদের ব্যবসা।” ২৮

অন্যদিকে বীরবল, নন্দলাল, রাসবিহারী ও ছটুসিং-এর মত রাজপুত সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী চরিত্র। বর্ণ-বর্ণ-লিঙ্গ বিভাজিত সমাজে ঔপনিবেশিক শাসকের মত মহাজনেরা অত্যাচারী, বিশেষতঃ আরণ্যক সমাজ জীবনে কত ভয়ংকর হতে পারে এর প্রমাণ রাজপুত রাসবিহারী সিং। সে গরীব গাঙ্গোতা প্রজাদেরকে চড়া সুদে টাকা ধার দিয়ে পরে শক্তি প্রয়োগ করে নৃশংসভাবে টাকা আদায় করে ; জোর খাটায়, ফসল ছোঁক করে নিয়ে আসে। গরীব গাঙ্গোতারা তাকে মনিব স্বরূপ ভাবে। ইংরেজ শাসকরা যেভাবে নিরীহ ভারতবাসীকে অত্যাচার করত, ঠিক সেভাবেই রাজপুত মহাজনেরা গরীব প্রজাদের উপর অত্যাচার চালাত। তবে উৎসব-অনুষ্ঠানে প্রজাদেরকে নিমন্ত্রণ করে এনে ভাত খেতে দিত। গরীব গাঙ্গোতারা রাসবিহারী সম্পর্কে বলে –

“গত ভাদ্রমাসের সংক্রান্তিতে রাসবিহারী সিং রাজপুতের বাড়ী নেমতন্ন

ছিল, সে বড়লোক, ভাত খাইয়েছিল।” ২৯

বড়লোক রাসবিহারী লম্পট, দাঙ্গাবাজ, খুন-জখম করতে পরিপক্ব। তার মত অন্যান্য রাজপুত মহাজনেরাও নিরীহ গাঙ্গোতা প্রজাদের উপর নিজেদের শাসন বলবৎ রাখে। তাদের শাসন চিত্র ফুটে ওঠে রাজপুত ছটুসিং-এর ব্যবহারে –

“নিজের তিন-চার-শ বিঘা আবাদী জমির ফসল বাদে লাঠির জোরে

সমস্ত নাচা বইহারের দেড় হাজার বিঘা (বা ষতটা পারে) জমির

ফসল দখল করিতে চায়।” ৩০

বিস্তৃত উপন্যাসের নায়ক সত্যচরণের বুদ্ধি ও সাহসের সামনে রাজপুত দখলদার বাহিনীর

মনোরথ ব্যর্থ হয়। সত্যচরণকে রাজপুত বাহিনী প্রভুর মত মান্য করে। অর্থহীন, শক্তিহীন গাঙ্গোতা শ্রেণীর উপর রাজপুত সমাজের শাসন প্রকৃতপক্ষে সমকালীন সময়ের এক বাস্তব দলিল। বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক শিলাদিত্য সেনের ভাষায় বলা যায় —

“উপনিবেশের সমাজে যে শিল্পীর জন্ম, তিনি নিশ্চয়ই নিজের মতো করে হলেও আত্মপরিচয় খুঁজবেন, আত্মবিলোপ থেকে বাঁচবার জন্যেই হয়তো। ..... ইতিহাসের অনুসৃতি ছাড়াই বিভূতিভূষণের বিবরণে ঔপনিবেশিক জীবনের দৈনন্দিন ইতিহাস ধরা পড়ে যায়।” ৩১

তাই ঔপনিবেশিক কালের গোমস্তা, তহশীলদার, ইজারাদার, আমীন, পাটোয়ারী, মুন্ডরী, সিপাহী, লাঠিয়াল, মহাজন নিয়ে গড়ে ওঠা আরণ্যক জীবনের পাশাপাশি প্রকৃতি ও প্রকৃতিজাত ঔপনিবেশিকদের সমাবেশে গড়ে ওঠে আরণ্যকের আধুনিকতা। এখানেই ফুটে ওঠে এই দুই সত্তার অমীমাংসিত দ্বন্দ্ব।

অরণ্য অঞ্চলের মহাপরাক্রমশালী রাজপুত মহাজন দেবীসিং কাশী ভ্রমণ করতে গিয়ে এক বাঈজীর তরুণী মেয়ে কুস্তাকে ভালবেসে বিয়ে করে। কিছুদিন পর দেবীসিংহের অকাল মৃত্যু ঘটে। তার অকালমৃত্যুতে স্ত্রী কুস্তার জীবনে নেমে আসে চরম বিপর্যয়। এই বিপর্যয়ের জন্য প্রকৃতপক্ষে দায়ী আমাদের সমাজ কাঠামো। বর্ণবাদী সমাজব্যবস্থা এই অসম বিয়াকে মেনে নিতে পারেনি। কারণ পুরুষতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় নারী অপাঙক্তেয় ও পরিসরহীন। দেবীসিং সমাজব্যবস্থার প্রচলিত রীতি-নীতিকে অমান্য করে কুস্তাকে বিয়ে করে স্ত্রীর মর্যাদা দিলেও শেষ পর্যন্ত সমাজের শাসনকে তার মেনে নিতেই হয়। নিরীহ প্রজা অত্যাচারী দেবীসিং এর মনে ঔপনিবেশিক আধিপত্য জাত্যাভিমান থাকলেও অন্ত্যজ কুস্তাকে বিয়ে করে আধুনিক

মানসিকতার পরিচয় দেয়। কিন্তু বিধির বিধান অনুযায়ী বৈধব্যদশা প্রাপ্ত কুস্তার জীবনে নেমে আসে নানাধরনের বাধানিষেধ। স্বভাবতই প্রান্তিকায়িত নারী কুস্তার সমাজের রক্তচক্ষুকে মেনে চলতেই হয়। তাই সমালোচক ব্ল্যাক ও কাওয়ার্ড বলেন —

“Women are precisely defined never general representatives of humanity or all people, but as specifically feminine, and frequently sexual, categories ... Being a man is an entitlement not to masculine attributes but to non-gendered subjectivity.” <sup>৩২</sup>

কুস্তার অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে রাসবিহারী কুপ্রস্তাব দেয়। কিন্তু সে বাঈজীর মেয়ে হলেও ব্যক্তিত্বময়ী আধুনিক নারী। লম্পট রাজপুত রাসবিহারীর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে বলে —

“..... মেয়ে ফেল বাবুজী, জান্ দেগা ধরম দেগা নেহিন্।” <sup>৩৩</sup>

তার ব্যক্তিত্বময়ী নারীসত্তার মানবিক মূল্যবোধ থেকে মৃত্যুপথযাত্রী গিরিধারীলালকে পিতার মত সেবা যত্ন করে সুস্থ করে। সে জাত-পাতের কুটিল চক্রের বাইরে অবস্থান করে বলেই নির্দিষ্টায় সত্যচরণকে বলে —

“আপনি হুকুম করলেই আমি সব করব। আমি রাজপুত কোথায় বাবুজী! আপনি যা বলবেন আমি তাই করব। আমার আবার জাত কি ?” <sup>৩৪</sup>

প্রান্তিকায়িত এই নারী নিজের সতীত্ব ও মান-মর্যাদাকে ধ্বংস করতে চায়নি দেহের বিনিময়ে।

এই মানসিকতা শুধু কুস্তার নয়; সমগ্র নারীসত্তার। বিশিষ্ট নারীবাদী লেখিকা হেলেন সিন্সোর

একটি মন্তব্য এখানে উল্লেখনীয় —

“The Voice in each woman, moreover, is not only her own, ... the voice the incarnation of the first voice of the love which all women preserve alive.”<sup>৩৫</sup>

সত্যচরণ ঔপনিবেশিক মানসিকতা নিয়ে প্রকৃতির সৌন্দর্যকে ধ্বংস করে নতুন নতুন কলোনি গড়ে তুললেও তাঁর মন আধুনিক। সে অসহায় কুন্তাকে সেলামী ছাড়া দশ বিঘা জমি দেয় এবং প্রথম দুবছরের খাজনাও মুকুব করে। প্রেমের মান রাখার জন্য কুন্তাকে অশেষ ধন্যবাদ জানায়। কুন্তার মত মঞ্চীও সত্যচরণের দেখা এক ব্যক্তিত্বময়ী নারী। সে বৃদ্ধ নক্ছেদী ভগতের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। তবে স্বামী ও সতীনের সঙ্গে তার ভাব ছিল অত্যন্ত মধুর। সে গরিব হলেও অত্যন্ত প্রসাধনপ্রিয়। প্রসাধনপ্রিয়তার সুযোগ নিয়ে বিক্রেতার মঞ্চীকে খুবই চকাতো। মঞ্চীর প্রসাধন সামগ্রী দেখে সত্যচরণ ভাবে —

“এই সরলা বন্য মেয়েরা জিনিষপত্রের দাম জানে না, খুবই সহজ এদের ঠকানো।”<sup>৩৬</sup>

ঠকানো মনোবৃত্তিই একধরনের ঔপনিবেশিক মানসিকতা। ঔপনিবেশিক শক্তি নানা কূটকৌশলের মাধ্যমে অন্ত্যজ মানুষের উপর অধিকার কায়েম রাখে। ঔপনিবেশিক বণিকসম্প্রদায়ের নির্মিত জিনিষ-পত্রের প্রতি মঞ্চীর আকর্ষণ থাকলেও সে ঐতিহ্যগত বর্ণবাদী সমাজ-ব্যবস্থার কাঠামোকেই বিশ্বাস করে। ব্রাহ্মণ সত্যচরণকে ভাত-তরকারী রেঁধে দেয় না পাপের ভয়ে। এই মঞ্চী সূর্য কুণ্ডে পুণ্যস্নান করতে গিয়ে উচ্চবর্ণের হাতে লাঞ্চিত হয়। লাঞ্চার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেও কউ তার কথা শুনেনি। সে উপনিবেশ নগরী কলকাতাকে স্বচক্ষে দেখার জন্য স্বামীর সংসার

ছেড়ে রাজপুত যুবকের সঙ্গে পালিয়ে যায়। এই ‘পালানো’ বন্ধ সমাজ থেকে পালানো, মুক্ত; পরিসরের দিকে এগিয়ে যাওয়া। কিন্তু এই মুক্তির অন্তরালে লুকিয়ে আছে আরেকটি বন্ধন। যে বন্ধন তাকে চিরকালের জন্য হয়তো ক্রীতদাসী করে রাখবে। সে আর কোনদিন ফিরে আসবে কিনা, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ থেকেই যায়। এসব নারীদের শেষপর্যন্ত ঠাঁই হয় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির দ্বারা পরিচালিত আসামের চা-বাগানের চা-শ্রমিক হিসেবে। তাই সত্যচরণ বলে -

“মঞ্চীর অদৃষ্টে কি শেষকালে নির্বাহক আসামের পার্বত্য অঞ্চলের  
দাসত্ব ও নির্বাসন লেখা আছে?”<sup>৩৭</sup>

এ ধরনের আত্ম-সম্মানবোধ ব্যক্তিত্বময়ী আধুনিক নারীর অন্তিম বাসস্থান হয় ঔপনিবেশিক শাসনের করাল ছায়ার নীচে।

বৃহৎ শক্তি ধীরে ধীরে ক্ষুদ্র শক্তিকে গ্রাস করে, এর জ্বলন্ত প্রমাণ সাঁওতাল বিদ্রোহের কাণ্ডারি দোবরু পান্নার ঐতিহ্যবাহী রাজ পরিবারের কাহিনী। মোগল আক্রমণের পরে যা অবশিষ্ট ছিল তার সমাপ্তি ঘটে ব্রিটিশ রাজশক্তির হাতে। তারপরেও দোবরুপান্নাকে সবাই রাজা হিসেবে স্বীকার করে -

“..... ১৮৬২ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহের পর সব যায়। .... কিন্তু এ  
দেশের সকল আদিম জাতি এখনও তাঁকে রাজার সম্মান দেয়। রাজ্য  
না থাকলেও রাজা বলেই মানে।”<sup>৩৮</sup>

রাজা দোবরুপান্না সাঁওতাল রাজবংশের ঐতিহ্যস্বরূপ। তিনি বলেন -

“এই বনের মধ্যে পাহাড়ের উপরে আমার বংশের রাজাদের প্রকান্ড

বাড়ির চিহ্ন এখনও আছে। .... আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রতিষ্ঠিত  
দেবতা এখনও সেখানে আছেন।” ৩৯

কালস্রোতের বিধান অনুযায়ী দোবরুপান্নার মৃত্যুর পর তার নাতির মেয়ে ভানুমতী বংশ  
পরম্পরা নিয়ম-নীতিকে মেনে চলে। অরণ্য অঞ্চলের রাজকন্যা ভানুমতীর সঙ্গে উপন্যাসের  
নায়কের এক অলিখিত প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তিনি নিজেই জানিয়েছেন –

“এখানে যদি থাকিতে পারিতাম। ভানুমতীকে বিবাহ করিতাম। ভানুমতী  
.... কালো বটে, কিন্তু এমন নিটোল স্বাস্থ্যবতী মেয়ে বাংলাদেশে  
পাওয়া যায় না।” ৪০

কিন্তু উপনিবেশনগরী কলকাতাতেই তার যেতে হবে বলে ভানুমতীকে বিয়ে করা সম্ভব-ই নয়।  
কলকাতাতে ফিরে যাবার আগে সত্যচরণ অরণ্যঅঞ্চলে নতুন বসতি স্থাপন করতে গিয়ে  
চিরসুন্দর অরণ্যকে নিজহাতে ধ্বংস করে বলে –

“এত ভালবাসি ইহাকে অথচ আমার হাতেই ইহা বিনষ্ট হইল।...  
প্রকৃতির নিজের হাতের সাজানো তার শত বৎসরের সাধনার ফল  
এই নাচা-বইহার, ইহার অতুলনীয় বন্য সৌন্দর্য ও দূরবিসর্পী প্রান্তর  
লইয়া বেমালুম অন্তর্হিত হইবে ! অথচ কি পাওয়া যাইবে তাহার  
বদলে ?” ৪১

উপনিবেশিক জগতে মানুষের নিজের উপর কোনও বিশ্বাস নেই, আস্থা নেই, সর্বত্র-ই  
এক মানসিক হাহাকার। সত্যচরণ প্রচুর ক্ষমতাবান, একটি মহালের শাসনকর্তা হয়েও চিরসবুজ  
অরণ্যঅঞ্চল ত্যাগ করে কলকাতা নগরীতে ফিরে যেতে চায়। প্রকৃতির চিরসবুজ একদিন

তাকে আকর্ষণ করে রাখলেও আজ সেখান থেকে মুক্তি চায়। অরণ্যকে ধ্বংস করে এক সভ্যতাকে বিনষ্ট করার জন্য অরণ্যদেবতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। অরণ্যদেবতার কাছে ক্ষমা চেয়ে সত্যচরণ ভাবে —

“হয়তো আর ফিরিব না - দেশে ফিরিয়া মরিয়াও তো যাইতে পারি।

বিদায় সরস্বতী কুণ্ঠী, বিদায় তীরতরুসারি, বিদায় জ্যোৎস্নালোকিত

মুক্তবনানী। .... বিদায় সরস্বতী কুণ্ঠী।” ৪২

এরপরই দেখা যায় নায়কের মনের দ্বি-বাচনিকসত্তার স্পষ্ট প্রকাশ। দীর্ঘ কয়েকবছর অরণ্য প্রদেশে থেকে প্রকৃতির সৌন্দর্যরাজিকে ধ্বংস করে সত্যচরণ সেখানে নতুন বসতি তথা কলোনি স্থাপন করেছিল। কিন্তু ঔপনিবেশিক আধুনিকতার পীঠস্থান কলকাতার দিকে রওয়ানা হবার প্রাকমুহুর্তে সে প্রকৃতির মায়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। এই প্রকৃতিই হচ্ছে বিভূতিভূষণের আধুনিক চেতনার প্রকৃত সত্তা। তাই সে বলে —

“ছ-বছরের দীর্ঘ বনবাস সাজ করিয়া কলিকাতা নগরীতে ফিরিব -

কিন্তু যাইবার দিন ঘনাইয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের কেন এত

বেশী করিয়া জড়াইয়া ধরিতেছি !” ৪৩

ছয়-সাত বছরের মধ্যে নতুন নতুন বসতি স্থাপন করে সত্যচরণ লবটুলিয়া অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করে। উপনিবেশ স্থাপন করলেও তার মনে বার বার চক্ৰপাক খায় ‘নাচা লবটুলিয়া কি ছিল আর কি হইয়াছে !’ প্রকৃতিকে ধ্বংসকরে, সৌন্দর্যকে নষ্ট করে শেষপর্যন্ত অরণ্যদেবতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা চাওয়া সত্যচরণের আত্মসংশোধন বা আত্মসচেতনতা। এই আত্মসচেতনতা বা আত্মসংশোধন-ই হল একধরনের আধুনিকতা। আর এখানেই স্পষ্ট ফুটে ওঠে ‘আরণ্যক’ উপন্যাসের কথাবয়নে ঔপনিবেশিক মনন ও আধুনিক চেতনার অমীমাংসিত দ্বন্দ্বিক পরিসর।

## উল্লেখপঞ্জিঃ—

- ১। ভূদেব চৌধুরী, - 'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা' (দ্বিতীয়পর্ষায়) থেকে উদ্ধৃত;  
১৯৬৪, বৃঃ প্রাঃ লিঃ, পৃ : ৭
- ২। সমীর রায় চৌধুরী (সম্পাদিত)- হাওয়া - ৪৯,ঔপনিবেশিক মূল্যবোধঃ একটি প্রস্তাবনা-  
তপোধীর ভট্টাচার্য, পৃঃ ৮৯
- ৩। অরুণ সেন (সম্পাদনা)- 'বিভূতিভূষণঃ আধুনিক জিজ্ঞাসা' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত,  
২০০৩, সাহিত্য অকাদেমি, জীবনতারা, পৃঃ ৮৫
- ৪। পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, - উপন্যাস রাজনৈতিক : বিভূতিভূষণ, ১৯৯২ র্যাডিক্যাল  
ইম্প্রেশন, পৃঃ ৬৮
- ৫। সত্যেন্দ্রনাথ রায় - 'বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত,  
২০০০, দে'জ পাবলিশিং, পৃঃ ৩৪
- ৬। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় - বিভূতি রচনাবলী - জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ,(৫ম খণ্ড),  
১৪০৩, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃঃ ৯৩
- ৭। তদেব পৃঃ ৮
- ৮। তদেব পৃঃ ৯
- ৯। তদেব পৃঃ ৬৭
- ১০। তদেব পৃঃ ৯৮
- ১১। তদেব পৃঃ ৬৯



- ১২। তপোধীর ভট্টাচার্য - 'মিশেল ফুকো ও তাঁর তত্ত্ববিশ্ব' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত,  
১৯৯৭, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, পৃ: ৪৯
- ১৩। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় - পূর্বোক্ত গ্রন্থ - পৃ: ১৩৬
- ১৪। তদেব পৃ: ৯৬
- ১৫। সত্যেন্দ্রনাথ রায়, - পূর্বোক্ত গ্রন্থ - পৃ: ১৭৩
- ১৬। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, - পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫মখণ্ড) - পৃ: ১৩৬
- ১৭। তদেব পৃ: ১৩৬
- ১৮। তদেব পৃ: ১০
- ১৯। তদেব পৃ: ১৪
- ২০। দেবব্রত চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদনা)- 'বিংশ শতাব্দীর সমাজ বিবর্তনঃ বাংলা উপন্যাস'  
গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, ২০০০, দে'জ পাবলিশিং- পৃ: ১০৬
- ২১। তদেব পৃ: ৯৬
- ২২। পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, - পূর্বোক্ত গ্রন্থ - পৃ: ৭৬
- ২৩। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, - পূর্বোক্ত গ্রন্থ - পৃ: ১৩১
- ২৪। তদেব পৃ: ৭৮
- ২৫। তদেব পৃ: ৭১
- ২৬। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, - পূর্বোক্ত গ্রন্থ - পৃ: ৮৪
- ২৭। পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, - পূর্বোক্ত গ্রন্থ - পৃ: ৮০
- ২৮। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, - পূর্বোক্ত গ্রন্থ - পৃ: ২৮

|     |                               |                                                                                        |
|-----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ২৯। | তদেব                          | পৃঃ ১৩                                                                                 |
| ৩০। | তদেব                          | পৃঃ ৭৪                                                                                 |
| ৩১। | অরুণ সেন (সম্পাদিত), -        | পূর্বোক্ত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত - পৃঃ ১১২                                                 |
| ৩২। | তপোধীর ভট্টাচার্য, -          | ‘বাখতিন তত্ত্ব ও প্রয়োগ’ গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, ১৯৯৬,<br>পুস্তক বিপণি, পৃঃ ৩৩            |
| ৩৩। | বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, - | পূর্বোক্ত গ্রন্থ - পৃঃ ১৩৮                                                             |
| ৩৪। | তদেব                          | পৃঃ ১৪৫                                                                                |
| ৩৫। | তপোধীর ভট্টাচার্য -           | ‘প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব’ গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, ১৯৯৬,<br>অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, পৃঃ ১৪২ |
| ৩৬। | বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় -  | পূর্বোক্ত গ্রন্থ - পৃঃ ৮৮                                                              |
| ৩৭। | তদেব                          | পৃঃ ১১৭                                                                                |
| ৩৮। | তদেব                          | পৃঃ ৯১                                                                                 |
| ৩৯। | তদেব                          | পৃঃ ৯৪                                                                                 |
| ৪০। | তদেব                          | পৃঃ ১৫২                                                                                |
| ৪১। | তদেব                          | পৃঃ ১১৯                                                                                |
| ৪২। | তদেব                          | পৃঃ ১৩০                                                                                |
| ৪৩। | তদেব                          | পৃঃ ১৪৯                                                                                |

## আর্দশ হিন্দু হোটেল

ব্রিটিশরা উন্নততর সামাজিক শক্তির বাহক। তাঁরা ব্রিটেনের ধনিক বিপ্লবের উত্তরাধিকার নিয়ে বাংলা তথা ভারতবর্ষে আসে। তবে ব্রিটিশরা ধনিক বিপ্লবকে সঞ্চারিত করার জন্য বাংলায় আসেনি; এসেছিল তাঁদের উপনিবেশ স্থাপন করতে। উপনিবেশ স্থাপন করতে গিয়ে বাংলায় গ্রাম-সমাজের স্বয়ং-সম্পূর্ণ অর্থনীতির পরিসরকে তাঁরা ধ্বংস করে ফেলে। শুধু ধ্বংস করেনি, শোষণ ও শাসনের দ্বারা বাংলার প্রান্তিকায়িত সমাজকে ঔপনিবেশিক শক্তির নাগপাশে বেঁধে রেখে স্বাভাবিক বিকাশ থেকে বঞ্চিত করে রাখে। এই সময়ে বাংলার সমাজ ব্যবস্থায় ঐতিহ্যানুসারে চলে আসা সামন্ততান্ত্রিক রীতি-নীতি ঔপনিবেশিক শক্তির শাসন পদ্ধতিতে ও সক্রিয় সহযোগিতায় ভেঙে যেতে আরম্ভ করলেও সঙ্গে সঙ্গে ঔপনিবেশিক শক্তির সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রা গড়ে উঠেনি। এই টানাপোড়নের মধ্যে গড়ে ওঠে ‘আধা-সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ব্যবস্থা।’ এই ব্যবস্থায় দেশি রাজা-জমিদার, মহাজন প্রভৃতি ঔপনিবেশিক শাসনের তাবদার, দায়িত্বহীন আমলাতন্ত্র ও ব্রিটিশ ধনিক-ব্যবস্থার ক্রমবর্ধিত শোষণ - এসব কিছুতেই সমাজ বিপর্যয় ঘটে ; সমাজ বিপ্লব ঘটেনি। ব্রিটিশ শক্তি একদিকে যেমন বাংলার পল্লী - গ্রামগুলিকে হীন ও দীন করে তুলেছিল, অন্যদিকে তেমনি শহরে এবং তার আশে-পাশে গড়ে তুলে এক নতুন সমাজ। এই নতুন সমাজকেই ‘মধ্যবিত্ত সমাজ’ বলে অভিহিত করা হয়। কলকাতা শহর-ই হয়ে ওঠে মধ্যবিত্ত সমাজের কেন্দ্রমণি।

‘মধ্যবিত্ত সমাজ’ কলকাতায় বসবাস শুরু করে-ই ঔপনিবেশিক শাসকদের কাছ থেকে

নানা সুযোগ-সুবিধা আদায়ে মগ্ন হয়। সুবিধা আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ঔপনিবেশিক শক্তির সাহিত্য-সংস্কৃতি, চাল-চলন, আচার-আচরণও গ্রহণ করে। কলকাতা শহরে গড়ে ওঠে বাবুসমাজ ও বাবু সংস্কৃতি। ঔপনিবেশিক শক্তির ইচ্ছানুযায়ী বাংলায় স্থাপিত হয় চটকল, রেলপথ, টেলিগ্রাফ ছাড়াও অনেক ধরনের ব্রিটিশ পণ্যের বাজার। এসব বাজারের জন্য উন্নত হতে শুরু করে অনেক অখ্যাত স্থান। এধরনের একটি অখ্যাত স্থানের অখ্যাত হোটেলের উন্নতির কথা ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ জানিয়েছেন —

“কয়েক বছরের মধ্যে রাণাঘাট রেল-বাজারের অসম্ভব রকমের উন্নতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হোটেলটির অবস্থা ফিরিয়া যায়। আজ দশ বৎসরের মধ্যে হোটেলের পাকা বাড়ী হইয়াছে, চারজন রসুয়ে-বামুনে রান্না করিতে করিতে হিমশিম খাইয়া যায়, এমন খদ্দেরের ভিড়।”<sup>১</sup>

এই ‘উন্নতি’ ঔপনিবেশিক সত্তার উন্নতি। এই শক্তিসত্তার সংস্পর্শে বাংলাদেশে গড়ে ওঠে নতুন অর্থনৈতিক বনিয়াদ। এখানে সমালোচক অনিন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য উল্লেখনীয়

“ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী নীতি এদেশের মধ্যযুগীয় স্থিতিশীল অর্থনৈতিক বনিয়াদ ভেঙে যে নতুন ঔপনিবেশিক অর্থনীতির জন্ম দিয়েছিল তা গড়ে উঠেছিল বাংলাকে কেন্দ্র করে।”<sup>২</sup>

বাংলাদেশে ঔপনিবেশিক তথা ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে ওঠার ফলে সমাজের পুরনো কাঠামোর বিনির্মাণ ঘটে; শুরু হয় আধুনিক জীবনযাত্রা। ইংরেজরা পুরনো জমিদারী প্রথার পরিবর্তে নতুনভাবে চালু করে ‘চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত’। এই প্রথা চালু করার পেছনে ইংরেজ তথা

ঔপনিবেশিক শক্তির বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। উদ্দেশ্য যা-ই থাকুক, তাঁদের বিভিন্ন নীতির সুবাদে কিছুসংখ্যক বাঙালি তথা ভারতীয় নানাভাবে উপকৃত হয়। ‘চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে’ পুরনো জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত হওয়ায় জমিদাররা বিভিন্ন অসুবিধার সম্মুখীন হন। কিন্তু এসব জমিদাররা আধুনিক শিক্ষা সংস্কৃতিকে গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করেনি। তাঁদের মধ্যে অনেকেই আধুনিকতার পীঠস্থান কলকাতাকে বসবাসের যোগ্যস্থান হিসেবে নির্বাচিত করে। ঔপন্যাসিক তাঁর উপন্যাসের বয়নে লিখেছেন —

“হরিচরণ মুখুয্যে মহাশয় এ গাঁয়ের মধ্যে একমাত্র শিক্ষিত, অবস্থাপন্ন ও সম্ভ্রান্ত লোক। তাঁহারা এ গ্রামের জমিদার — কিন্তু অনেকদিন হইতেই গ্রাম ছাড়িয়াছেন।”<sup>৩</sup>

ব্রিটিশ উপনিবেশ চালু থাকার ফলে কিংবা ইউরোপীয় শিল্পবিপ্লবের প্রভাবে ভারতীয় শিল্পব্যবস্থা পঙ্গু হয়ে পড়ে। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ ইউরোপীয় শিল্পব্যবস্থার দৌলতে নানাধরনের আধুনিক মেশিন, যন্ত্রপাতির সঙ্গে পরিচিত হয়। এই পরিচিতির জন্য গ্রাম্য পরিবেশে বড় হওয়া হাজারির কলের গান শুনা কিংবা মেয়ে টেপিকে কলগানের মেশিন কিনে দেবার স্বপ্ন জাগে মনের মধ্যে। বেচু চক্কতির হোটেলে পদ্ম বি-র গালি শুনেও পাচকের কাজ করে যাওয়াই ছিল হাজারির একমাত্র নেশা। হাজারির কাছে ‘হিন্দু হোটেল’ ও মনিবদ্বয় ছিলেন হর্তা-কর্তা-বিধাতা। হোটেলের চাকুরি চলে গেলেও হাজারি ভাবে —

“হাজার হোক, শহর বাজার জায়গা রাণাঘাট, কত লোকজন, গাড়ী, হৈ হৈ, ব্যস্ততা, রেলগাড়ী, গাড়ী-ঘোড়া — এখানে একবার কাটাইয়া গেলে কি অন্য জায়গা কারো ভালো লাগে ?”<sup>৪</sup>

মধ্যবিত্ত কিংবা উচ্চ-মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় বাইরে ঔপনিবেশিক শাসকের বিরুদ্ধাচরণ করলেও অন্তরে ছিল তাদের প্রবল ইংরেজপ্রীতি। এখানে সমালোচক স্বপন বসুর একটি মন্তব্য উল্লেখনীয়

“উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত হিন্দুরা ইংরেজের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন মুসলমান অত্যাচার থেকে তাঁদের মুক্ত করে, ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে নতুন চিন্তাজগতে নিয়ে যাবার জন্য। এছাড়া ধনপ্রাণের কিছুটা নিরাপত্তা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও কর্মসূত্রে সম্পদ আহরণের সুযোগের জন্যেও তাঁরা ছিলেন ইংরেজের একান্ত অনুগত।” ৫

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি অংশ ঔপনিবেশিক শক্তির সঙ্গে দালালী, মহাজনী কারবার করে বিত্তবান হয়। এ-সময়ে পরোক্ষভাবে হলেও গৃহলক্ষ্মী নারী পুরুষদের উন্নতির জন্য নিজেদের হাত বাড়িয়ে দিতেন। ‘নারী’ আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অপরসত্তা হিসেবে উপস্থিত। এছাড়াও অর্থনৈতিক কারণেও নারী চলমান গণ্ডিবদ্ধ সমাজব্যবস্থাকে উপেক্ষা করে বৈধ কিংবা অবৈধ পথে টাকা-পয়সা উপার্জন করে। ‘আদর্শ হিন্দু হোটেল’ উপন্যাসের বিশেষ দুটি চরিত্র পদ্মঝি ও বেচু চক্কতির সম্পর্ক নিয়ে মানুষ ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করে। হাজারি ঠাকুর মনিবদ্বয়ের সম্পর্ক নিয়ে মনে মনে ভাবে —

“বাব্বাঃ, যেমন কর্তা, তেমনি গিন্নী - (পদ্ম ঝিকে মনে মনে গিন্নী বলিয়া হাজারি ঠাকুর খুব আমোদ উপভোগ করিল - মুখ ফুটিয়া যাহা বলা যায় না, মনে মনে তাহা বলিয়াও সুখ।)” ৬

বিশ্বযুদ্ধ বাঙালি মানসিকতাকে বিশেষতঃ নারীর মনকে বিনির্মাণ করে। এই বিনির্মাণের জন্যে

তারা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের গণ্ডিরেখার বাইরে এসে দাঁড়ানোর চেষ্টাও শুরু করে। তাই পদ্মি নিজে সংসার প্রতিপালন করার জন্য বেচুবাবুর হোটেলের অংশীদার হয়। এখানে বিশিষ্ট সমালোচক সুমিতা চক্রবর্তীর একটি মন্তব্য উল্লেখনীয় —

“যে-সব কারণে মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজে নারী-কেন্দ্রিক বিধি-নিষেধ এবং নৈতিকতার অনুশাসন এই সময়ে ভেঙে পড়তে থাকে - তার অন্যতম ছিল টাকার প্রয়োজনে মেয়েদের এইভাবে বাইরে বেরিয়ে পড়া।”<sup>৭</sup>

অতসী কিংবা কুসুমের মত নারীর মধ্যে আধুনিকতার ছোঁয়া থাকলেও তারা ঐতিহ্যের বেড়াজালকে অতিক্রম করতে পারেনি। কুসুম আর্থিক কারণে গ্রামে গ্রামে দুধ বিক্রি করে, হাজারির হোটেলের অংশীদারী হলেও সামন্ততান্ত্রিক নীতি নিয়মে বিশ্বাসী। জাত-পাত ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় চতুর্বর্ণের শ্রেষ্ঠ বর্ণ হলো ‘ব্রাহ্মণ’। শাস্ত্রের বিধান দেওয়া ব্রাহ্মণদের জন্মগত অধিকার - এই সংস্কারে কুসুম বিশ্বাসী। হাজারির হোটেল খোলার পরিকল্পনা শুনে কুসুম বিনাসুদে টাকা দান করতে চায়। আর্থিক উন্নয়নে নারীর চিন্তা-ভাবনা করা ইউরোপীয় নবজাগরণের ফসল হলেও কুসুমের মন ঐতিহ্যলালিত। তাই সে বলে -

“আমার থাকতো যদি তবে আপনি নিতেন না কেন - ব্রাহ্মণের সেবায় যদি লাগে ও-টাকা, তবে ও-টাকার ভাগ্যি বাবাঠাকুর।”<sup>৮</sup>

‘ব্রাহ্মণ’ শব্দটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই ‘উচ্চ-নীচ’, ‘স্পর্শ-অস্পর্শ্য’- এ ধরনের বর্ণ-বর্ণ বিভাজিত সমাজ চিত্র আমাদের সামনে ভেসে ওঠে।

উনিশ শতকে ইউরোপীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির দৌলতে বাঙালি জাতি ও সমাজে যে যুক্তি

ও বুদ্ধিবৃত্তিকে লালন করতে শিখেছিল, তার-ই অনুপ্রেরণায় বাঙালির জীবনবীক্ষার পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে ওঠে। সমাজ ও সমাজবিবৃত গোষ্ঠী মানুষের সুখ-সমৃদ্ধি ও চেতনার স্বধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে বাঙালি সমাজ একদিকে যেমন সমাজ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তাকে অনুভব করে তেমনি অন্যদিকে অনুসন্ধিৎসু হয়ে ওঠে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ব্যক্তি মানুষের পৃথক সত্তার রহস্য অনুধ্যানে। নিজ ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করার এক অদম্য প্রতিযোগিতা শুরু হয়। এই চেতনা থেকেই বাঙালির জীবন পরিসরের নতুনত্ব সঞ্চারিত হয়। কিন্তু এই জীবনসম্মতাকে সাহিত্যের আঙিনায় উপস্থাপিত করতে সাহিত্যিকদের মধ্যে দ্বিধাবোধ জাগে। কারণ, বাঙালি মানসিকতা দ্বিবাচনিকতায় ভরপুর। হাজারি ঠাকুর রেলশহর রাণাঘাটে বসবাস করে আধুনিক জীবন ও পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হয়েও জাত-পাত ভিত্তিক মানসিকতার উর্ধ্ব উঠতে পারেনি। তার কাছে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ-ই একমাত্র সামাজিক গণ্ডিবদ্ধ মানুষ। সে বলে -

“পল্লীগ্রামে মেয়েদের মধ্যে কড়াকড়ি পর্দা নাই সে জানে, বিশেষতঃ

ব্রাহ্মণ-কায়স্থ ভিন্ন অন্যজাতির মেয়েদের মধ্যে।” \*

ইংরেজ আসার পর শহর কলকাতা নবকলররবে সেজে ওঠে ; নববাবু সমাজের বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ঐশ্বর্য ও বাবু-বিলাস বৃদ্ধি পায়। এই বাবু সংস্কৃতির প্রয়োজনে কলকাতায় যে শহুরে সংস্কৃতির সৃষ্টি হয় - পাঁচালি, কবিগান, যাত্রাগান, খেউড়, তরঙ্গা, টপ্পা, হাফ - আকড়াই ও বুলবুলির লড়াই প্রভৃতিতে আমরা তার রূপ দেখতে পাই। হাজারি শহরের মধ্যে থেকেও এই সংস্কৃতি থেকে দূরে থাকতে চায়। যাত্রাপালা কিংবা পাড়ার মধ্যে অনৈতিক কাজে যেতে মতির আহ্বানে সে সাড়া না দিয়ে বলে —

“..... আমি তোরা বাপের বয়সের মানুষ, আমার সঙ্গে ও-সব



কথা কেন ? ..... তোর ইচ্ছে, যা বুঝিস্ করগে যা।” ১০

হাজারি পাচকের কাজ করলেও তার মন সবসময়ই আর্থিক উন্নতির প্রচেষ্টায় রত। তৎকালীন সময়ে কিছু মধ্যবিত্ত কিংবা উচ্চ-মধ্যবিত্ত মানুষ মুৎসিদ্দিগিরি, দালালী, ব্যবসা-বাণিজ্য করে প্রচুর ধন সম্পদের মালিক হয়। এই ধনলোভেই গ্রাম-বাংলার মানুষ পিতৃ-পুরুষের ভিটে-মাটি ছেড়ে শহর কলকাতায় বসবাস করতে শুরু করে। এখানে সমালোচক ভূদেব চৌধুরীর একটি মন্তব্য উল্লেখনীয় —

“বস্তুতঃ ধনলোভ ও যথেষ্ট ভোগের আকাঙ্ক্ষাকে কেন্দ্র করেই আসলে গড়ে উঠেছিল বাংলার নগর-জীবনের বনিয়াদ- ধনের লোভেই বাঙালি সেদিন গ্রামের ঘর ছেড়েছিল।” ১১

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি শুধু নগর জীবনের বনিয়াদ তৈরি করে দেয়নি, তৈরি করে দেয় এক অখণ্ড ভারতবর্ষ। তবে স্বাধীনতার প্রাক-মুহূর্তে এই শক্তি ভারতবর্ষকে খণ্ড-বিখণ্ড করে দেয়। এমনকী বিশ শতকের প্রথমদিকে এই শক্তি বাংলাকেও বিভক্ত করেছিল। ব্রিটিশদের পূর্বে মুসলমান শক্তি ভারতবর্ষে প্রবেশ ও শাসনকার্য চালালেও ব্রিটিশদের মত বিভিন্ন রাজ্যকে একত্রিত করতে পারেনি। এই শক্তি অচল অনড় গ্রামীণ সভ্যতার ভিত্তিকে বিনির্মাণ করে সংস্থাপিত করেছে ‘মানি ইকোনমি’ ও গতিসর্বস্ব পৃথিবীর সঙ্গে ‘বাজারের’ যোগাযোগ। প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে যা ছিল অভাবনীয় - তা সম্ভব করেছে মুদ্রাযন্ত্র, রেলপথ, প্রযুক্তি, এসব মুক্তি দিয়েছে মানুষের মনকে। তবে অনেকক্ষেত্রে রেল কিংবা আধুনিক প্রযুক্তি আমাদের ক্ষতিসাধনও করেছে। এখানে বিশিষ্ট ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র দত্তের একটি মন্তব্য উল্লেখনীয় —

“উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি, অধিকাংশ প্রাচীন ভারতীয় শিল্পেরই  
অবনতি দেখা গেল। তাহার পরে রেলওয়ে খুলিতে আরম্ভ হইল।  
..... দূরত্বকে হ্রাস করিয়াছে, ভ্রমণকে সহজ, সস্তা ও সুলভ করিয়াছে।  
তাহা হইলেও, এই রেলওয়ে দ্বারা আমাদের অনেক অনিষ্ট ঘটিয়াছে।”<sup>১২</sup>

গ্রামীণ সমাজে জনসাধারণের মধ্যে যে ব্যক্তিগত পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল তা আর নাগরিক  
জীবনে থাকেনি। কৃষির জায়গায় ব্যবসা-বাণিজ্য ও বুদ্ধিবৃত্তির উপর নির্ভরশীলতা দেখা দেয়।  
জীবিকা নির্বাহে উপস্থিত হয় বৈচিত্রময় পথ ; অর্থনৈতিক জীবনের পরিসরও বৃদ্ধি পায়।  
ফলে ঐতিহ্যগত অর্থনীতি থেকে ভারত ঔপনিবেশিক অর্থনীতির দিকে এগিয়ে যায়। স্বদেশি  
অর্থনীতিতে দেখা দেয় আধুনিকতা। এই আধুনিকতার জন্যই শ্রীনগর-সিমলেতে চাষাবাস  
করার জন্য বিহারী বাঁড়ুয়োর প্রস্তাবে হাজারি ভাবে –

“..... এত বনজঙ্গলের অন্ধকার ও নির্জনতার মধ্যে তাহার যেন দম  
বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। ..... কুড়ি বিঘে ধানের জমি দিলেও এ  
গাঁয়ে নয় রে বাবা ! মানুষ থাকে এখানে ?”<sup>১৩</sup>

‘মানুষ’ শব্দটি ঔপনিবেশিক সমাজের অবভাস হিসেবে চিত্রিত। হাজারির মাথায় সবসময়  
রেলবাজারের কথা-ই আসে। কারণ রেলপথের দ্বারাই ভারতীয় অর্থনীতির প্রভূত উন্নতি ঘটে।  
সে রেলবাজারেই নতুন হোটেল খোলে ফাঁকিবাজি, খদ্দের ঠকানো থেকে দূরে থেকে ব্যবসা-  
বাণিজ্য চালাবে বলে মনস্থির করে। তাই সে বলে –

“খদ্দের সন্তুষ্টি করিয়া ব্যবসা। নিজের হাতে রাখিবে, খাওয়াইয়া  
সকলকে সন্তুষ্ট রাখিবে। চুরি-জুয়াচুরির মধ্যে সে নাই।”<sup>১৪</sup>

ঔপনিবেশিক শাসক সম্প্রদায় ভারতবর্ষে তাঁদের ঔপনিবেশ স্থাপন করার পর থেকেই নতুন নতুন শহর গড়ে উঠতে থাকে। নতুনত্রে উজ্জীবিত শহরগুলিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এই শ্রেণী প্রতীচ্যের মধ্যবিত্তের মত শিল্পায়নের পরিণাম নয়। সরকারি চাকুরি ছিল এদের উন্নতির পরিমাপ। তবে গ্রামের জমিদার ও প্রজার মধ্যবর্তীস্তরে আরেকটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীও ছিল। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী যে আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে প্রতীচ্যের ভাবধারা, শিক্ষা-সংস্কৃতি গ্রহণ করতে শুরু করেছিল, তাতে দেখা দেয় শূণ্যতা। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক অর্থনীতির করালগ্রাসের শিকার হয় এই শ্রেণীর মানুষ। তাঁরা ক্রমবর্ধমান বেকারির মুখোমুখি হয়ে হতাশবোধ করলেন। তবে অনেকে চাকুরি পেলেও যোগ্যতানুযায়ী পায়নি। বংশীধরের ভাগিনেয় নরেন্দ্রনাথ সেকালে ক্লাস ফোর্থ পাশ করেও কলকাতার কোনও জায়গায় চাকুরির সুযোগ পায়নি। এমনকী চাকুরির কাজও তার ভাগ্যে জুটেনি। তবে ঔপনিবেশিক শাসক সম্প্রদায় একসময় বুঝতে পারে তাঁদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও এদেশের মানুষের সঙ্গে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা হিসেবে কিছু ইংরেজি শিক্ষিত ব্যক্তিরও প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে ইংরেজরা কিছু দোভাষী নিযুক্ত করে। এই মানসিকতা নিয়ে হাজারি ঠাকুর রেলবাজারের নতুন ‘আর্দশ হিন্দু হোটেলের’ ম্যানেজার হিসেবে নরেনকে নিয়োগ করে। তবে এখানে মেয়ে টেপিকে বিয়ে দেবার স্বার্থও জড়িত ছিল। ইংরেজি শিক্ষিত, সাহেবী কারদায় অভ্যস্ত বাবুদের সঙ্গে বাক্য বিনিময়ের কারবার, হোটেলের দেখাশুনা সবকিছুতেই মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় ছিল নরেন।

হাজারি ঔপনিবেশিক জাতির ভাষাকে আয়ত্ত করতে না পারলেও তাঁদের ব্যবসার কূটচালকে আয়ত্ত করেছিল। হোটেলের ব্যবসা জমিয়ে ওঠায় হাজারি পুরো পরিবারকে

রাগাঘাট নিয়ে আসে। গ্রামীণ পরিবেশে জীবন কাটানো টেপির মা শহরের আধুনিক চালচলন, রাস্তাঘাট, বৈদ্যুতিক বাতি, পাকাঘর - এসব দেখে আনন্দে অভিভূত। টেপি গ্রামে বড় হলেও আধুনিক সামগ্রীর সঙ্গে আগে থেকেই মোটামুটি পরিচিত। টেপি সম্পর্কে হবু স্বামী নরেন বলে -

“..... তাহার উপর তার চালচলন ধরন-ধারণ যেন স্কুলে পড়া  
আধুনিক মেয়েছেলের মত।” <sup>১৫</sup>

আধুনিক সমাজে নতুন ধনী হওয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণী ঔপনিবেশিক শক্তির মত নিজেকে কখনও পরাজিত বলে স্বীকার করতে শেখেনি। এই শ্রেণীভুক্ত হাজারি কোনদিন ‘টকি’ না দেখলেও মেয়ে টেপির কাছে পরাজয় স্বীকার না করে বলে -

“..... ছবিতে কথা কয়, এই ! দেখেছি অনেকবার।” <sup>১৬</sup>

নব্য ধনিক শ্রেণী শহরে আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত হবার ফলে গ্রামীণ সভ্যতা ভেঙে যায়। গ্রামের মানুষ কৃষির পরিবর্তে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বুদ্ধিবৃত্তির উপর জোর দেন। জীবিকাশ্কেত্রে দেখা দেয় এক বৈচিত্রময় পরিসর এবং এই পরিসরের জন্য অর্থনৈতিক জীবনে ঘটে ব্যাপক প্রসার। এখানে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অশোক সেনের একটি মন্তব্য উল্লেখনীয় -

“ঔপনিবেশিক আধিপত্যের যে বাস্তবে বাংলার উৎপাদন অর্থনীতি  
ধ্বংস হচ্ছে , তার সংশ্লিষ্ট ধারা - উপধারায় আবার ইংরেজি শিক্ষা ও  
ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান বাঙালি নব্য-মধ্যবিত্তের ভাবের ঘরে এসে  
পৌঁছল।” <sup>১৭</sup>

নব্য-মধ্যবিত্তরাই ছিল ঔপনিবেশিক শাসক সম্প্রদায়ের মনোবাসনাকে পূর্ণ করার

সূত্রধার। এদেরকে সামনে রেখে ঔপনিবেশিক শক্তি নিজেদের একচেটিয়া বাণিজ্যের ভিত্তি স্থাপন করে। বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান, রেলপথ এবং রেলের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যবসাই ছিল ইংরেজ শক্তির আয়ের উৎস। এসব ব্যবসা থেকে কিছু ভারতীয়ও প্রচুর মুনাফা ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা আদায় করেছে। নব্য-আধুনিক শহর রাণাঘাটের নব্য-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি হাজারি ঠাকুরকে রেল কোম্পানির তৈরি করে দেওয়া রেল হোটেলের মালিক হিসেবে দেখে অনেকে আশ্চর্যান্বিত হয়। লেখকের ভাষায় বলা যায় —

“শ্বেতপাথরের টেবিল, চেয়ার, ইলেকট্রিক আলো, পাখা দিয়া সাজানো  
আধুনিক ধরনের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন অতি চমৎকার হোটেলটি। হোটেলের  
মালিকের স্থানে হাজারির নাম দেখিয়া অনেকে আশ্চর্য হইয়া গেল।”<sup>২৮</sup>

হোটেলের কর্মচারিরা হাজারি ঠাকুরকে শুধু মালিক নয় ; দক্ষ কারিগর হিসেবেও মান্য কর।  
এই মান্যতার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে শাসক-শাসিতের সম্পর্ক।

রেলপথ ভারতবাসীকে আধুনিক দেশের মানচিত্রে স্থান করে দেয়। কিন্তু রেলপথ থেকে বাংলার মানুষের চেয়ে বেশি উপকৃত হয় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি। কারণ, রেলের মাধ্যমেই ব্রিটিশ দ্রব্য-সামগ্রী ভারতের বাজারে প্রবেশ করে। ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের সুবিধার্থে রেল কোম্পানি বড় বড় স্টেশনে হোটেল স্থাপন করে। রাণাঘাট স্টেশনের নতুন ‘আদর্শ হিন্দু হোটেল’ এর জন্যেই বেচু চক্কতির ঐতিহ্যবাহী হোটেলটি বন্ধ হবার উপক্রম। স্টেশনের হোটেল ব্যবসায়ী হাজারি ঔপনিবেশিক সাহেবের মত অহংকারী। নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে অহংকারপূর্ণ ভাষায় কৃষ্ণলালকে বলে —

“রেলবাজারে আমার নাম বললেই সবাই দেখিয়ে দেবে।”<sup>২৯</sup>

যে হাজারি একদিন টাকা-পয়সার হিসেব-ই জানত না, সেই ব্যক্তি শ্রীচরণ গোয়ালার ছেলের বৌ-কে হ্যাণ্ডনোট দেয় টাকার বিনিময়ে। সে বর্তমানে পাকা ব্যবসায়ী। গোয়ালার বৌ-কে হাজারি ঠাকুর বলে —

“..... এবার যখন আসবো, শহর ঘুরিয়ে নিয়ে আসবো কিন্তু মনে থাকে যেন মা।” ২০

গ্রাম্য সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষদেরকে হাজারি শহরে সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় করে দিতে চায়। তৎকালীন সময়ে নাগরিক জীবনযাত্রার গতিবেগ ও তীব্রতা কিছু মানুষকে তার পূর্বতন সংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল আত্মানুপরায়ণতার দিকে। আত্মানুপরায়ণতার জন্যই শহরের মধ্যে দেখা দেয় শ্রেণীবিভেদ, রেষারেষি, ইংরেজি জানা ও অজানা মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব। গ্রামীণ সমাজে মানুষের মধ্যে যে আন্তরিকতা কিংবা পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল তা শহরে তথা আধুনিক জীবনে থাকেনি। গোষ্ঠীগত বন্ধন ও দায়িত্ব; ঐতিহ্য ও ধর্মবিশ্বাস এবং নৈতিক জীবনাদর্শ শিথিল হয়। ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ হাজারি ঠাকুরের জবানীতে বলেন —

“ব্যবসাদার লোকেদের পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট সহানুভূতি ও খাতির এখনও এইসব পাড়ারগাঁ অঞ্চলে আছে। রাণাঘাটের মত শহর জায়গায় রেষারেষির আবহাওয়ায় উহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে।” ২১

ঔপনিবেশিক শক্তির সংস্পর্শে এসে কিছু মানুষ আত্মানুপরায়ণ হলেও তারা জীবনকে নতুনভাবে নানারঙে দেখার সুযোগ পায়। প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে। কিন্তু ঔপনিবেশিক যুগে দেশীয় শিল্প বাণিজ্যের জায়গা দখল করে

নেয় নতুন এক বাণিজ্যনীতি। এই বাণিজ্যনীতিতে নির্দিষ্ট সংখ্যক ব্যবসায়ীর ছিল দখলদারী। এঁরা রাতারাতি ধনসম্পদ আহরণ করে নব-অভিজাত সম্প্রদায় রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই অভিজাত সম্প্রদায়ই ছিল আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার প্রধান পৃষ্ঠপোষক। এই সম্প্রদায় সাধারণতঃ চাকুরির পরিবর্তে ব্যবসাকেই লাভজনক হিসেবে গ্রহণ করে। কুণ্ডুবাড়ির বড়কর্তা হাজারি ঠাকুরকে দেখে বলেন —

“আমরা ব্যবসাদার মানুষ ঠাকুরমশায়, এইটে বুঝি যে চাকুরি করে  
কেউ কখনও উন্নতি করতে পারে না। উন্নতি আছে ব্যবসাতে, তা সে  
যে কোন ব্যবসাই হোক।” ২২

এই ‘উন্নতি’ ঔপনিবেশিক সমাজ-সংস্কৃতির উন্নতি। ঔপনিবেশিক সমাজের সংস্পর্শে এসে হাজারিও বর্তমানে সমাজের গণ্যমান্য ব্যবসায়ী। একসময়ের হাজারির মনিব দৌর্দন্ডপ্রতাপ পদ্মঝিও তাকে এখন সমীহ করে চলে। তার নাম ডাক রাণাঘাট থেকে সুদূর বোম্বাই পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। রেল, রেলবাজার, ঔপনিবেশিক শাসক সম্প্রদায় – সবকিছুর সঙ্গে-ই হাজারির দহরম-মহরম।

রাণাঘাট রেলবাজারের এককালের বড় হোটেল ব্যবসায়ী যদু বাঁড়ুয্যোও হাজারিকে বর্তমানে ভক্তিশ্রদ্ধা করেন। কালের চক্রপাকে বিশেষতঃ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির সহযোগে অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলে নব্য-ধনী সম্প্রদায়। পূর্বমনিব বেচু চক্ৰতিকে মাসিক মাইনে পঁচিশ টাকায় বাজারের হোটেলের ম্যানেজার হিসেবে হাজারি নিয়োগ করে। শুধু বেচু চক্ৰতি নয়, পদ্মঝিও হাজারির হোটেলের কর্মচারী হিসেবে নিযুক্তি পায়। নিজের হোটেল ওঠে গেলেও বেচু চক্ৰতির মানসিকতার কোনও পরিবর্তন ঘটেনি। সে হাজারির হোটেলের ম্যানেজার হয়ে

ভাবে —

“..... ইহা অস্বপনের স্বপন। এ আশা সে কখনো করে নাই। রেল-

বাজারের অত বড় কারবারী হোটেলের সে ম্যানেজার হইবে।” ২৩

ঔপনিবেশিক শাসনের যুগে গ্রাম বাংলার সমাজ-সংস্কৃতিতে ভাঙন ধরে এবং গ্রাম্য মানুষ শহরে আধুনিক সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষিত হয়। এই আকর্ষণের টানেই অনেকেই পল্লীবাংলা ছেড়ে শহরে আসে। কিন্তু শহরে সংস্কৃতির সঙ্গে অনেকে তাল মেলাতে না পেয়ে গ্রামে ফিরে যেতে চায়। তারা আত্মানুপরায়ণতা ভাব থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করে। হাজারির স্ত্রী স্বগ্রামে ফিরে এসে খুবই আনন্দিত। সে সরলা গ্রাম্য মেয়ে, শহরের আধুনিক জীবনযাত্রার চেয়ে পাড়ারগায়ের চাল-চলন-ই তার ভাল লাগে। উনিশ শতকের নবজাগরণের প্রভাব বাংলার নারীসমাজের আঙিনায় দোলা দিলেও হাজারির স্ত্রীকে এমন প্রভাবিত করতে পারেনি। অনেকদিন শহর রাণাঘাটে থেকেও তার মন গ্রাম্য ঐতিহ্যপূর্ণ পরিবেশের দিকে। গ্রামে পা দিয়েই মেয়ে টেপিকে বলে —

“..... তুই বস্ মা, আমি পুকুরে একটা ডুব দিয়ে আসি, পেরারাতলার

ঘাটে কতদিন নাই নি !” ২৪

গ্রাম্য প্রকৃতির মধ্যে সে মুক্তির পরিসর খুঁজে পায়।

তার এই মুক্তি চেতনা আসলে ঔপনিবেশীকৃত। কারণ হাজারিও ঔপনিবেশিক পরিসর থেকে মুক্তি পাবার জন্য বারবার প্রকৃতির কাছে গিয়েছে। নিজস্ব চেতনাকে স্ত্রী-র উপর চাপিয়ে দেয় হাজারি ঠাকুর। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে প্রান্তিকায়িত নারীর জগৎ একবাচনিক তাই নারীর ভাষা, চেতনা- সবকিছুই একবাচনিক। নারীর কণ্ঠস্বর বলে যা কিছু উত্থাপিত হয়েছে, কয়েকটি



ব্যতিক্রম ছাড়া প্রত্যেক কণ্ঠস্বর-ই উপনিবেশিকৃত সত্তার মিথ্যা উচ্চারণমাত্র। অর্থাৎ পুরুষের বাচনেরই প্রতিধ্বনি। এখানে সমালোচক লুসি ইরিগেরে এর একটি মন্তব্য আমরা তুলে ধরতে পারি —

“When women want to escape from exploitation, they do not simply destroy a few ‘prejudices’; that upset the whole set of dominant values economic, social, moral, sexual .... They question the very foundation of our social and cultural order, the organisation of which has been prescribed by the patriarchal system.”<sup>২৫</sup>

তাই কিছু কিছু ক্ষেত্রে নারী তার নিজস্ব ব্যক্তিত্বকে তুলে ধরেছে এই সমাজ ব্যবস্থায়। এসব নারী গ্রাম্য পরিবেশের চেয়ে শহুরে আধুনিক সমাজ ব্যবস্থাকে মনে প্রাণে মেনে নিয়েছিল। তাই টেপির মত মেয়ে অশিক্ষিত হয়েও শহুরে আধুনিক হাওয়ায় ভরপুর।

প্রাক-ঔপনিবেশিক বাংলার সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের মন নানা কুসংস্কারে লালিত ছিল। ঔপনিবেশিক যুগে বাংলার মানুষ এসব কুসংস্কারের উর্ধ্বে ওঠে আধুনিক পরিসরের দিকে যাত্রা করে। বিশেষতঃ উনিশশতকের বাংলার নবজাগরণে বাঙালির মানসক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটে। এই মানসক্রিয়ায় দেখা যায়, বাঙালি মন ও মনন প্রাচীন তথা ঐতিহ্যপূর্ণ চিন্তাকে আর হুবহু গ্রহণ করতে সম্মত হয়নি। দীর্ঘদিন থেকে যেসব প্রথা বা রীতি-নীতিতে জীবন নিয়ন্ত্রিত, বর্তমানের স্থিতিতে দাঁড়িয়ে সেগুলির পরিবর্তনের প্রয়াস মানুষের মনে জাগে। টেপির বাঙ্করী তথা বালু-বিধবা অতসী সমাজের কুসংস্কারের উর্ধ্বে ওঠে মা-বাবার সামনে সখবার বেশ ধারণ

করে। তার মধ্যে আধুনিকতার পূর্ণ ছাপ দেখা যায়। অতসী বলে -

“মা - বাপের চোখের সামনে সে বিধবার বেশে ঘুরিতে ফিরিতে পারিবে না। ইহাতে পাপ হয় হইবে।” ২৬

পূর্বেই উল্লেখ্য, বিভূতিভূষণের উপন্যাসে প্রকৃতি হচ্ছে ঔপনিবেশিক পরিসর থেকে মুক্তি পাবার মূল চাবিকাঠি। তাই উপন্যাসের নায়ক হাজারি ঠাকুর যখন-ই ঔপনিবেশিক পরিবেশ থেকে মুক্তির স্বাদ খুঁজেছে তখন-ই সে চুণীর ধারে একাকী চলে যায়। সেখানে বসে বসে প্রকৃতির স্বাদ উপভোগ করে। এমনকী সুদূর বোম্বাই শহরে যাবার আগে পূর্ব অভ্যাস মত সেখানে বসে বসে ভাবে -

“..... চুণীর খেয়াঘাটে ওপারের ফুলে - নব্লার হাটের হাটুরে  
লোক পারাপার হইতেছে - পুরোনো দিনের মতই সব।” ২৭

প্রকৃতি-ই বিভূতিভূষণে উপন্যাসে প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত আষ্টে-পৃষ্ঠে অষ্টোপাসের মত বেঁধে রাখে। এই প্রকৃতি সম্বন্ধে সমালোচক পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন -

“ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র, প্রযুক্তি, অর্থনীতি যখন আষ্টেপৃষ্ঠে এদেশকে গ্রাস করছে, তখন বিভূতিভূষণ ব্যক্তির এককে এর বাইরে আসতে চাইছেন, এখানকার চূড়ান্ত বাস্তব ঔপনিবেশিক প্রসারিত বাহুর বাইরে এটাই বিজ্ঞানের সূত্রে বলা হয়, ধর্ম ও বিজ্ঞানকে বিরোধী মনে করেন না, এই ধর্মকে উপনিবেশ মারতে পারেনি। আর এ ধর্ম আসলে প্রকৃতি।” ২৮

উপন্যাসের অন্তিম পরিসরে এসেও দেখা যায়, হাজারি ঔপনিবেশিক শাসকদলের আহ্বানে সাড়া দেয়। সে রেলস্টেশনে হোটেল চালায়। বিভিন্ন রেলস্টেশনে অবস্থিত হোটেলের রান্নার

পরিদর্শক হয়ে সুদূর বোম্বাই যাত্রা করে। পদ্মঝি-র মানসিক পরিবর্তন এবং হাজারির পায়ে পড়ে তার ভক্তি দেওয়া - এসব-ই সম্ভব হয়েছে অদৃশ্য শক্তির অঙ্গুলি হেলনে। হাজারি অবশ্য রাধাবল্লভ ঠাকুরকেই তার সমস্ত উন্নতির দায়ভার অর্পন করে। ঔপনিবেশিক শাসন প্রক্রিয়ার মধ্যে থেকেও হাজারি মাঝে মাঝে মুক্ত আকাশের নীচে চূর্ণীনদীর ধারে বসে এই প্রক্রিয়া থেকে মুক্তি পাবার চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়ত। অথচ সেখান থেকে ফিরে আসাও সম্ভব নয়। এভাবেই ফুটে ওঠেছে ‘আদর্শ হিন্দু হোটেল’ উপন্যাসে ঔপনিবেশিক মনন ও আধুনিক চেতনার মধ্যে অমীমাংসিত দ্বন্দ্ব।

#### উল্লেখপঞ্জি —

- ১। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় - বিভূতি রচনাবলী - জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, ৪র্থ খণ্ড, ১৪০৩, মিত্র ও ঘোষ পাঃ প্রাঃ লিঃ, পৃঃ ৩
- ২। অনিন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায় - প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্প মননে ও সৃজনে, ২০০৫, পুস্তক বিপণি, পৃঃ ২০
- ৩। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় - পূর্বোক্তগ্রন্থ, পৃঃ ২৬
- ৪। তদেব - পৃঃ ৭৩
- ৫। স্বপন বসু - বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস, ২০০৩, পুস্তক বিপণি, পৃঃ ১৭৯
- ৬। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় - পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৬
- ৭। স্বপনবসু ও হর্ষ দত্ত (সম্পাদিত) - ‘বিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি’ গ্রন্থ

থেকে উদ্ধৃত, ২০০০, পুস্তক বিপণি, পৃঃ ১১৩

- ৮। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় - পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১৮
- ৯। তদেব - পৃঃ ৬০
- ১০। তদেব - পৃঃ ১০
- ১১। ভূদেব চৌধুরী - বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (দ্বিতীয়পর্ষায়), ১৯৬৪,  
বুকল্যাণ্ড প্রাঃ লিঃ, পৃঃ ২৬
- ১২। রমেশচন্দ্র দত্ত - বাংলার কৃষক সমাজ, ১৪০৩, দীপায়ন, পৃঃ ১৫৩
- ১৩। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় - পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৬৩
- ১৪। তদেব - পৃঃ ২০
- ১৫। তদেব - পৃঃ ৯৩
- ১৬। তদেব - পৃঃ ৯০
- ১৭। স্বপনবসু ও ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী (সম্পাদিত) - 'উনিশ শতকে বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি'  
গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, ২০০৩, পুস্তক বিপণি, পৃঃ ৫২
- ১৮। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় - পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১০৪
- ১৯। তদেব - পৃঃ ১১১
- ২০। তদেব - পৃঃ ১১৩
- ২১। তদেব - পৃঃ ১১৪
- ২২। তদেব - পৃঃ ১১৬
- ২৩। তদেব - পৃঃ ১২৫

- ২৪। তদেব — পৃঃ ১২৭
- ২৫। তপোধীর ভট্টাচার্য - 'বাখতিন : তত্ত্ব ও প্রয়োগ' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, ১৯৯৬,  
পুস্তক বিপণি, পৃঃ ৩৯
- ২৬। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় - পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১২৮
- ২৭। তদেব — পৃঃ ১২৬
- ২৮। পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় - উপন্যাস রাজনৈতিক : বিভূতিভূষণ, ১৯৯২, র্যাডিক্যাল  
ইম্প্রেশন, পৃঃ ১৩

## অনুবর্তন

সমাজ ও অর্থনীতির সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। যেকোন দেশের সাহিত্যের আঙিনায় কোনও ধরনের বিবর্তন কিংবা নতুনত্ব এই দুইয়ের সহযোগিতায় তৈরি হয়। তেমনি তৈরি হয় নতুন ‘উপন্যাস’। উপন্যাসের কর্মভূমি নাগরিক জীবন, বলা যায় আধুনিক নগর। বঙ্গভূমিতে এই আধুনিক নগরের পত্তন ঘটে ব্রিটিশরা আসার পর। তাই কিছুসংখ্যক মানুষ ইংরেজ সম্প্রদায়কে আপন ভেবে গ্রহণ করেছিলেন। এখানে সমালোচক স্বপন বসুর একটি মন্তব্য উল্লেখনীয় –

“উনিশ শতকের প্রথমার্ধকে সচেতন বাঙালির ইংরেজের প্রতি বিশ্বাসের যুগ বলতে পারি।” ১

ব্রিটিশরা বঙ্গভূমিতে আসার পূর্বে গ্রাম ও গ্রাম্যজীবন-ই ছিল সবকিছুর-ই উৎস। শিক্ষা - দীক্ষা, বৃত্তি, পেশা –সবই ছিল গ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তখনকার কলকাতার সঙ্গে বাংলাদেশের অন্যান্য গ্রামের বিশেষ কোনও পার্থক্য ছিল না। কিন্তু ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা চলে যাবার পর থেকেই গ্রাম্যজীবনের দ্বিতীয়া পিরামিডের স্তম্ভ এক এক করে খসে পড়ে নতুনভাবে গড়ে ওঠে কলকাতাকেন্দ্রিক নগর সভ্যতা। নগর কলকাতার গঠন সম্পর্কে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অশোক সেন বলেন –

“ঔপনিবেশিক আধিপত্যের যে বাস্তবে বাংলার উৎপাদন অর্থনীতি ধ্বংস হচ্ছে, তার সংশ্লিষ্ট ধারা-উপধারায় আবার ইংরেজি শিক্ষা ও ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান বাঙালি নব্য মধ্যবিত্তের ভাবের ঘরে এসে

পৌছিল। আঠারো শতক থেকে বাংলায় ইংরেজের পশ্চন যেভাবে  
যতটা বিস্তৃত ও সংগঠিত হয়েছে, তার সঙ্গে অবশ্যই স্থানীয় সমাজের  
নানা ভাঙাগড়া জড়িয়ে যায়। নগর কলকাতার সূচনা ও বিকাশ সেই  
বিবর্তনের একটি প্রধান ঘটনা।” ২

এই ভাঙাগড়ার জন্য কলকাতায় তাড়াতাড়ি সুস্থ সংস্কৃতি গড়ে ওঠেনি। তবে তাড়াতাড়ি  
গড়ে না উঠলেও কলকাতা পুরো দেশের হৃদযন্ত্রে পর্যবসিত হয়। এখানে বিদগ্ধ পণ্ডিত এন,  
কে. সিনহার একটি মন্তব্য উল্লেখনীয় —

“There was no other city of great trade in Bengal except  
Calcutta at the end of the Eighteenth century.” ৩

কলকাতায় বিস্তৃশালী ঔপনিবেশিক শাসক সম্প্রদায়কে সাহায্য করত দেশীয় দেওয়ান, জমিদার,  
দালাল, ঠিকাদার ও মুৎসিদ্দি সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায় বাংলার সম্ভান হলেও মানসিকভাবে ছিল  
বিদেশি স্বভাবপুষ্ট। তাদের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল আর্ষত ছিল কবিগান, আখড়াই, টম্পার অশ্লীল  
পরিসরে। তবে লক্ষণীয় বিষয় উনিশ শতকের মধ্যভাগে লর্ড বেণ্টিকের সময়ে বাঙালি সমাজে  
চাকুরিলাভের সম্ভাবনা প্রকট হয়। কারণ ১৮৩৭ খ্রীঃ আইন-আদালতের ভাষা ফার্সির পরিবর্তে  
ইংরেজি হয়। এর ফলে ইংরেজি শিক্ষিত দেশীয় বাঙালি চাকুরিজীবী সম্প্রদায়ের সম্প্রসার  
ঘটে। এসময়ে কিছু দালাল ধরনের লোক বিদেশি ঔপনিবেশিক শক্তির সঙ্গে বৌথ ব্যবসায়  
জড়িয়ে পড়ে। চাকুরি ও বাণিজ্যের সম্প্রসারণে কলকাতা বিনিয়োগ ও উপার্জনের কেন্দ্রস্থল  
হওয়ার কারণে গ্রাম্য- জীবনের রক্তের আভিজাত্য, বংশের কৌলিন্য মুদ্রার কাছে হার মানে।  
ফলে কলকাতা বিদ্যাবলিক ও বিত্তবলিকের পীঠস্থানে পরিণত হয় ; মিলন ঘটে, বাণিজ্যিক

সংস্কৃতির সঙ্গে শিক্ষিত সংস্কৃতির। এই দুই সংস্কৃতির সৃষ্টির ফসল হল ‘মধ্যবিত্ত সমাজ’। এ সম্পর্কে A. F. Pollard তাঁর Factors in modern History বইতে লিখেছেন —

“Without commerce or industry there can be no middle class; where you had no middle class, you had no renaissance.”<sup>৪</sup>

শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ তখন শুধু নিজস্ব ধন-সম্পত্তির উন্নতিতে মন দেয়নি, মন দেয় আত্মোৎকর্ষের প্রয়োজনে ‘বাজেট সর্বস্ব’ জীবনভাবনার বাইরে জীবনকে নানাভাবে পরখ করার আগ্রহ প্রকাশ পায়। জীবনের এলোমেলো গদ্যের সঙ্গে তাল-লয় সমন্বিত পদ্যের সমন্বয় ঘটাতে চেষ্টা করে। আত্মিক সচেতনতা সমাজ - চেতনার পরিপূরক হয়ে ওঠে। বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের এই যুগান্তকারী ভূমিকাকে মনে রেখেই ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’য় লিখিত হল —

“..... মধ্যবিত্ত লোক সকল সময়েই সমাজে অধিক উপকারী বলে পরিগণিত হন। এ দেশের সৌভাগ্য অনেক অংশে এই শ্রেণীর লোকের উপর নির্ভর করে। ... এখন এদেশে যতরূপ শুভসূচক কার্যের উদ্যোগ হইতেছে তাহা ইহাদের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত, .....।”<sup>৫</sup>

বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রায় ঠিক করে নেয়, চাকুরির পছাটি যদি একটু উত্থান-পতন বন্ধুর হয়ও, হাসিমুখে দাসত্বকে স্বীকার করেও সেই পথকে অনুসরণ করে তারা যুগ যুগ ধাবিত হতে পারবে। কিন্তু ঔপনিবেশিক শক্তির বৃহৎ পুঁজি যখন এদেশে আসতে শুরু করে, তখন সবার অজান্তে পূর্ববর্তী অবস্থানের পট পরিবর্তন ঘটে। কারণ, এই বৃহৎ পুঁজি দেশীয় শিল্প - বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে ব্যবহৃত হয় না। ফলস্বরূপ, এদেশের শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক বিস্তার



থমকে যায়। স্বাভাবিকভাবেই সেসময় থেকেই বৃত্তি ও চাকরির ক্রমবর্ধমান পরিসর স্থবির হয়ে পড়ে। এর ফল ধীরে ধীরে স্পষ্ট হল বিশ শতকের প্রথমপাদ থেকেই। এই সময়ে শুধু আর্থিক পরিসরে নয় ; বাঙালির জীবনযাত্রা, চিন্তা, ভাবনায় এমনকী মানসিকতায়ও পরিবর্তন আসে। উনিশ শতকে জাতীয় জীবনে যে বলিষ্ঠতা ও বেগ সংস্কারিত হয়, নবজাগরণ ঘটে, বিশ শতকের বাঙালির জাতীয় জীবনে সেই বলিষ্ঠতা ও বেগের ঘাটতি সহজেই অনুমেয়। বিশেষতঃ বিশ শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকের পর থেকেই এই ঘাটতি পরিস্ফুট।

ঔপনিবেশিক শাসক সম্প্রদায়ের পরিচালিত ইংরেজি স্কুল ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত শিক্ষক সমাজের এক বাস্তব ছবি ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ তাঁর ‘অনুবর্তন’ উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। উপন্যাসের প্রথমেই আমরা দেখতে পাই, কলকাতার মর্ডান ইনস্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক, ইংরেজ ক্লার্কওয়েল সাহেবকে। তিনি ইংরেজ শাসকদের মতই স্কুল পরিচালনা করেন এবং নিত্য নতুন উপায়ে স্কুলের উন্নতি করতে চান। স্কুলের শিক্ষক যদুবাবু, ক্ষেত্রবাবু, নারায়ণবাবু, মিঃ আলম এমনকী নতুন করে যোগদান করা শিক্ষক রামেন্দুবাবু প্রত্যেকেই ক্লার্কওয়েল সাহেবের অধীনস্থ কর্মচারী। ঔপনিবেশিক শাসক সমতুল্য প্রধান শিক্ষকের উপর তাঁদের বিশেষ আস্থা ও বিশ্বাসের মনোভাব ছিল। এসব শিক্ষক অর্থ উপার্জনের আকাঙ্ক্ষায় গ্রাম পরিত্যাগ করে শহরে আসেন। এখানে সাহিত্য সমালোচক ভূদেব চৌধুরীর একটি মন্তব্য উল্লেখনীয় –

“বস্তুত ধন-লোভ ও যথেষ্ট ভোগের আকাঙ্ক্ষাকে কেন্দ্র করেই আসলে গড়ে উঠেছিল বাংলার নগর জীবনের বনিয়াদ, ধনের লোভেই বাঙালি সেদিন গ্রামের ঘর ছেড়েছিল।” ৬

এসব তথাকথিত ইংরেজি শিক্ষিত আধুনিক ব্যক্তির নিজেদেরকে ছাড়া অন্যের কথা ভাবতে চাননি। তারা গ্রামের আত্মীয়-স্বজন থেকে, ঐতিহ্য থেকে ছিটকিয়ে পড়ে। আধুনিক নগরজীবনে অভ্যস্ত বলেই নারাণবাবুর মত একজন আদর্শ শিক্ষক বরিশালের পল্লীগ্রামে সামান্য কয়েকদিনই আত্মীয়ের বাড়িতে থাকতে পারেননি। নারাণবাবু সম্পর্কে লেখক জানিয়েছেন –

“গরীব স্কুল-মাস্টার হইলেও নাগরিক মনোবৃত্তি তাঁহার মল্লজাগত -

সত্যিকার শহুরে মানুষ।” ৭

এসব তথাকথিত শহুরে মানুষেরা নগরমুখী হয়ে গ্রামজীবন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বলা যায়, দেশ ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, কিছুটা যেন ছিন্নমূলও হয়ে পড়ে। গ্রামীণ ঐতিহ্যের প্রতি মোহভঙ্গের কারণ, ইংরেজি ভাষার দাসত্ব স্বীকার, বড় চাকুরির টান। তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই ঘটে ভূমির সঙ্গে বিচ্ছেদ।

প্রতীচ্যের ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি তখন কিছুসংখ্যক মানুষের আকর্ষণ ছিল প্রবল। বলাই বাহুল্য তাঁদের ভাষা-সংস্কৃতির দৌলতেই আমাদের ঐতিহ্যের বিনির্মাণ ঘটে। এই বিনির্মাণে প্রত্যেক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন রামমোহন, বিদ্যাসাগর, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, ডেভিড হেয়ার প্রমুখ কর্তাব্যক্তি ও অন্যান্য সামাজিক সংগঠন। এসম্পর্কে বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক ভূদেব চৌধুরী বলেছেন –

“যুরোপীয় চেতনার প্রাণস্পর্শে ভারতবর্ষীয়তার নব-সঞ্জীবনই আসলে  
উনিশ শতকের সমাজ বিপ্লবের যথার্থস্বরূপ। বাংলার প্রথম তরুণদল,  
ডিরোজিও’র মধ্যে সেই প্রাণস্পর্শ পেয়েছিল ; রামমোহন রায় আর  
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দিয়েছিলেন নিখিল বাংলার নবসঞ্জীবন-মন্ত্র।” ৮

এই নবসজ্জীবন-ই সেকালের মানুষদেরকে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করে। এই উপন্যাসেও লক্ষনীয় কলকাতার মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় - ‘মর্ডান ইন্সটিটিউশন’ এর মহিলা শিক্ষক মিস্ সিবসনের কাছে তাদের ছেলোমেয়েকে নিখুঁত ইংরেজি শেখার জন্য পাঠায়। লেখকের ভাষায় বলা যায় -

“আশপাশের অবস্থাপন্ন গৃহস্থেরা মেমসাহেবের কাছে পড়িতে পাইবে  
ও নিখুঁত ইংরেজী উচ্চারণ শিখিতে পাইবে, এই লোভে ছেলোদের এই  
স্কুলে ভর্তি করে।” \*

ঔপনিবেশিক শিক্ষা সংস্কৃতির প্রতি বাংলার মানুষ আকৃষ্ট হলেও ইংরেজ শাসক সম্প্রদায়কে ভয়ও করত। শাসকস্বরূপ প্রধান শিক্ষককে স্কুলের ছাত্র-শিক্ষক সবাই ভয় ও শ্রদ্ধা করে। তাঁর কথার বিরুদ্ধে যাওয়ার কারও সাহস নেই। এমনকী তাঁর হুকুমের বিরুদ্ধে কমিটিতে কোনও আলোচনা-ই হত না। তিনি ছিলেন মাস্টারদের ডিগ্রি নিষ্পত্তির একমাত্র মালিক। অমনোযোগী, ফাঁকিবাজ শিক্ষক যদুবাবুকে নির্দিধায় বলেন -

“মাই গেট ইজ ওপন। আপনার অসুবিধে হলে আপনি চলে যেতে  
পারেন।” \*\*

প্রধান শিক্ষক ঔপনিবেশিক শাসকের মতই শিক্ষকদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখেন এবং তাদের কাজের তদারকির দায়িত্ব দেন এদেশীয় এক শিক্ষক মিঃ আলমের উপর।

নতুন রাজশক্তি শাসন ক্ষমতা দখল করার পর এ দেশীয় একদল সুযোগ সন্ধানী মুৎসিদ্দিগিরি করে প্রচুর বিত্ত ও কৌলিন্যের অধিকারী হয়। শিক্ষক আলমও ছিলেন এই স্বভাব চরিত্রের লোক। আলম সম্পর্কে লেখক বিদূতিভূষণ বলেন -

“ধূর্ত চোখ, চটপটে ধরনের চালচলন-লোক ভাল নয়। হেডমাস্টারের

দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ, মাস্টারেরা ভয় করিয়া চলে, ভালবাসে না।” ১১

স্কুল কমিটির কিছু সদস্য সাহেবকে সরানোর চেষ্টা করেও শেষপর্যন্ত দেশের নাগরিকের উন্নতির স্বার্থে সেপথে আর যায়নি। এসব উচ্চবিস্তৃত কিংবা উচ্চ-মধ্যবিস্তৃত বাঙালি ভদ্রলোক সাধারণভাবে ইংরেজ সমর্থক কিংবা অন্তরে ছিলেন ইংরেজি নীতির সমর্থক। ঔপনিবেশিক শাসকের সাহচর্য পাওয়া আধুনিকতাপন্থী বাঙালি বুদ্ধিজীবী ঔপনিবেশিক শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য বিষয়ে অবগত হয়েই এই নীতিকে সমর্থন করেন। এসব বুদ্ধিজীবীরা ইংরেজ শাসকের অনুগত এবং দেশীয় শাসনের চেয়ে ইংরেজ শাসনকে আশীর্বাদ হিসেবেই মেনে নেয়। স্বদেশি গাঙ্গুলিবাবু থেকে আরম্ভ করে ষড়যন্ত্রকারী আলম পর্যন্ত ভেতরে ভেতরে সাহেবের বিরোধিতা করলেও সামনে সবাই সাহেবের পক্ষ নিয়ে কথা বলে। তাদের মানসিকতার স্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে আলমের কথার মধ্যদিয়ে —

“তিনি এখনও ক্লার্কওয়েল সাহেবের অধীনে চাকুরি করেন, প্রকাশ্যে তিনি কোনও মতেই তাঁহার বিরুদ্ধে যাইতে পারেন না ; বরং শিক্ষকদের প্রতিনিধি হিসাবে শিক্ষকদের স্বার্থ বজায় রাখিয়া তিনি কর্তব্য পালনই করিয়াছেন।” ১২

সাহেবের কথার ভঙ্গি ও ব্যক্তিত্বের কাছে সবাই অবদমিত। তিনি যখন শিক্ষকদের সভায় বক্তৃতা প্রদান করেন, তা যেন হয়ে ওঠে সংসদে কোনও প্রধানমন্ত্রীর গুরুগম্ভীর ভাষণের মত। শিক্ষকতা সম্পর্কে ক্লার্কওয়েল সাহেব বলেন —

“..... শিক্ষকতা একটা গুরুতর দায়িত্ব — এই জ্ঞান যাদের না থাকে,

তারা শিক্ষক এই মহৎ নামের উপযুক্ত নয়।” ১০

সাহেবের মাইনে সময় সময় বাড়ে কিন্তু অন্যান্য শিক্ষকের মাইনে একই জায়গায় স্থবির থাকে। এসব শিক্ষক সংসারের দুরবস্থাকে স্বীকার করেই প্রধানশিক্ষকের প্রহসনতুল্য শিক্ষকসভায় হাজির থাকেন। আসলে প্রান্তিকায়িত শিক্ষকদের অস্তিত্ব শাসকশ্রেণীর দয়ার উপর নির্ভরশীল। তাই প্রধান শিক্ষক নিজ মর্জি মত স্কুল পরিচালনা করেন। তিনি শিক্ষকদের শত অনুরোধেও মনিংস্কুল চালু করেন না। আবার নিজ মর্জি মত কয়েকদিন পর মনিংস্কুল আরম্ভ করেন। প্রধানশিক্ষক সম্বন্ধে ঔপন্যাসিক লিখেছেন -

“ক্লার্কওয়েল একগুঁয়ে প্রকৃতির মানুষ, যাহা ধরিয়েছেন তাহার নড়চড়

হইবার জো নাই।” ১৪

তিনি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী নয় ; আমলাতন্ত্রে বিশ্বাসী। সময়নিষ্ঠা- কর্তব্যনিষ্ঠার, সূনাগরিক গড়ার প্রতি তাঁর কোনও ফাঁক নেই। মনে-প্রাণে তিনি স্কুলের উন্নতির চেষ্টা করেন। এই ‘উন্নতি’ ঔপনিবেশিক শাসনের উন্নতি। ক্লার্কওয়েল সাহেবের স্কুল পরিচালনা নীতির বিরুদ্ধে প্রথম প্রশ্ন তুলেন নতুন শিক্ষক রামেন্দুবাবু -

“আপনার এরকম মীটিং মাস্টারদের পক্ষে বড় কষ্টদায়ক হয়। এতে

স্কুলের কাজ হয় না।” ১৫

আত্মসচেতনাই হল আধুনিকতার লক্ষণ। রামেন্দুবাবু ঔপনিবেশিক শাসকের বিরুদ্ধে মুখ খুলে আধুনিক মানসিকতার পরিচয় দেন। তিনি যখন বলেন -

“আপনার এই শাসনপ্রণালী যে আদৌ ফলপ্রদ নয়, তা আপনাকে

স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়াতে আপনি আমায় শত্রু ভাববেন না।” ১৬

তা একপ্রকার ঔপনিবেশিক শাসকের কাছে আত্মসমর্পণ। ‘আপনার’ এবং ‘শাসন প্রণালী’ শব্দ দুটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ‘আপনার’ শব্দটির মধ্যেই রয়েছে শাসক ও শোষিতের পার্থক্য এবং ‘শাসনপ্রণালী’ যেন ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থারই আভাস। রামেন্দুবাবু প্রধানশিক্ষকের শাসন প্রণালীর বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুললেও তিনিও সেই অষ্টোপাসের জালে আবদ্ধ।

প্রধানশিক্ষক ঔপনিবেশিক শাসকের মতই নতুন শিক্ষকের সমালোচনাকে পাত্তা না দিয়ে আত্মস্থ করেন। বরং তিনি নতুন শিক্ষকের ইংরেজি বলার ক্ষমতার গুণগান করেন বিশ্বস্ত শিক্ষক আগমের কাছে। ধীরে ধীরে রামেন্দুবাবু-ই হয়ে ওঠেন শিক্ষকদের মুখপাত্র। ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ শুধুমাত্র ক্লার্কওয়েল সাহেব নয়, সমগ্র মধ্যবিত্ত সমাজের বাস্তবচিত্র এই উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। এঁরা প্রত্যেকেই ঔপনিবেশিক পরিসরে আবৃত। এমনকী স্বদেশিরাও এই পরিসর থেকে মুক্ত নন। উনিশ শতকের সত্তর দশকের সময় বাংলার সমাজে এক নতুন আলোড়নের সৃষ্টি করেন কেশবচন্দ্র সেন। তিনি ছিলেন গোঁড়া হিন্দুধর্ম বিরোধী ; ব্রাহ্মসমাজভুক্ত। কিন্তু তিনিও সমাজের মধ্যে ভেদাভেদ ভুলে এক অভিন্ন শিক্ষানীতির কথা মনে নিতে না পেরে উচ্চশ্রেণী ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে আলাদা শিক্ষার কথা ব্যক্ত করেন। তাঁর মতে --

“While it must place general knowledge of a rudimentary but useful character within the reach of the lowest and poorest in the land, it should give the best kind of instruction available to pupils of higher classes .....” <sup>১৭</sup>

তিনি চেয়েছিলেন, উচ্চশ্রেণীর শিক্ষার স্বার্থ রক্ষা করে জনশিক্ষার বিস্তার।

এই কাঠামোর গড়ে ওঠা মধ্যবিত্ত কিংবা উচ্চমধ্যবিত্ত স্বদেশি বাঙালি সমাজের মনে

‘আমরা’ ‘তোমরা’ দ্বিবাচনিক সত্তা থাকাটা স্বাভাবিক ব্যাপার। এসব স্বদেশিরা ঐতিহ্যের তল্লিবাহক হলেও ভেতরে ভেতরে ছিলেন ঔপনিবেশিক শক্তি ও তা থেকে উদ্ভূত আধুনিক শিক্ষার প্রতি আগ্রহী। ঐতিহ্যধারী রাখাল মিত্রের ব্যাকরণ বইটি পুরনো রীতিতে লেখা বলে অভিযোগ করেন এক বিশেষ স্কুলের জনৈক প্রধান শিক্ষক। তিনি বলেন —

“মশাই, আপনার বই পুরনো মেথডে লেখা, ও এখন আর চলে না।”<sup>১৮</sup>

পুরনো নিয়ম - কানুন ঔপনিবেশিক আধুনিক জগতে অচল। কিন্তু আধুনিকতার ভেঙ্খারী জনসমাজ পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার গণ্ডিকে অতিক্রম করতে পারেনি। মিস্ সিব্‌সনের মত একজন শিক্ষিত, ছাত্রদরদী শিক্ষিকাকে প্রায় জোর করে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। সাহেবের পার্শ্বচর আলম স্কুল কমিটির সভায় প্রশ্ন তুলে —

“ছেলের স্কুলে মেয়ে মানুষ শিক্ষয়িত্রী কেন?”<sup>১৯</sup>

এমনকী আলমের মাইনে কমানোর কথা সভায় উত্থাপিত হলে প্রধান শিক্ষক সেই প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে দ্বিধাবোধ করেননি।

বিশ শতকের পরবর্তী সময়ে বাংলার মানুষ ইংরেজি শিক্ষা সংস্কৃতি, আচার-আচরণে উদ্বুদ্ধ হলেও কিছু মানুষ ছিলেন এর বিপরীত মেরুতে। এই বিপরীত শ্রেণীর মানুষ-ই ঐতিহ্যের কাঠামোকে ধরে রাখতে আগ্রহী। এই কাঠামোর ঘোর সমর্থক প্রতিনিধি পঞ্চাননবাবু মনে করেন —

“পশ্চিম হইতে যাহা কিছু আসিয়াছে সব খারাপ, এদেশে যাহা ছিল সব ভাল।”<sup>২০</sup>

দীর্ঘদিনের ইংরেজি শাসনের কুফল এবং তাদের অত্যাচার, পীড়নের ফলে বাংলার মানুষের তথা ভারতবাসীর মানসিকতার ক্রমশঃ পরিবর্তন ঘটতে থাকে। তাদের অবস্থান পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্বার্থবোধেরও পরিবর্তন ঘটে। এখানে সাহিত্য সমালোচক সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের একটি মন্তব্য উল্লেখনীয় –

“আত্মপ্রসারে যেমন যেমন যে প্রতিহত হয়েছে, ঠিক তেমন তেমন

করেই তার চেতনারও রূপান্তর ঘটতে শুরু করেছে।” ২১

প্রতীচ্যের সাহিত্য-সংস্কৃতি, যুক্তিবাদ, নবজাগরণ মধ্যবিশ্বের হৃদয়ে জন্ম দেয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের। এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ থেকে জন্ম নিয়েছে সচেতন অধিকার বোধ। সচেতন অধিকারবোধের জন্যেই মানুষ যেমন ভাল-মন্দ বিচার করতে শিখেছে তেমনি জন্ম ঘটেছে জাতীয়তাবোধের।

আত্মসচেতনাবোধের জন্যেই অনুকূলবাবু, নারাণবাবুর মত ব্যক্তি ঐতিহ্যকে বিনির্মাণ করে নতুন জগৎ পরিসরকে সাদরে অভ্যর্থনা জানান। প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক অনুকূলবাবুর সঙ্গে বর্তমান প্রধান শিক্ষক ক্লার্কওয়েল সাহেবের তুলনা করে নারাণবাবু বলেন –

“অনুকূলবাবুর মত লোক হচ্ছে এই সাহেব। ..... তুমি আমি টীচার

নই - টীচার ছিলেন অনুকূলবাবু, টীচার হল এই সাহেব।” ২২

সাহেবের শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষিত হয়ে বাংলার জনসমাজ নতুন সূর্যের আলো দেখতে পাবে - এটাই ছিল নারাণবাবুর অভিমত। এটা শুধু নারাণবাবুর অভিমত নয় ; এটি হল সমগ্র মধ্যবিশ্ব সম্প্রদায়ের ধারণা। মধ্যবিশ্বের সবসময়ই প্রধান ভূমিকা নেয় সমাজ ইতিহাসের পালাবদলের। এই পালাবদলের আরেক সহযোগী সত্তা হল ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতি। ইংরেজি শিক্ষা মানেই



ছড়া মুখস্থ করা শিক্ষা নয় ; সেই শিক্ষা হল এক নতুন জগতের পরিচয় বহনকারী। আধুনিক যুগের পথ প্রদর্শক প্রতীচ্যের এই শিক্ষাই হয়ে দাঁড়ায় সামাজিক প্রতিপত্তির প্রধান কারণ। এই শিক্ষাই মানুষকে যেমন সত্যনিষ্ঠা, পাপের প্রতি ঘৃণা, অন্যায়ের বিরুদ্ধতা করতে শিখিয়েছে, তেমনি অন্যদিকে এই শিক্ষার জোরে চাকুরিসূত্রে প্রচুর ধন-সম্পদ অর্জন করে অনেকেই সমাজে প্রতিষ্ঠা পায়। বিদ্যা-শিক্ষাই হল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মূল অস্ত্র। মধ্যবিত্তশ্রেণী সমাজ বদলের মূল কাণ্ডারী হলেও অনেক ইংরেজ ভেবেছিল সমগ্র ভারতবর্ষে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার ঘটালে দুই জাতির মধ্যে মিলনের সেতু গড়ে উঠবে। তাই ইংরেজ সাহেব এ. মেকেলে তাঁর ‘শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব’-এ লিখেছেন –

“এই মধ্যবিত্তরা হবে রক্তে ও রঙে ভারতীয় আর রুচিতে, মতে,

নীতিতে ও বুদ্ধিতে ইংরেজ।” ২৩

শুধুমাত্র নবজাগ্রিত প্রতীচ্যের বিদ্যা-শিক্ষা নয়, ঐতিহ্যগত দেশীয় বিদ্যাও বিনির্মিত হয়ে সমাজে নতুন করে শ্রদ্ধামিশ্রিত স্থান পায়। এজন্যেই বিদ্যাসাগর যেমন বাঙালির মনে স্থান লাভ করেন তেমনি ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীও স্থান পায়। এই দুই গোষ্ঠী-ই মনের অজান্তে বাংলায় সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিপ্লবের সূচনা করে। সমালোচক স্বপন বসুর মতে –

“কিছুসংখ্যক বাঙালির মনে ধীরে ধীরে আসতে লাগল নবচেতনা,

নবজিজ্ঞাসা।” ২৪

এই নবজিজ্ঞাসা কিংবা নবচেতনাই হচ্ছে আধুনিকতার মূল কথা।

উনিশ শতকে কিংবা তার পরবর্তী সময়ে বাংলার আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় যে নারীমুক্তির আন্দোলন আমরা দেখতে পাই, তা আসলে উচ্চবর্ণের নারী-আন্দোলন।

পুরুষতান্ত্রিক রক্ষণশীল সমাজ মনে করে, মেয়েরা লেখা-পড়া করলে সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে, মেয়েরা বিধবা কিংবা অসতী হবে। এ সময়েই রাধাকান্তদেব বা অন্যান্য রক্ষণশীল শ্রেণীর কিছু নেতা তাঁদের স্ত্রী-দের অন্দরমহলে লেখাপড়ায় রাধা দিতেন না। তখনই বেথুন সাহেবের প্রচেষ্টায় তৈরি বালিকা বিদ্যালয়ই স্ত্রী-শিক্ষার পরিধিকে প্রসারিত করে। তবে স্ত্রী-শিক্ষার ক্ষেত্রে সমাজে অনেক বাধা বিপত্তিও ছিল। এধরনের বাধার কথা শুনতে পাই ক্ষেত্রবাবুর হবু স্ত্রী অনিলার মুখ থেকে। সে ক্ষেত্রবাবুকে বলে —

“এখন বাড়িতেই পড়ি, গার্লস স্কুলে থার্ড ক্লাস পর্যন্ত পড়েছিলাম,

এখন বড় হয়েছি তাই আর স্কুলে যাই নে।”<sup>২৫</sup>

এই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন সুকুমারী দত্ত ; সেসময়ে বি.এ., বি-টি পাশ করে রক্ষণশীল সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজকে আশ্চর্যান্বিত করেন। অনিলা বড় হয়ে স্কুলে না গেলেও ইংরেজি শিক্ষা-সংস্কৃতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। তার ইংরেজি কথা বলা, উচ্চারণ শুনে ক্ষেত্রবাবু আশ্চর্য হন। নারীর অবস্থান সম্পর্কে শিক্ষাদরদী বেথুন সাহেব বলেন —

“The eagerness of the children to learn, and their docility and quickness correspond fully with what we have seen of Bengali boys, and in the judgement of their intelligent teachers far surpass what is found among European girls of the same age.”<sup>২৬</sup>

কিন্তু নারী আজও পুরুষের গণ্ডিবদ্ধ জাল থেকে মুক্ত হতে পারেনি। তাই নারীবাদী সমালোচক গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিডোক বলেন —

“There is no space from where the sub-altern (sexed)  
subject can speak.” ২৭

তাই সিবসনের মত শিক্ষিতা নারী পুরুষতন্ত্রের কুটচালের কাছে পরাজিত। সিবসনকে তাড়ানোর জন্য আলমের উত্থাপিত প্রস্তাবকে স্কুল কমিটির প্রায় সব সদস্য-ই সমর্থন করেন। ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ ‘অনুবর্তন’ উপন্যাসে একটি স্কুল ও তার আভ্যন্তরীণ টানাপোড়নের চিত্রকল্পে, বিশেষতঃ ঔপনিবেশিক মনন ও আধুনিকতা, শাসক ও শাসিত সম্পর্ক, এদেশের রাজনীতিতেও আপস-ব্যক্তিগত সংলগ্নতার কথা তুলে ধরেছেন।

উপন্যাসের শেষপর্যায়ে রয়েছে, ঔপনিবেশিক সত্তার ঘাত-প্রতিঘাতের পরিসর। ১৯৩৯ এর বিশ্বযুদ্ধ, প্রথমদিকে এই উপন্যাসে ছায়া ফেলতে পারেনি। একদিন যদুবাবু ও ক্ষেত্রবাবু দুজনে চায়ের দোকানে বসে চা-খাওয়ার সময়-ই জানতে পারেন -

“..... দেখুন না পড়ে বাবু - জাপান ইংরেজ আর মার্কিনের বিরুদ্ধে  
যুদ্ধ করছে --” ২৮

যুদ্ধের খবর দুজনকে বিস্মিত ও পুলকিত করে তুলে। এতদিনের একঘেয়েমি জীবনে যেন নতুন এক ধাক্কা লাগে। যুদ্ধের প্রাকমুহুর্তে মৃত্যু ঘটে স্কুলের প্রবীণ শিক্ষক নারায়ণবাবুর। তিনি ছিলেন স্কুলের স্তম্ভস্বরূপ। তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন পরেই সমগ্র ইউরোপে যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে। নিত্য-নতুন যুদ্ধের খবরে মশগুল বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। মিত্রশক্তি বিরোধী জাপান হঠাৎ করে হাওয়াই দ্বীপ আর পার্ল হারবার আক্রমণ করে। জাপানের আক্রমণে ঔপনিবেশিক শক্তি ও শক্তির দ্বারা শাসিত সমাজে এক বড়সড় ধাক্কা লাগে ; বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত সমাজে। এখানে বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক ড. সুমিতা চক্রবর্তীর একটি মন্তব্য উল্লেখনীয় -

“জাপানের বোমার আঘাতেই বিশ্বযুদ্ধের আঁচ পেয়েছিল বাঙালি।”<sup>২৯</sup>

এ সময়ে মিত্রশক্তি বিরোধীরা বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের নানাস্থানে আক্রমণ শাণিত করলেও বিশেষতঃ বাঙালিজাতি ব্রিটিশ শক্তিকে বাহবা দেন। সেসময় ঔপনিবেশিক শক্তির বিরোধিতা করাই ছিল অধিকাংশ বাঙালির কাছে মুখ্য। কিন্তু ব্রিটিশরা এত সহজে হারার পাত্র নয় ; তার প্রমাণ রয়েছে ইতিহাসের পাতায় পাতায়। স্কুলের প্রধান শিক্ষক ক্লার্কওয়েল সাহেব যুদ্ধের খবরকে গুজব বলে উড়িয়ে দেন। ব্রিটিশ শাসিত রাজ্যে বাইরের কোনও শত্রুর ভয় নেই বলে প্রধান শিক্ষকের দৃঢ় বিশ্বাস। যুদ্ধের এই টালমাটাল অবস্থায় যদুবাবু পূর্বের পাওনা বেতনের তাগাদা করায় প্রধান শিক্ষক বলেন —

“না পোষায় আপনার, চলে যাওয়াতে আমি বাধা দেব না - মাই গোট

ইজ্ অল্‌ওয়েজ ওপন।”<sup>৩০</sup>

কিন্তু যদুবাবু ঔপনিবেশিক শক্তির মানসিক অত্যাচার সহ্য করেও তার কাজ চালিয়ে যান। শুধু যদুবাবু কেন, রাখালবাবুর মত ঐতিহ্যপ্রেমী ব্যক্তিও ঔপনিবেশিক শক্তির মোহজালে আবদ্ধ। এই শক্তির সীমাহীন অত্যাচারে অতিষ্ঠ বাংলার মানুষ ঘুরে ফিরে প্রতীচ্যের ওকালতি করে বলেই রাখালবাবু বলেন —

“সিঙ্গাপুর ডিঙিয়ে আসা অত সোজা নয়।”<sup>৩১</sup>

দ্বিবাচনিক সত্তায় পরিপুষ্ট বাঙালি বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ইংরেজ শক্তিকে পিতৃ-পুরুষ বা রক্ষক বলেই ভাবে। তাই বাংলার সামাজিক সংস্কার আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তি রামমোহন রায় বলেন —

“Your dutiful subjects consequently have not viewed the

English as a body of conquerors but rather as deliverers  
and look up to your Majesty not only as a ruler, but also  
as a father and protector.” ৩২

ভারতবর্ষের উপনিবেশ ব্রিটিশ শক্তির অবক্ষয় শুরু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে।

খবরের কাগজে একদিন প্রকাশ পায় —

“..... হংকং অবরুদ্ধ ! ..... চীনসমুদ্রে ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজ  
ধ্বংস !” ৩৩

যুদ্ধজাহাজ ধ্বংসের মধ্যদিয়ে ঔপনিবেশিক শক্তির ক্ষমতা লোপ পেতে আরম্ভ করে। যুদ্ধের  
মধ্যেই ক্লার্কওয়েল সাহেব শিক্ষকদেরকে নিয়ে মিটিং করতে বসেন, ছাত্রশূন্য ক্লাসে প্রমোশনের  
তালিকা পড়েন। সমস্ত কিছুই যেন ঔপনিবেশিক শাসকের মতই প্রধান শিক্ষক পরিচালনা  
করেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত কলকাতা মহানগরী থেকে সাধারণ মানুষ, ছাত্র, শিক্ষক - সবাই যে  
যেদিকে পেরেছে আশ্রয় নেয়। ক্লার্কওয়েল সাহেবও নাগপুরে আশ্রয় নেন। জাপানী বোমার  
ভয়ে গ্রামে আশ্রয়প্রাপ্ত যদুবাবু ভাবেন —

“..... তাহার সঙ্গে মিশিয়া ফাঁদ পাতিয়া জলচর পক্ষী ধরিতেন -

- সরাল, পানকৌড়ি, শামকড়-কতকাল এসব দেখেন নাই ! গানের

তাল করে কাটিয়াছিল, স্মরণ নাই। বর্তমানের সঙ্গে অতীতের

অনতিক্রমণীয় ব্যবধান।” ৩৪

প্রকৃতিই বিভূতিভূষণের উপন্যাসের আধুনিক সত্তা। তাই ঔপনিবেশিক পরিসর থেকে মুক্তির  
জন্য ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ যদুবাবুকে প্রকৃতির কাছে পাঠিয়ে দেন। বিভূতিভূষণের আধুনিকতার

পরিসর সম্বন্ধে পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন —

“ঔপনিবেশিক আবহমণ্ডলে আধুনিকতা বলতে আমরা বুঝেছিলাম  
পাশ্চাত্যের আধুনিকতা। ভারতীয় বাস্তবে যে অন্য আধুনিকতার রূপ  
ও চরিত্রের সন্ধান সম্ভব, তা বিভূতিভূষণের পাঠেই জানা যায়।  
ভারতীয় বাস্তবের ভিন্নতা ও স্বাতন্ত্র্য বিভূতিভূষণের আধুনিকতাকে  
চিহ্নিত করে। প্রকৃতি তাঁর কাছে বিনোদন মাত্র নয়। নতুন মূল্যায়নে  
দেখা যাচ্ছে বিভূতিভূষণ ‘ঔপনিবেশজাত আধুনিকতারই একটি কাউন্টার  
পয়েন্ট’।” ৩৫

ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ ইতিহাসকে কালপ্রবাহের সঙ্গে যুক্ত করে বলেন —

“তারপর কতকাল গ্রামছাড়া। ১৯০০ সালের পর আর গ্রামে এভাবে  
বাস করা হয় নাই।” ৩৬

প্রকৃতির কথা ভাবতে ভাবতে যদুবাবু ইহলোক ত্যাগ করেন। প্রকৃতিই তাঁকে ঔপনিবেশিক  
পরিসর থেকে মুক্তির স্বাদ এনে দেয়। যুদ্ধের প্রাকমুহূর্তে মৃত্যু ঘটে স্কুলের স্তম্ভস্বরূপ  
নারায়ণবাবুর। যুদ্ধের সময়ে স্কুল শিক্ষক ক্ষেত্রবাবু পুরনো চায়ের দোকানে বসে বসে ভাবেন -

“এখানে বসিয়া দুঃখের মধ্যেও কত আনন্দ, কত মজলিস করা গিয়াছে।

গত দশ-বারো, চৌদ্দ বছর। আজ কেউ নাই কোন দিকে। সব ছত্রভঙ্গ।” ৩৭

দুর্দণ্ডপ্রতাপ ক্লার্কওয়েল সাহেবের মত শিক্ষাব্রতীর জীবনে নেমে আসে চরম দুরবস্থা। আধুনিক  
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেকেই শঙ্কিত। যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে হাতে গোনা ছাত্র নিয়ে  
ক্লাস আরম্ভ হয়। আসেননি সদ্যপরলোকগত যদুবাবু, অন্যস্কুলে সুযোগ পেয়ে চলে যায়

জ্যোতির্বিদ্যাবাবু ও শ্রীশবাবু। ছাত্র না থাকায় স্কুলের ভবিষ্যৎ যেমন অন্ধকার তেমনি বুদ্ধ  
ঔপনিবেশিক শাসনের ভিত্তিকেও নাড়িয়ে দেয়। ফলে ঔপনিবেশিক মনন ও আধুনিক চেতনার  
সেলবন্ধনও থেকে যায় অমীমাংসিত।

### উল্লেখপঞ্জি: —

- ১। স্বপন বসু - বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস, ২০০৩, পুস্তক বিপণি,  
পৃঃ ১৭৯
- ২। স্বপন বসু ও ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী (সম্পাদিত) - 'উনিশ শতকে বাঙালি জীবন ও  
সংস্কৃতি' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, ২০০৩, পুস্তক বিপণি,  
পৃঃ ৫২
- ৩। ড. বদরুল হাসান - 'উনিশ শতক : নবজাগরণ ও বাংলা উপন্যাস' গ্রন্থ  
থেকে উদ্ধৃত, ১৯৯০, জগৎমাতা পাবলিশার্স, পৃঃ ৪১
- ৪। তদেব— পৃঃ ৪২
- ৫। তদেব - পৃঃ ৪২
- ৬। ভূদেব চৌধুরী - বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (দ্বিতীয় পর্যায়), ১৯৬৪,  
বুকল্যাণ্ড প্রাঃ লিঃ, পৃঃ ২৬
- ৭। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় - 'বিভূতিরচনাবলী' জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ (৭মখণ্ড),  
১৪০৪, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃলিঃ, পৃঃ ৩১
- ৮। ভূদেব চৌধুরী - পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৮৩

- ৯। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় - পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৩
- ১০। তদেব - পৃঃ ৫
- ১১। তদেব - পৃঃ ৫
- ১২। তদেব - পৃঃ ৯০
- ১৩। তদেব - পৃঃ ৯
- ১৪। তদেব - পৃঃ ২৬
- ১৫। তদেব - পৃঃ ৫৪
- ১৬। তদেব - পৃঃ ৫৪
- ১৭। স্বপনবসু ও ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী (সম্পাদিত) - 'উনিশ শতকে বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, ২০০৩, পুস্তক বিপণি, পৃঃ ২৪৫
- ১৮। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় - পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৭৯
- ১৯। তদেব - পৃঃ ৯১
- ২০। তদেব - পৃঃ ৩২
- ২১। সন্তোষনাথ রায় - বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা, ২০০০, দে'জ পাবলিশিং, পৃঃ ৩৬
- ২২। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় - পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৫৯
- ২৩। অমলেশ ত্রিপাঠী - 'ভারতের মুক্তিসংগ্রামে চরমপন্থী পর্ব' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, ১৯৯১, পৃঃ ৯৭
- ২৪। স্বপনবসু - বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস, ২০০৩, পুস্তক বিপণি, পৃঃ ১০৮



- ২৫। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় - পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৭৩
- ২৬। স্বপনবসু - পূর্বোক্ত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, পৃঃ ১৭৩
- ২৭। তপোধীর ভট্টাচার্য - 'প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, ১৯৯৭, অমৃতলোক সাহিত্য, পরিষদ পৃঃ ১৩৭
- ২৮। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় - পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১০৬
- ২৯। সুমিতা চক্রবর্তী - 'দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ : বাঙালির জীবন, মনন ও সাহিত্য' (প্রবন্ধ); স্বপনবসু ও হর্ষ দত্ত (সম্পাদিত) - বিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত, ২০০০, পুস্তক বিপণি, পৃঃ ১০৭
- ৩০। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় - পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১১৩
- ৩১। তদেব - পৃঃ ১১৭
- ৩২। স্বপন বসু - বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস, ২০০৩, পুস্তক বিপণি, পৃঃ ১৮৪
- ৩৩। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় - পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১১৮
- ৩৪। তদেব - পৃঃ ১৩৮
- ৩৫। শুভঙ্কর ঘোষ - বিভূতিভূষণের আধুনিকতা, 'আরণ্যক' এর আধুনিকতা (প্রবন্ধ), দেবরত চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদনা) - 'বিংশ শতাব্দীর সমাজ বিবর্তন : বাংলা উপন্যাস' গ্রন্থ থেকে

উদ্ধৃত, ২০০২, দে'জ পাবলিশিং, পৃঃ ১০০

৩৬। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় - পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১৩৮

৩৭। তদেব — পৃঃ ১৩৩

## অশনি সংকেত

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে বাংলার সমাজজীবনে মনুষ্যসৃষ্ট দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই দুর্ভিক্ষ বা মন্বন্তরের সময়কাল হল ১৩৫০ বঙ্গাব্দ। এই সময়কাল ‘পঞ্চাশের মন্বন্তর’ হিসেবে বাংলাদেশ তথা সমগ্র ভারতবর্ষের মানুষের কাছে পরিচিত। এই দুর্ভিক্ষের কারণ সম্পর্কে নোবেলজয়ী বিশ্ববিখ্যাত অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন লিখেছেন —

“The 1943 famine can indeed be described as a ‘boom famine’ related to powerful inflationary pressures initiated by public expenditure expansion.”<sup>১</sup>

সমগ্র বাংলা ব্যাপী দুর্ভিক্ষের করাল খাবা বসলেও তখন শহরের তুলনায় গ্রাম-বাংলাকে বেশি গ্রাস করেছিল। এ সম্পর্কেও বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন ‘The Great Bengal Famine’ শীর্ষক নিবন্ধে লিখেছেন —

“The Bengal famine was essentially a rural Phenomenon. Urban areas, especially Calcutta, substantially insulated from rising food prices by subsidized distribution schemes, saw it mainly in the form of an influx of rural destitutes.”<sup>২</sup>

গ্রাম-বাংলার এই মন্বন্তর ও মন্বন্তর সৃষ্ট করণ ছবি ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ অত্যন্ত সুচারুভাবে ‘অশনি সংকেত’ উপন্যাসে উপস্থাপিত করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বা যুদ্ধপরবর্তী সময়ে

শুধুমাত্র দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়নি ; দেখা দেয় সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী এক ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন। যে আন্দোলনকে আমরা ‘ভারত ছাড়া আন্দোলন’ হিসেবে জানি। তবে এই সময়ে ঔপনিবেশিক শক্তি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিসত্তাকে পরাস্ত করে নিজেকে শক্ত মাটির উপর দাঁড় করাতে সক্ষম হয়। ঔপনিবেশিক পরিসর শুধুমাত্র অর্থনীতি ও সমাজনীতিকেই প্রভাবিত করে, তা নয় ; প্রভাব ফেলে সস্তার অতল গভীরে; চৈতন্যের অন্তঃস্থলে। এই ঔপনিবেশিক থাবার প্রভাবমুক্ত প্রকৃতির আবহমান স্পন্দন। এই ‘স্পন্দন’ প্রান্তিকায়িত মানুষের নিঃশ্বাস বায়ু।

‘অশনি সংকেত’ উপন্যাসের জনসমাজ প্রাক্-ঔপনিবেশিক জগতের জনসমাজ। এই জনসমাজ যুদ্ধজনিত দুর্ভিক্ষে সর্বহারা হয়ে ধ্বংসমুখে পতিত। ইছামতীর চরে নতুন গড়ে ওঠা গ্রামে প্রাক্-ঔপনিবেশিক ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কারপূর্ণ যে সমাজ ব্যবস্থা প্রচলিত তার-ই বাস্তব ছবি এই উপন্যাসে উপস্থিত। নদী তীরবর্তী এই গ্রামটি বেশিদিনের পুরনো নয়। প্রাক্-ঔপনিবেশিক যুগে মানুষ ছিল গ্রামমুখী। তাই উপন্যাসের নায়ক গঙ্গাচরণের মত তথাকথিত শিক্ষিত ব্রাহ্মণ দু-মুঠো অন্নের সন্ধানে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যাযাবরের মত জীবন নির্বাহ করে। শেষপর্যন্ত প্রান্তিকায়িত কপালী সমাজের মানুষদের অনুরোধেই যাযাবর জীবন-যাপনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে নতুন গাঁয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করে। তবে এখানে গঙ্গাচরণের নিজস্বার্থের কথাও লুকিয়ে রয়েছে। গঙ্গাচরণ ও তার পরিবার কপালী-গোয়াল অধ্যুষিত গাঁয়ের একমাত্র ব্রাহ্মণ পরিবার। তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণরাই ছিল সমাজের দণ্ডমুণ্ডকর্তা। তারা বিশেষতঃ গ্রাম-বাংলার অশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের উপর তাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করত। এই ক্ষমতায় বলীয়ান ব্রাহ্মণ গঙ্গাচরণ পেশায় ও ব্যবসায় প্রান্তিকায়িত মানুষের উপর তার আধিপত্য বজায় রাখে। এখানে সমালোচক পাঠপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য

“এই ব্রাহ্মণদের মর্যাদার সঙ্গে যুক্ত তার শিক্ষাদান, তার চিকিৎসা, তার পূজো-আচ্ছাদ্য পৌরোহিত্য। গঙ্গাচরণের জীবিকার উৎস কোন সরকারী ব্যবস্থা নয় - ঐ জনসমাজ তার আগের ও বাঁচবার আশ্রয়।”<sup>৩</sup>

নতুন গাঁয়ে পাঠশালা খুলে গঙ্গাচরণ সেখানকার মানুষের সম্ভ্রম আদায় করে নেন। তিনি

ভাল করে জানেন যেখানে অন্য ব্রাহ্মণ নেই, সেই গ্রামে জীবন নির্বাহ করতে তার সুবিধেই হবে।

তাই স্ত্রী অনঙ্গ বৌ-কে বলেন —

“এ দিগরে লেখাপড়া জানা লোক কোথায় পাবে ওরা ? সকলের

এখন চেষ্টা দাঁড়িয়েচে যাতে আমি থাকি।”<sup>৪</sup>

শুধুমাত্র শিক্ষকতার মাধ্যমে আশা-আকাঙ্ক্ষা মেটানো সম্ভব নয় জেনেই গঙ্গাচরণ অন্যান্য পেশাকেও গ্রহণ করে গ্রামের অশিক্ষিত লোকদেরকে অষ্টোপাসে বেঁধে নিতে চায়। স্ত্রী অনঙ্গবৌ-কে বলে —

“রও, সবদিক থেকে বেঁধে ফেলতে হবে ব্যাটারে। ... মূলো বেগুন

বলো - কোনো জিনিষের অভাব হবে না।”<sup>৫</sup>

অনঙ্গবৌ-য়ের মানসিকতায়ও রয়েছে ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কারাচ্ছন্ন বর্ণবাদ। তাই তিনি স্বামী গঙ্গাচরণকে বলেন —

“কাপালীদের পুরুতগিরি করবে ? শুদুর-যাজক বামুন হোলে লোকে

বলবে কি ?”<sup>৬</sup>

কিন্তু এই জনসমাজ-ই তার আগের প্রধান উৎস ও বাঁচার উপকরণ বলেই স্বামীর কথার

বিরুদ্ধে যাননি। প্রকৃতপক্ষে, পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীর আলাদা কোনও ভাষা নেই। পুরুষের ভাষাই তোতাপাখির মত নারী বলে যায়। পুরুষ বেশিরভাগ সময়ই নারীর উপর আধিপত্য রাখতে চায়। পুরুষতন্ত্রের শেকলে বাঁধা নারীর জগৎ, ভাষা, চেতনা সবকিছুই সাধারণতঃ একবাচনিক। নারী যেন শুধু পুরুষ সমাজের কাছে উদ্দেশ্যসাধনের যন্ত্র। প্রকৃতপক্ষে নারীর সমস্ত কিছুই পুরুষের উপর নির্ভরশীল বলে স্বীকার করতেই হয়। আর নারীও তার পুরুষপ্রভুর কাছ থেকে পাওয়া চিন্তা-চেতনায় নিজেকে জারিত করে আরও আকর্ষিত করে তুলে। সমাজে, সাহিত্যে এমনকী প্রত্যেকটি বিষয়ে পুরুষ হল নারীর বিধাতা স্বরূপ। এখানে বিখ্যাত সমালোচক ক্যারোলিন বার্কে'র একটি মন্তব্য আমরা তুলে ধরতে পারি —

“ .... the very forms of the dominant mode of discourse show the mark of the dominant masculine ideology.”<sup>৭</sup>

প্রান্তিকায়িত জনসমাজের উপর ক্ষমতা প্রয়োগের প্রমাণ পাওয়া যায় ছাত্র কিংবা পশ্চিমপাড়ার মানুষের সঙ্গে গঙ্গাচরণের বাক-বিনিময়ের মধ্য দিয়ে। গ্রামের মোড়ল বিশ্বাস মশাইয়ের সঙ্গে একমাত্র ‘আপনি’ সম্ভ্রমসূচক শব্দ গঙ্গাচরণ ব্যবহার করলেও অন্যান্যদের সঙ্গে তুচ্ছার্থসূচক ‘তুমি’, ‘তুই’, ‘ও’ - এসব শব্দ ব্যবহার করেন। প্রান্তিকায়িত শ্রেণীর রামলালকে আদেশ করে গঙ্গাচরণবাবু বলেন —

“ওহে রামলাল, ভালো কথা, এবারে নতুন সর্ষে হয়েছে ক্ষেতে ?

দু'কাঠা পাঠিয়ে দিও তো।”<sup>৮</sup>

তৎকালীন সময়ে মানুষের সামাজিক অবস্থান নির্ভর করত আর্থিক স্বনির্ভরতার উপর। বিশ্বাস মশাই ধনী এবং গাঁয়ের মোড়ল হলেও ব্রাহ্মণদের প্রতি তার অগাধ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। এটাই ছিল

বাঙালির সামাজিক রীতি। এই রীতিকে স্বীকার করেই বিশ্বাস মশাই বলেন —

“আপনারা আমাদের মাথার মণি - আমি আপনাকে সব বন্দোবস্ত  
করে দিচ্ছি।” \*

বিশ্বাস মশাইয়ের কাছে আশ্বাসবাণী পেয়ে গঙ্গাচরণ আনন্দে আত্মহারা হয়ে মনে মনে ভাবেন

“..... যদি বিশ্বাস মশায়কে বলকয়ে একখানা লাঙল করা যায়  
তবে ভাত-কাপড়ের ভাবনা দূর হবে সংসারের।” ১০

ব্রাহ্মণ হয়ে শূদ্রের কাজে বিশেষতঃ চাষবাসে জড়িয়ে পড়াই আধুনিক মানসিকতার-ই পরিচায়ক।

গঙ্গাচরণ শুধুমাত্র আদেশমূলক বাক্য প্রয়োগ করে আধিপত্য বজায় রাখে না ; বাক-  
নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেও বজায় রাখে। ম্যালেরিয়া রোগী রামলাল যখন রোগের বর্ণনা দিচ্ছে তখন  
গঙ্গাচরণ মধ্যে মধ্যে তাকে কথা বন্ধ করতে বাধ্য করে অন্য কথায় নিয়ে যান। ছাত্রেরা তাকে  
‘গুরুমশাই’ বলে ডাকলে তাদেরকে ধমক দিয়ে ‘সার’ ডাকতে বলেন। ‘সার’ শব্দটি ব্রিটিশ  
ঔপনিবেশিক শাসকবর্গের মাতৃভাষা। কিন্তু গঙ্গাচরণের ঔপনিবেশিক শিক্ষা-সংস্কৃতির সঙ্গে  
বিশেষ কোনও পরিচয় নেই। ভারতীয় ভাষা-সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত। কিন্তু ইংরেজি শিক্ষা-  
সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ থাকা, পরিচয় থাকার আকাঙ্ক্ষাতেই রয়েছে ঔপনিবেশিক সত্তার ও  
আধুনিক হবার বিশেষ আকাঙ্ক্ষা। এই ইংরেজি শিক্ষা-ই আমাদের ঐতিহ্যলালিত সত্তাকে  
বিনির্মাণ করে। তাই গঙ্গাচরণ ভারতীয় ঐতিহ্যগত সংস্কারের প্রতি পরিচিত থেকেও এগুলির  
প্রতি গভীর আস্থা-বিশ্বাস নেই। বিশ্বাস না থাকার কারণ অন্য আরেকটি জায়গায়ও লুকিয়েছিল।  
সেই কারণটি হল গঙ্গাচরণের মত এসব তথাকথিত পণ্ডিতদের শাস্ত্র সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান ছিল

না। এ সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছেন -

“..... দেশের অপরাপর কোন কোন স্থানে সংস্কৃতের চর্চা কিছু ছিল বটে, কিন্তু তাহাও কেবল ব্যাকরণ, স্মৃতি ও ন্যায়ের শিক্ষাতে পর্যাবসিত হইত। যে জ্ঞানের দ্বারা হৃদয় সমুন্নত হয়, এমন কোন জ্ঞান দেশে বিদ্যমান ছিল না। এমন কি বেদ, বেদান্ত, গীতা, পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতি জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ এইসকল পণ্ডিতগণের অজ্ঞাত ছিল।”<sup>১১</sup>

গঙ্গাচরণের মত ব্যক্তি ‘গুরুট্রেনিং’ পাশ না করেও স্কুলের প্রধান শিক্ষক। তার মত পণ্ডিতের কাছে শিক্ষাগ্রহণ করে ছাত্রেরা কতটুকু লাভবান হবে-তা সন্দেহের বিষয় হলেও গ্রামীণ অশিক্ষিত মানুষেরা তাদের সন্তানদের নির্দিষ্টায় গঙ্গাচরণের কাছে শিক্ষাগ্রহণের জন্য পাঠায়। আধুনিক জগতে শিক্ষাই হল উপনিবেশিক পীড়নের কিংবা উপনিবেশ স্থাপনের প্রধান হাতিয়ার। গঙ্গাচরণ শাস্ত্রগ্রন্থ দেখে দেখে, ভুল উচ্চারণ করে দেব-দেবীর মন্ত্র পাঠ করে। তার শাস্ত্রযজ্ঞে বিশ্বাস মশাইয়ের দীর্ঘদিনের অসুস্থ নাতি ‘কাকতলীয় ভাবে সুস্থ’ হয়ে ওঠে, ওলাওঠা রোগে আক্রান্ত কামদেবপুর গ্রামের গাঁবন্ধ করে। সে অত্যন্ত চতুর, স্ত্রী অনঙ্গবৌয়ের ও সংসারের সুবিধামত ফর্দ তৈরি করে, স্কুলের স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বই দেখে মহামারীর সময় কি কি সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় - তা জেনে, অজ্ঞ, অশিক্ষিত গ্রামের মানুষদেরকে উপদেশ দেয় এবং চিকিৎসা করেন।

পাড়াগাঁয়ের অজ্ঞ, অশিক্ষিত মানুষেরা গঙ্গাচরণকে ‘মাথার মনি’ ‘পণ্ডিত লোক,’ ‘বাবাঠাকুর’, ‘পেরনাম হই’ - এসব শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করে একদিকে যেমন নিজেদেরকে তুচ্ছ পরিসরে এবং গঙ্গাচরণ তথা ব্রাহ্মণ সমাজকে উচ্চপরিসরে স্থান দেয়। নিজেদেরকে তারা



‘অজমুখ্য’, ‘চাষীবাসী’ - এসব তুচ্ছার্থক শব্দ ব্যবহার করে নীচতার পরিচয় দেয়। এসব তথাকথিত ব্রাহ্মণ শিক্ষক সম্প্রদায়ের জন্য বাংলায় তথা ভারতবর্ষের জ্ঞান-চিন্তার জগতে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়। এসব ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা ছিলেন গোঁড়া ধর্মাবলম্বী। তাদের সম্পর্কে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর লিখেছেন -

“They believe that their shastras have all emanated from the omniscient Rishis and, therefore, they cannot but be infallible. .... that when they hear of a scientific truth, they triumph and the superstition of a regard for their own shastras is redoubled.”<sup>১২</sup>

এই মানসিকতার প্রতিফলন ঘটে সরকারি শিক্ষক দুর্গাপদবাবুর মধ্যে। তিনি গঙ্গাচরণবাবুকে বলেন -

“সঙ্গী নেই, দুটো কথা কইবার মানুষ নেই - ব্রাহ্মণ যা আছে, সব অশিক্ষিত, চাষবাসই নিয়ে আছে। সংসার অনিত্য, আমি মশাই আবার একটু ধন্মকথা, একটু সৎ আলোচনা বড্ড পছন্দ করি।”<sup>১৩</sup>

প্রাক-ঔপনিবেশিক ও প্রাক-আধুনিক যুগে ব্রাহ্মণরাই ছিল সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। এমনকী আমাদের ঐতিহ্যলালিত সমাজে এই রীতি আজও কমবেশি মানুষের মনে লালিত। তবে ঔপনিবেশিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে বর্ণবাদী রীতি-নীতির বিনির্মাণ ঘটে। এর ফলেই তথাকথিত বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণরাও কেউ কেউ শূদ্রের মত চাষবাস আরম্ভ করে। ব্রাহ্মণদের রক্ষণশীল মানসিকতার এই পরিবর্তনের মূলেও বিশ্বযুদ্ধ ও মন্বন্তর দায়ী। এখানে বিশিষ্ট

সাহিত্য সমালোচক সুমিতা চক্রবর্তীর একটি মন্তব্য উল্লেখনীয় -

“বাঙালির মনে যুদ্ধ ও মন্বন্তর বিচ্ছিন্ন হয়ে দেখা দেয়নি।” ১৪

এছাড়াও এই যুদ্ধের পরিণাম হয়েছিল খুবই ভয়াবহ। যুদ্ধের পরিণাম সম্বন্ধে স্ত্রী অনঙ্গবৌ-কে গঙ্গাচরণ বলে -

“আমাদের রাজার সঙ্গে জার্মানি আর জাপানের - সব জিনিষ নাকি

আক্রমণ হয়ে উঠবে।” ১৫

শুধু জিনিষপত্র নয়, এসময়ে বাংলায় দেখা দেয় নানা ধরনের মহামারী রোগ। এসব রোগের প্রাদুর্ভাব মৃত্যুর আর এক বার্তা ঘোষণা করতে থাকে। গঙ্গাচরণের মত সুবিধাবাদী শিক্ষিত ব্যক্তি এই মহামারী রোগের ভয় দেখিয়ে নিজের অর্থ ভাণ্ডারকে বাড়িয়ে নিতে থাকে।

ঔপনিবেশিক শক্তির সঙ্গে বিভিন্ন দেশের সংঘবদ্ধ যুদ্ধে ঔপনিবেশিক শক্তির-ই জয় হয় এবং পরিবর্তন ঘটে মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা। তাই লক্ষণীয় যে সমাজে ব্রাহ্মণদের কোনদিন কোনকিছুর অভাব ঘটেনি ; তারাই এখন ধারে কিংবা ভিক্ষাবৃত্তির মাধ্যমেও চাল পায় না। অনঙ্গবৌ মানুষের দরজায় দরজায় চাল ধার চেয়ে বিফল হয়। শুধু বিফল নয় ; কাপালীদের ঘরে ধান ভেনে অনঙ্গবৌকে সংসার প্রতিপালন করতে হয়েছে। ব্রাহ্মণ্যপন্যায় শূদ্রের ঘরে ব্রাহ্মণদের কাজ করা নরকে বসবাসের সমপর্যায়।

তবে মনে রাখা প্রয়োজন কর্মমুখীনতাও আধুনিকতার একটি লক্ষণ। অনঙ্গবৌ পেটের তাগিদেই হোক আর অন্য কারণেই হোক, সে কর্মমুখী নারী হিসেবে উপন্যাসে উপস্থিত। অর্থাৎ সমকালীন পরিবেশ মানুষের মানসিকতাকে পরিবর্তন করে। এই উপন্যাসে অবশ্য মানসিকতারই শুধু পরিবর্তন করেনি, লক্ষ করবার বিষয় দুর্ভিক্ষের সময়ে অসাধু ব্যবসায়ীরা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি

করে এসময় জিনিষপত্রের দাম হাতের নাগালের বাইরে পৌঁছে দেন। ফলে, হাজার হাজার মানুষ না খেয়ে, অনাহারে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। কালিচরণ ঘোষ 'Famines in Bengal' বইতে লিখেছেন —

“There was no complete disappearance of food-stuffs from the market. ... The poor died while the rich and the upper middle class escaped with injuries proportionate to the length of their respective purses. It is thus clear that it was the high cost of food-stuffs that killed more men than did its actual non availability.” ১৬

মন্বন্তর-ই বাংলার জনসমাজে নিয়ে আসে এক ভয়াবহ পরিবর্তন; যার ফলে সমাজের সার্বিক মূল্যবোধ হারিয়ে যায়। মুচিপাড়ার জনসাধারণ দুর্ভিক্ষের ভয়ে গ্রাম ছাড়তে আরম্ভ করে। মতির বয়ানে আমরা জানতে পারি —

“বলেন কি দিদি-ঠাকরুণ, অত বড় মুচিপাড়ার মধ্যে লোক নেই। সব পালিয়েছে।” ১৭

হাজার হাজার মানুষের জীবনদীপ অনাহারে নিভে যায়।

মন্বন্তর মানুষকে এক অবিশ্বাস্যস্তরে পর্যবসিত করে। যে গঙ্গাচরণকে কাপালী সমাজ দেবতার মত সম্মান করত, তাকেও একদিন চাল চুরির অপবাদে অপমানিত হতে হয়। দিন-দুপুরে পাঁচুকুণ্ডুর দোকানের চাল লুঠ-পাট হয়। দুর্গাপণ্ডিত শিক্ষকতার মাইনে দিয়ে পরিবার ভরণ-পোষণ করতে না পেরে কখনও কখনও গঙ্গাচরণের আশ্রয় নেয়। কষ্টের সংসারের

মধ্যেও স্ত্রী অনঙ্গবৌ আতিথেয়তা বজায় রাখে। এই মন্বন্তরের দিনে বিশ্বাস মশাইয়ের মত মানুষ পাটে গেলেও কিছু নারী তাদের ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরে রাখে। অনঙ্গবৌয়ের আতিথেয়তা কিংবা নিবারণ ঘোষের মেয়ের ব্রাহ্মণ সমাজের উপর অগাধ শ্রদ্ধা দুর্ভিক্ষের দিনেও অক্ষত থাকে। তাই নিবারণ ঘোষের মেয়ে চুপি চুপি গঙ্গাচরণকে চাল এনে দিয়ে বলে -

“যদি কখনো এমন হয়, না খেয়ে থাকতি হয়, তবে আমার কাছে

আসবেন, আমি যা পারি দেবো। — দেবতা ব্রাহ্মণের সেবাও যদি না

করলাম, তবে জীবনে করলাম কি বলুন !” ১৮

আমাদের সমাজ ব্যবস্থা ইংরেজি শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রভাবে কিছুটা পরিবর্তন হলেও নারীসমাজ এখনও প্রায় অন্ধকারাচ্ছন্ন। নারী এখনও পুরুষতন্ত্রের গণ্ডির বাইরে যেতে পারেনি। তাই নারীর জগৎ একরৈখিক, ঐতিহ্যানুশ্রিত, সংস্কারাচ্ছন্ন। বিশ্বযুদ্ধ কিংবা মন্বন্তর সমাজ ব্যবস্থাকে পাটে দিলেও নারীর মনকে পরিবর্তন করতে পারেনি। তবে এরজন্য দায়ী আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা। এখানে এলেন শোআলটের একটি মন্তব্য উল্লেখনীয় -

“..... double voiced discourse that always embodies the social, literary and cultural heritages of the muted and the dominant.” ১৯

অন্তঃবাসী নারী সময়বিশেষে তার নারীত্বের প্রকাশ করতে দ্বিধাবোধ করেনি ; তেমনি প্রয়োজনে নারীত্বকে বিসর্জনও দেয়। চারদিকে মানুষ যখন অনাহারে, ক্ষুধার জ্বালায় প্রাণত্যাগ করছে তখন কাপালীবৌ নিজ সতীত্বকে পরিত্যাগ করে শুধুমাত্র বাঁচার তাগিদে। সে সতীত্বকে বিসর্জন দিলেও নিজ অস্তিত্বকে বিসর্জন দেয়নি। তাই ইটখোলায় বদু পোড়ার সঙ্গে অবৈধ

সম্পর্ক গড়ে তুললেও প্রয়োজনবোধে তার দেওয়া চাল নালায় ফেলে দেওয়ার হুমকি দেয়।

কাপালী বৌ বলে —

“তোমাকে উপকার করতে কেউ বলচে না, যাও বলচি, নইলে এ চাল

সব ওই খানায় ফেলে দেবো কিন্তু।” ২০

পুরুষতন্ত্রের চাপিয়ে দেওয়া শাসনকে অমান্য করে কাপালীবৌ একজন মানুষ হিসেবে বাঁচতে চায়। সবাই যখন বাঁচার তাগিদে কাপালীপাড়া ছেড়ে শহরের দিকে পালাচ্ছে তখন অনঙ্গবৌয়ের অনুরোধেই কাপালীবৌ যদুপোড়ার সঙ্গে শহরে যাওয়া থেকে বিরত থাকে। গ্রাম ছেড়ে শহরের প্রতি আকর্ষণ আসলে মানুষের ঔপনিবেশিক শক্তিসত্তার প্রতি এক বিশেষ আকর্ষণ। এই ‘পালানো’ আসলে ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে, জীবন যাপনের প্রাণবিন্দু গ্রাম সমাজের মূল অস্তিত্বকে বিধ্বস্ত করে ভেসে যাওয়া। শহরের লঙ্গরখানায় সরকারের তরফ থেকে খাবার সামগ্রী বিতরণ করা হচ্ছে জেনেই সবাই প্রায় এখন শহরমুখী। এই শহর এবং শহরমুখীনতাই হচ্ছে ঔপনিবেশিক সমাজের অবভাস হিসেবে পরিচিত আধুনিকতার দিকে এগিয়ে যাওয়া।

ফলস্বরূপ অনেকেই শহরের বাস্তবমুখী জীবনযাপনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারেনি। গঙ্গাচরণ ব্রাহ্মণত্বের দোহাই দিয়ে সরকারি অফিস থেকে কিছু খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ করে। তবে, সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় ব্রাহ্মণের স্থান সবার উপরে থাকলেও যুদ্ধবিধ্বস্ত সময়কালে সাপ্লাই অফিসে গঙ্গাচরণ বিশেষ তেমন সুবিধে করতে পারেনি। আসলে ঔপনিবেশিক শাসন আমাদের ঐতিহ্যপালিত সমাজ ব্যবস্থার কাঠামোর বিনির্মাণ করে। এই বিনির্মাণের সুবাদে কাপালীবৌ অসামাজিক কাজে জড়িত থাকাসত্ত্বেও তার মনে কোনও সংশয় বা দ্বন্দ্ব নেই। তার স্বামী শহরে বেগুন বিক্রি করতে গিয়ে আর ঘরে ফিরে আসেনি। স্বামী হারা হয়ে বাঁচার

তাগিদে কাপালীবৌ অনৈতিক কাজে লিপ্ত হয়। মন্বন্তরের সময়ে কত স্বামী, স্ত্রীহারা হয়। কত নারী বাঁচার তাগিদে বিপথগামী হয়। এখানে সমালোচক সুমিতা চক্রবর্তীর একটি মন্তব্য উল্লেখনীয় —

“..... দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে মধ্যবিত্ত পরিবারের বাঙালি মেয়েরাও এই কাজ কিছু কিছু করেছেন। টাকার প্রয়োজনে অনেকটাই, কেউ কেউ দুর্দম স্বভাববশত। যে-সব কারণে মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজে নারী-কেন্দ্রিক বিধি নিষেধ এবং নৈতিকতার অনুশাসন এই সময়ে ভেঙে পড়তে থাকে - তার অন্যতম ছিল টাকার প্রয়োজনে মেয়েদের এইভাবে বাইরে বেরিয়ে পড়া।”<sup>২১</sup>

নারী শুধু পুরুষের ভোগ্য পণ্য নয় ; তার নিজস্ব সত্তাও রয়েছে। নিজস্ব সত্তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করলেও শেষপর্যন্ত পুরুষতন্ত্রের কাছে হার মানতে বাধ্য হয়। তাই বিশিষ্ট নারীবাদী সমালোচক সিমেন দ্য বোভেরা বলেন —

“One is not born, but rather becomes, a woman, ... it is civilization as a whole that produces this creature, intermediate between male and eunuch, which is described as feminine. one the intervention of some one else can establish an individual as an other.”<sup>২২</sup>

তাই কাপালীবৌ পিতৃতন্ত্রের শাসনপদ্ধতিকে বুড়ো আঙুল দেখালেও পুরোপুরি সেই জাল থেকে মুক্ত হতে পারেনি। তাই সে অনঙ্গবৌকে বলে —

“..... আমরা নরকে পচে মরবো ঠিকই, আমাদের কথা বাদ দাও তুমি।

তুমি সতীলক্ষ্মী, পায়ের ধুলো দিও-নরকে গিয়েও যাতে দুটো খেতি

পাই —”।<sup>২০</sup>

মন্বন্তর বাংলার সমাজে দিনদিন সংকট বাড়তেই থাকে ; চল্লিশ টাকা মণে চাল পাওয়া

অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। মন্বন্তরকালীন সময়ে বাংলার চালের দাম কিভাবে হু-হু করে বেড়েছে -

তার তথ্য অমর্ত্য সেনের ‘Poverty and Famines’ গ্রন্থে আমরা পাই -

“The wholesale price of rice, which had been between

Rs 13 and Rs 14 per ‘maund’ on 11 December 1942,

rose to Rs 21 by March 1943 and to above Rs 30 by 21

May ; by 20 August it had risen to Rs 37 --- Such as in

October that rice was being sold in Chittagong at Rs 80

per maund, and in Dacca at Rs 105 per maund.”<sup>২১</sup>

অনঙ্গবৌ শরীরের সব অলংকার বিক্রি করে চাল যোগাড় করার চেষ্টা করে। ধান চাল হঠাৎ যেন

কপূরের মত দেশ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। জীর্ণ-শীর্ণ স্ত্রীলোক, ছেলে-মেয়ের ‘ফ্যান খাইতাম,

ফ্যান খাইতাম’ শব্দ শুনে অনঙ্গবৌ ভয় পায়। ‘খাইতাম’ শব্দের মধ্যে অতীতের কথা স্পষ্ট

কিন্তু বর্তমানে এই ‘খাইতাম’ অতীত শব্দের বিশেষ তাৎপর্যও রয়েছে। আগে মানুষ ‘ভাত’,

‘ফ্যান’ খেতে পেয়েছে এখন আর পায় না। এই না পাওয়ার মধ্যে গঙ্গাচরণ ও অনঙ্গবৌ মৃত্যুর

হাতছানি দেখতে পায়। যে গঙ্গাচরণ আগে ছল-চাতুরী করে খাবার সংগ্রহ করত ; সেই

গঙ্গাচরণ এখন আর আগের মত সুবিধে আদায় করতে পারে না। সে নিজেই বলে -

“গঙ্গাচরণ প্রাণপণে চেপ্টা করে খাবারের এটা-সেটা যোগাড় করতে,  
কিন্তু পেরে ওঠে না। ... ব্রাহ্মণত্বের দোহাই দিয়ে অনেক করে ঘিটুকু  
যোগাড় করা।” ২৫

ভাতছালায় দীর্ঘদিন খাবার না পেয়ে মতি অনঙ্গবৌয়ের কাছে আসে। দুর্গাপণ্ডিত কামদেবপুরের  
চাকুরি হারিয়ে গঙ্গাচরণের শরণাপন্ন হয়। সে গঙ্গাচরণকে বলে –

“এই মন্বন্তর, তার ওপর চাকরিটা গেল।” ২৬

মন্বন্তরের জন্য পরোক্ষভাবে হলেও ঔপনিবেশিক শক্তি দায়ী। এই শক্তির মোহে আকৃষ্ট হয়েই  
অনেকে তার পুরানো ঐতিহ্য থেকে বেরিয়ে আসে বা সংস্কারকে বিনির্মাণ করে। এর ফলে গ্রাম  
জীবনে ভাঙন সৃষ্টি হয়, মানুষ হয়ে ওঠে নগরমুখী। তাই লেখক জানিয়েছেন –

“সেখানে সাহেব-সুবোদের জায়গা। বাঙালীরা সেখানে গেলে পাগল  
করে দেয়, ওষুধ খাইয়ে।” ২৭

আসলে ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ মন্বন্তরের অভিঘাত সমাজের স্তর অনুযায়ী পাঠক সমাজের  
কাছে উপস্থাপিত করেন। সমাজের উচ্চবর্ণ ব্যক্তি ব্রাহ্মণ ও অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থানে থাকা  
গঙ্গাচরণ ও তার স্ত্রী কোনরকমে অনাহারকে ঠেকিয়ে রাখলেও মতির মত অনেক মানুষ না  
খেয়ে অনাহারে জীবন বিসর্জন দেবার উপক্রমিত।

মন্বন্তরের মধ্যে অনঙ্গ-বৌয়ের ঘরে আসে নতুন জীবন। তার সন্তান জন্ম নেয়। চারদিকে  
হাহাকার, ক্ষুধার্ত, নিরন্ন মানুষের চিৎকারের মধ্যে এই নতুন জীবনের আগমন। লেখকের  
ভাষায় বলা যায় –

“অনঙ্গ-বৌ যন্ত্রণায় চিৎকার করতে লাগলো, কখনো ওঠে কখনো



বসে। যুপবদ্ধ আর্ত পশুর মত চীৎকার।” ২৮

‘মন্মন্তর’ নামক যুপকাষ্ঠ থেকে মানুষের মুক্তির কোনও উপায় নেই। মানুষকে এখানে জন্তুর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এবং নবাগতের আগমনও এখানে জন্তুব। নবাগতের আগমনে সবাই আনন্দিত হয়ে গঙ্গাচরণের কাছে সন্দেশের আবদার জানালে গঙ্গাচরণ কেঁদে কেঁদে বলে —

“গ্রামে কোন কিছু মেলে না, হাটেবাজারেও না।” ২৯

সবদিকেই যেন মহা-আকাল লেগেছে। এই মহা অভাবের দিনে আর এক ব্রাহ্মণ দুর্গাচরণ ভিক্ষা করতে শুরু করে। সে অনঙ্গবৌ-কে বলে —

“আচ্ছা রও, কলাইয়ের ব্যবস্থা করে ফেলাচি কাল থেকে।” ৩০

ঔপনিবেশিক সমাজ সত্তার পরোক্ষ মদতে সৃষ্টি মন্মন্তরের সময়ে ঔপনিবেশিক মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তি গঙ্গাচরণের মনে দেখা দেয়, এক আধুনিক সত্তা। সে দুর্গাচরণকে বলে —

“যার জমি নেই এ বাজারে, তাকে উপোস করতেই হবে। জমি না চষে পরের খাবে, এ আর চলবে না। চাষা লাঙ্গল ধরে চাষ করে, আমরা তার ওপর বসে খাই, এ ব্যবস্থা ছিল বলেই আজ আমাদের এ দুর্দশা।” ৩১

এই দুর্দিনে, অপমানে ক্ষুধার অভিজ্ঞতায় গঙ্গাচরণ ব্রাহ্মণত্বের অভিমান দূরে সরিয়ে চাষীর কাজ করতে চায়, উৎপাদক হতে চায়। কিন্তু দুর্গাচরণ বলে —

“সকলেই চাষ করবে নাকি ? ..... ও হোল বৈশ্যের কাজ, ব্রাহ্মণে বৈশ্যের কাজ করবে ? তা কালে কালে তাও হবে ! ব্রাহ্মণের আর হতে বাকি রইল কি ?” ৩২

কিন্তু সময়ের তাগিদেই তা-ও একদিন ঘটবে –একথা দুর্গাচরণ ভালভাবেই বুঝে। বিশিষ্ট সমালোচক পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় বলা যায় –

“সময় - কাল মন্বন্তরের ভেতরদিয়ে চেতনার এই নতুন স্তরকে নিয়ে আসে।” ৩৩

মন্বন্তরের করাল গ্রাসে কাপালীদের ছোটবৌ কোথাও যেন একদিন হারিয়ে যায়। হঠাৎ একদিন ফিরে আসে অনঙ্গবৌয়ের জন্য চাল নিয়ে। ফিরে আসার সময়ে কাপালীবৌ নতুন নতুন কাপড়, হাতের রঙিন চুড়ি লাগিয়ে ফিরে আসে। কিন্তু তাকে পরে আর অনঙ্গবৌ ইটখোলায় যদুপোড়ার কাছে যেতে দেয় না ; শহরেও যাওয়ার পথ বন্ধ করে দেয়। অনেকেই যখন গ্রাম ছেড়ে শহরের দিকে যাচ্ছে তখন গঙ্গাচরণ ও অনঙ্গবৌ-রা গ্রামের মধ্যেই থাকে। তারা শহরের আধুনিক জীবনযাত্রা থেকে সহস্রযোজন দূরে থাকতে চান। এরই মধ্যে নেমে আসে মন্বন্তরের প্রথম অশনিসংকেত – মতির অনাহারে মৃত্যু। লেখকের ভাষায় বলা যায় –

“একটি মূর্তিমান বিপদের সংকেত স্বরূপ ওর মৃতদেহটা পড়ে রয়েছে আমগাছটার তলায়। অনাহারে প্রথম মৃত্যুর অশনি-সংকেত।” ৩৪

মতি ঔপনিবেশিক শক্তির সৃষ্ট মন্বন্তর থেকে বাঁচার জন্য আমগাছ তলায় অর্থাৎ প্রকৃতির কাছে আশ্রয় নেয়। বস্তুত উপনিবেশ নামক অষ্টোপাস থেকে বাঁচার উপায় না থাকার জন্য সেখানেই না খেয়ে তাকে মরতে হয়। মতির মৃতদেহটি সংকার করার কোনও মানুষ না থাকার শেষপর্যন্ত অনঙ্গবৌয়ের অনুরোধে গঙ্গাচরণ, দুর্গা ভট্টাচার্য ও কাপালীবৌ একসঙ্গে এই দেহের সংকার করে। আর এখানেই গঙ্গাচরণ, দুর্গা ভট্টাচার্যের মত মানুষেরা বর্ণবিভেদ বিদীর্ণ গ্রাম্যসমাজের উচ্চবর্ণের মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসেন চলমান মানবতাবাদের পরিসরে, আর অস্তিত্ববাসী

মানুষের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেন। এই একাত্মতার মধ্যেই পরিস্ফুট উপন্যাসটির আধুনিক পরিসর। আর এখানেই স্পষ্ট ফুটে ওঠে ‘অশনিসংকেত’ উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের ঔপনিবেশিক মানসিকতা ও আধুনিক চেতনার অমীমাংসিত দ্বন্দ্বিক পরিসর।

উল্লেখপঞ্জি: —

- ১। মদন মোহন কুমার - 'অশনিসংকেত : আলোচনা' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, ১৪১২, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃঃ ৫
- ২। দীপঙ্কর মল্লিক - 'বিভূতিভূষণের অশনিসংকেত' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, ২০০৫, দে'জ পাবলিশিং, পৃঃ ৩৬
- ৩। পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় - উপন্যাস রাজনৈতিক : বিভূতিভূষণ - ১৯৯২, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, পৃঃ ৩৫
- ৪। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় - বিভূতিরচনাবলী - জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, (১০ম খণ্ড) ১৪০৪, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃঃ ৬
- ৫। তদেব — পৃঃ ৬
- ৬। তদেব — পৃঃ ৬
- ৭। তপোধীর ভট্টাচার্য - বাখতিন : তত্ত্ব ও প্রয়োগ, ১৯৯৬, পুস্তক বিপণি, পৃঃ ৯৩
- ৮। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় - পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৫
- ৯। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় - পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৭
- ১০। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় - পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৭
- ১১। ভূদেব চৌধুরী - 'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা' (দ্বিতীয় পর্যায়) গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, ১৯৬৪, বুঃ প্রাঃ লিঃ, পৃঃ ৭৮
- ১২। তদেব — পৃঃ ৭৯

- ১৩। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় - পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২০
- ১৪। সুমিতা চক্রবর্তী - দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ : বাঙালির জীবন, মনন ও সাহিত্য (প্রবন্ধ), স্বপনবসু ও হর্ষদত্ত (সম্পাদিত) - 'বিশশতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, ২০০০, পৃঃ ১১৪
- ১৫। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় - পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২৪
- ১৬। দীপঙ্কর মল্লিক - পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৩৮
- ১৭। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় - পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৫৩
- ১৮। তদেব - পৃঃ ৬৯
- ১৯। তপোধীর ভট্টাচার্য - পূর্বোক্ত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, পৃঃ ৯৬
- ২০। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় - পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৬৪
- ২১। সুমিতা চক্রবর্তী - দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ : বাঙালির জীবন, মনন ও সাহিত্য (প্রবন্ধ), স্বপনবসু ও হর্ষ দত্ত (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, পৃঃ ১১৩
- ২২। তপোধীর ভট্টাচার্য - 'প্রতীচ্যের সাহিত্যের তত্ত্ব' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, ১৯৯৭, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, পৃঃ ১২৭
- ২৩। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় - পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৬৫
- ২৪। দীপঙ্কর মল্লিক - পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৩৭
- ২৫। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় - পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৭৪

|     |                               |                          |
|-----|-------------------------------|--------------------------|
| ৬।  | তদেব —                        | পৃঃ ৭৫                   |
| ৭।  | তদেব —                        | পৃঃ ৭৫                   |
| ৮।  | তদেব —                        | পৃঃ ৭০                   |
| ৯।  | তদেব —                        | পৃঃ ৭১                   |
| ১০। | তদেব —                        | পৃঃ ৭৯                   |
| ১১। | তদেব —                        | পৃঃ ৭৯                   |
| ১২। | তদেব —                        | পৃঃ ৭৯                   |
| ১৩। | পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় — | পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৪৪ |
| ১৪। | বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় —  | পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৮৪ |

## দ্বিতীয় অধ্যায়

### ঔপনিবেশিক মনন থেকে আধুনিক চেতনার উত্তরণ

সময় চলমান ও পরিবর্তনশীল। এর ফলেই একজন ব্যক্তি কিংবা লেখকের বিশ্ববীক্ষাতে ভাঙন ধরে, পরিবর্তিত পরিমার্জিতও হয়। একই লেখকের বিভিন্ন পাঠকৃতির মধ্যে আমরা বিভিন্ন চিন্তা-ভাবনার উদ্বেক পাই। ব্রিটিশ রাজশক্তি এদেশে উপনিবেশ স্থাপন করার পর থেকেই বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের চিন্তাজগতের বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। সে সময়েই সবকিছু নতুন করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিশেষতঃ ঐতিহ্যের বিনির্মাণ, পরিচিত পথের বাইরে এসে নতুনতর পথের সন্ধান মানুষের মনে জাগে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালীন দোলাচল পরিবেশের ছায়া আমাদের সমাজকে গ্রাস করে ; শুধু সমাজে নয়, সাহিত্যেও এই ছায়ার প্রভাব লক্ষ করা যায়। কেননা সমাজ ও সাহিত্য একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। এ সময়ের সাহিত্যে বিশেষতঃ দুটি তত্ত্বের প্রভাব পরিলক্ষিত - একদিকে মার্ক্সের সাম্যবাদ অন্যদিকে ফ্রয়েডের যৌনতত্ত্ব। অনেকেই মার্ক্স ও ফ্রয়েড, সাম্যবাদ ও যৌনতত্ত্বের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। ফলে এই সময়ে পল্লী-প্রকৃতির সহজ সরলতা নয়, শহরজীবনের বক্রজাল কথাসাহিত্যে মুখ্যস্থান অধিকার করে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও দেখা যায়। এই ব্যতিক্রমি লেখক সম্প্রদায়ের মধ্যে একজন হলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এখানে সমালোচক পাথজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য উল্লেখনীয় -

“এই গজডলিকা প্রবাহ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখে বিভূতিভূষণ

যে পল্লীবাংলার শান্ত-স্নিগ্ধ, ছায়া-শীতল রূপ শব্দ তুলিতে ফুটিয়ে তুলেছেন, তা একান্তই তাঁর নিজস্ব, অননুকরণীয়। চেষ্টাকৃত নয়, অন্তর থেকে উৎসারিত।”<sup>১</sup>

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যধীন ভারতবর্ষেই বিভূতিভূষণের সাহিত্যিক জীবন পরিসর গঠিত হয়। সাহিত্য যেহেতু সমাজের-ই অংশ, তাই সমাজের ভাল-মন্দ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সাহিত্যে প্রতিফলন ঘটবেই। উপনিবেশ নামক পিঞ্জরের মধ্যে বাংলার তথা ভারতীয় মানুষও মুক্তির চেষ্টা করেও মুক্ত হতে পারেনি। এখানে বিশিষ্ট তাত্ত্বিক রোলাবার্তের একটি মন্তব্য উল্লেখনীয় -

“... The writer, attaining the status of a classic, becomes the imitator of his early creation; society makes a mannerism of his writing and returns him a prisoner of his own formal myths.”<sup>২</sup>

এজন্যেই ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণের ‘আরণ্যক’, ‘আদর্শ হিন্দু হোটেল’, ‘অনুবর্তন’, ‘অশনি সংকেত’ উপন্যাসের মধ্যে দেখতে পাই, ঔপন্যাসিকের ঔপনিবেশিক মনন ও আধুনিক চেতনার মধ্যে অমীমাংসিত দ্বন্দ্ব। দু-একটি উপন্যাসে এই দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করে বিভূতিভূষণের বিশ্ববীক্ষা আধুনিক চেতনার দিকে এগিয়ে যায়। এই চেতনার উত্তরণ ঘটেছে ‘পথের পাঁচালী’ ও ‘অপরাজিত’ উপন্যাস দুটির মধ্যে।

বিশ্বমন্দাকালীন সময়ে বিভূতিভূষণের ‘পথের পাঁচালী’ (১৯২৯) উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। এ সময়ে শহর ছাড়াও ব্রিটিশ উপনিবেশ বাংলার গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে পড়ে। শহরে সভ্যতার প্রভাব কম-বেশি গ্রামের মানুষকেও আকৃষ্ট করে। গ্রাম-বাংলার চিরকালীন ঐতিহ্যে



ভাঙন শুরু হয়। ব্রিটিশরা আসার পূর্বে আমাদের দেশে যে কৃষিনির্ভর অর্থনীতির শক্ত বনিয়াদ ছিল, তারই বিনির্মাণ করে ব্রিটিশ পরিচালিত আধুনিক শিল্পব্যবস্থা। এই শিল্পব্যবস্থার অন্তর্গত ছিল চটকল, রেলপথ, টেলিগ্রাফ – এসব কিছু বাংলার কৃষিনির্ভর অর্থনীতির উপর নিজের দখল কয়েম করে। ব্রিটিশ উপনিবেশ নিজেদের শক্তি বাড়ানোর জন্য অন্য রাষ্ট্রকে শোষণের উপর গুরুত্ব দেয়। এখানে সমালোচক ড° বিপান চন্দ্রের (অনুবাদক ব্রজদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়) একটি মন্তব্য উল্লেখনীয় —

“ধনতন্ত্রের আরো অগ্রগতির জন্য কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে প্রয়োজন দেখা দিল প্রভূত পরিমাণ পুঁজির। ব্রিটেনে এই পুঁজির উৎস ছিল সীমিত, তাই সে দেশের পুঁজিপতি সম্প্রদায় ব্রিটিশ ধনতন্ত্রের প্রসারের জন্য বিদেশি রাষ্ট্রের সম্পদ লুণ্ঠনের কথা ভাবতে লাগলেন।” ৩

একথা ভেবেই ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি তাদের শাসনপদ্ধতির কাঠামোর পরিবর্তন করে। এরই মধ্যে ব্রিটেনে ঘটে যায় শিল্প বিপ্লব। ব্রিটিশ অর্থনীতিতে মুখ্য স্থান অধিকার করে শিল্পপতি গোষ্ঠী। এই গোষ্ঠীর স্বার্থের কথা চিন্তা করে ভারতের বন্দর এবং বাজারগুলি উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় ব্রিটিশ উৎপাদকের জন্য। ফলে গ্রাম-বাংলার সর্বত্র-ই ব্রিটিশ পণ্যের দেখা যায় অবাধ ব্যবহার। এসব পণ্য প্রবেশ করানোর জন্য রাস্তাঘাটের প্রভূত উন্নতি সাধন করা হয়। এখানেও পূর্বোক্ত সমালোচকের একটি মন্তব্য উল্লেখনীয় —

“১৯০৫ সালের মধ্যেই প্রায় ৩৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রায় ২৮,০০০ মাইল রেলপথ স্থাপন করা হয়েছিল। একইভাবে চালু হয় আধুনিক ডাক ও তার বিভাগ। এরফলে ব্যবসায়িক লেনদেনের অনেক সুবিধা

হয়।”<sup>৪</sup>

এসব আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির প্রয়োগের ফলে বাংলা তথা ভারতবর্ষের আর্থিক উন্নতি ঘটে। এই ‘আর্থিক উন্নতি’ আসলে ঔপনিবেশিক শক্তির অর্থনৈতিক উন্নতি। তবে এসব প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে বাংলার জনজীবনেও নেমে আসে কালো অন্ধকার। ব্রিটিশরা ভারতবর্ষের অর্থনীতিকে আপন অর্থনীতির দাস করে রাখে এবং আমাদের সমাজের মূলধারাকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে।

তা সত্ত্বেও ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে আমাদের দেশে আধুনিক ধনতন্ত্রী শিল্পের বিকাশের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। গ্রামীণ শিল্প ও কৃষির ক্ষতি হলেও নানাধরনের আধুনিক শিল্প বাংলায় গড়ে ওঠে। ইউরোপীয় যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ – ভারতীয় জনসাধারণের মনন-চিন্তায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করে। এই পরিবর্তন প্রথম সাধিত হয় শহরাঞ্চলে, পরে গ্রামাঞ্চলে। আধুনিক যন্ত্রশিল্প নতুন পরিবহন ব্যবস্থা নগর অঞ্চলের বিস্তার, কল-কারখানা, অফিস, হাসপাতাল, বিদ্যালয় প্রভৃতি কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের নিয়োগ – সবকিছু এক সামাজিক পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। ফলস্বরূপ জাতপাতভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় অনেক শিথিলতা আসে এবং সামাজিক রক্ষণশীলতা অনেক কমে যায়।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাসটি মূলতঃ হরিহর রায়ের পরিবারকে কেন্দ্র করেই রচিত। হরিহর পরিবারের কর্তা এবং সে ছাড়াও রয়েছে স্ত্রী সর্বজয়া, পুত্র কন্যা যথাক্রমে অপু ও দুর্গা। এই চারজন ছাড়াও রয়েছেন, হরিহরের দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়া ইন্দির ঠাকরণ ও অন্যান্য কুশীলব। বিশেষতঃ উপন্যাসের নায়ক অপুর মধ্যদিয়ে বিভূতিভূষণ ঔপনিবেশিক সমাজব্যবস্থা ও এই সমাজব্যবস্থার অষ্টোপাসের জাল থেকে মুক্তি

চিত্র তুলে ধরেছেন। উপন্যাসটির কথাবয়নে রয়েছে তিনটি অংশ - বল্লালী বালাই, আমআঁটির ভেপু ও অত্রুর সংবাদ। এই তিনটি অংশ জুড়ে ঔপনিবেশিক শাসন-সমাজ-পরিসর-ইতিহাস ও বিভিন্ন চরিত্রের উল্লেখ থাকলেও মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে প্রকৃতি। প্রকৃতির ভূমিকা সম্বন্ধে সমালোচক দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন —

“বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালী মুখ্যত প্রকৃতির আধারে একটি শিশুমনের ক্রমবিকাশের কাহিনী। সেই শিশুমনকে এখানে প্রকৃতির অভিন্নতার তন্ত্রীতে বাঁধা হয়েছে। বন্যেরা যেমন বনে সুন্দর এবং শিশুরা মাতৃকোড়ে, এখানেও তেমনি শিশুমনের স্বভাব সারল্য প্রকৃতির অব্যাহত সারল্যে মিশ খেয়ে স্বাভাবিক সুন্দরতর হয়ে উঠেছে। তাই প্রকৃতির ভূমিকাটা এ উপন্যাসে অনেকটাই বেশী।”<sup>৫</sup>

বিভূতিভূষণ প্রকৃতিকে আধুনিকতার সোপান হিসেবে ব্যবহার করে ঔপনিবেশিক বেড়াঙ্গাল থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করেছেন এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে সফলও হয়েছেন। উপন্যাসের নায়ক অপূর মন প্রকৃতির প্রীতিতে ভরপুর। সমালোচক পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে —

“এই উপন্যাসের একটি শিশু-বালকের চোখে দেখা যে স্বপ্নময় জগৎ, প্রকৃতির সর্বময়তা আবার দারিদ্র, দৈনন্দিন জীবনের স্রোত, আমাদের dominant class এর ব্যাখ্যায় একধরনের ব্যাখ্যা পায়। উপন্যাসিকের ভাষা, তার নির্মাণ এড়িয়ে এক স্বপ্নময় জগতের তথ্য এই ব্যাখ্যা পেতে চায়, পেতে চায় একটি ‘সত্য’ উদাসী এক মনের নিরাপদ প্রকৃতিময়তা।”<sup>৬</sup>

‘বল্লালী বালাই’ অংশের প্রথমেই দেখা যায়, একটি পরিবারের ভঙ্গুর অবস্থানের দৃশ্য। হরিহর রায়ের পূর্বপুরুষেরা একদিন প্রচুর ধনসম্পত্তির মালিক থাকলেও বর্তমানে কোনক্রমে তার দিন অতিবাহিত হয়। তাদের ঐতিহ্যবাহী ব্রাহ্মণ্যত্ব ও জমিদারী অন্তায়মান, দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যলালিত সামন্তপ্রথাও ধ্বংসের মুখে - একথা ঔপন্যাসিক প্রথমেই পাঠক সমাজকে জানিয়ে দেন। যারা ব্রাহ্মণত্বের দোহাই দিয়ে গরিব প্রজা কিংবা শিষ্যসমাজকে ঠকিয়ে দিনযাপন করত তাদের জীবন পরিসরে অভিশাপ হিসেবে দেখা দেয় ইংরেজ প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। যদিও ‘বল্লালী বালাই’ অংশে ফুটে ওঠে ঐতিহ্যভিত্তিক সমাজের চিত্র। লেখক বিভূতিভূষণ হরিহরের সামাজিক পরিচয় প্রদান এভাবে করেছেন -

“নিশ্চিন্দীপুর গ্রামের একেবারে উত্তরপ্রান্তে হরিহর রায়ের ক্ষুদ্র কোঠাবাড়ী।

হরিহর সাধারণ অবস্থার গৃহস্থ, পৈতৃক আমলের সামান্য জমিজমার

আয় ও দু-চার ঘর শিষ্য সেবকের বার্ষিকী প্রণামীর বন্দোবস্ত হইতে

সাদাসিধাভাবে সংসার চালাইয়া থাকে।”<sup>৭</sup>

ছন্নছাড়া সংসারে দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়া ইন্দির ঠাকরণ শুধু অচল-অনড় নয় ; সে যেন এক ইতিহাসস্বরূপ। তার মৃত্যুর মধ্যদিয়েই ঘটে একটি অধ্যায়ের সমাপ্তি। ইন্দির পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বালাই। তিনি কোনও আশ্রিতের কাছে গিয়ে সুখে-শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করতে পারেননি। কিন্তু তার চোখ দিয়েই পাঠক সমাজ প্রথম আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার আভাস পায়।

ঔপন্যাসিক উচ্চবর্গীয় কৌলিণ্যপ্রথার বলি ইন্দির ঠাকরণের মুখ দিয়ে বলেন -

“ঐ ব্রজ চক্রবর্তীর যে ভিটা আজকাল জঙ্গল হইয়া পড়িয়া আছে,

কোজাগরী লক্ষ্মী-পূর্ণিমার দিন গ্রামসুন্দর লোক সেখানে পাত পাড়িত।

বড় চণ্ডীমণ্ডপে কি পাশার আড্ডাটাই বসিত সকালে বিকালে ! তখন  
 কি ছিল ঐ রকম বাঁশবন ! পৌষ-পার্বণের দিন ঐ ঢেঁকিশালে একমণ  
 চাল কোটা হইত পৌষ-পিঠার জন্য – চোখ বুজিয়া ভাবিলেই ইন্দির  
 ঠাকরুণ সে সব এখনও দেখিতে পায় যে !” ৮

এখানেই গ্রামীণ ভদ্রুর সমাজের প্রতিচ্ছবি।

গ্রাম-সমাজের ভাঙনের মধ্যদিয়ে গড়ে ওঠে ঔপনিবেশিক আধুনিক সমাজব্যবস্থা।  
 তখনই ঐতিহ্যগত গ্রামীণ রীতি-নীতির সংস্কার শুরু হয়। গ্রাম্য সংস্কৃতির অস্ত্যচলের সময়েই  
 জন্ম হয় অপূর। অপূর জন্ম ইন্দির ঠাকরুণের বিপরীত সত্তা হিসেবে। অপূ যত বড় হয়ে ওঠে  
 ততাই বালাই ইন্দির ঠাকরুণের পরিসর ছোট হতে থাকে। মৃত্যুর পূর্বে ইন্দির ঠাকরুণ ভাবে

“এই ভিটার ঘাসটুকু, ঐ কত যত্নে পোঁতা লেবু গাছটা, এই অত্যন্ত  
 প্রিয় ঝাঁটাগাছটা, খুকী, খোকা, ব্রজ পিসের ভিটা - তার সত্তার  
 বৎসরের জীবনে এসব ছাড়া সে আর কিছু জানেও নাই, বুঝেও  
 নাই।” ৯

প্রকৃতির মধ্যেই সে বালাই জীবনের মুক্তির স্বাদ খুঁজে পায়। একটি গ্রাম সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস  
 হওয়ার প্রাক-মুহূর্তে বিদেশি ঔপনিবেশিক শাসকদের হাতে সম্পূর্ণ ক্ষমতা যাওয়ার পূর্বেই  
 নিশ্চিন্দিপুর গ্রামে এক যুগের পূর্ণ অবসান ঘটে ইন্দিরের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। তার মৃত্যুর পরই  
 গ্রাম-সমাজের ভাঙনের পূর্ণ রূপ পায়। পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে কাশী যাত্রার ফলে  
 সাধারণ মানুষের মনে যে ঐতিহ্য শিক্ষা সংকট দেখা দেয়, তা আসলে সমকালীন সমাজচিত্র।

উপনিবেশিক সমাজ ব্যবস্থায় গ্রাম-বাংলার ভাঙনের চিত্র হরিহরের পরিবারে লক্ষ করা যায়। ক্রমশঃ জীবন গ্রাম বাংলা থেকে শহরমুখী আবর্তিত হয়। এরই অভিঘাতে অপু চলে যেতে চায় আধুনিক শহর কলকাতায়। অন্যদিকে গ্রামীণ সমাজকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চায় ইন্দির ঠাকরণ। শেষ পর্যন্ত অপুর অগ্রগতির জন্যই ইন্দির ঠাকরণকে উপন্যাসের পরিসর থেকে সরিয়ে দেন ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ। এখানে সমালোচক শিলাদিত্য সেনের একটি মন্তব্য উল্লেখনীয় —

“অপুর কাছে তাই ইন্দির একজন স্বার্থপর, অদরকারী মানুষ মাত্র, চুরি করা ফলের টুকরো কিংবা নতুন চাদরের জন্যেই শুধু বেঁচে থাকা। এমন নিষ্ফল মরণের মধ্যেই, সেকালের ছায়াতে একালের অপু শিক্ষা সভ্যতার স্পর্শ পায়। বোঝা যায়, সে পুরুতগিরি করবে না, শহরে যাবে, উচ্চাকাঙ্ক্ষা। বুদ্ধি বা শিক্ষার ভিতর দিয়ে কুসংস্কার, গোঁড়ামি কাটিয়ে সে এগিয়ে যাবে। ..... ব্রিটিশ উপনিবেশের প্রজা আমরা, অপূর অগ্রগতির উল্টো পিঠে তাই মরতেই হয় ইন্দির ঠাকরণকে।”<sup>১০</sup>

ব্রিটিশ উপনিবেশ নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য ঢালাওভাবে ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা করে শহর কলকাতা সহ ভারতবর্ষের সর্বত্র। ইংরেজি শিক্ষা-ই আমাদের আধুনিক চিন্তা-চেতনার বাহক। এছাড়া ব্রিটিশ শক্তি তাঁদের অর্থনীতিকে শক্তপোক্ত করার জন্য বাংলার সমাজব্যবস্থাকেও আধুনিকরণের প্রচেষ্টা করে। তাই উপন্যাসের সপ্তম পরিচ্ছেদে দেখা যায়, গ্রাম্য সমাজে জুলুমবাজী করে জমিদারীতে অভিজ্ঞ অন্নদা রায়ের জীবনের এক ঘন অন্ধকার পরিবেশ। ব্রিটিশ সরকারের জরিপ ব্যবস্থা গ্রাম্যসমাজের ভেতরের অবস্থাকে সামনে নিয়ে আসে। এতদিন

চলে আসছে —

“রাম হয়ত শ্যামের জমি নির্বিবাদে নিজের বলিয়া ভোগ করিয়া আসিতেছে, যদু দশ বিঘার খাজনায় বারো বিঘা নিরুপদ্রবে দখল করিতেছে, এতদিন যাহা পূর্ণ শান্তিতে নিষ্পন্ন হইতেছিল, এইবার সেই সকলের মধ্যে গোলমাল পৌঁছিল।”<sup>১১</sup>

এসব গোলমালে দিশাহারা হয়ে পড়েন অন্নদাবাবু সহ অনেকে। অন্নদাবাবুর দিশাহারা হওয়ার অন্য কারণও রয়েছে। তার জ্ঞাতিপুত্র নীরেন ইংরেজি শিক্ষিত, সাহেবী চালচলনে অভ্যস্ত এবং ঔপনিবেশিক সত্তার সঙ্গে পূর্ণভাবে জড়িত। লেখকের ভাষায় বলা যায় -

“..... শৌখীন ধরনের কলেজের ছেলে, একখানিতে শোয়, একখানিতে পড়াশুনা করে .....।”<sup>১২</sup>

গ্রাম্য সমাজব্যবস্থা থেকে নীরেনের বসবাস অনেক দূরে। সে নতুন যুগের বার্তাবাহক। ঔপনিবেশিক শক্তিনিয়ন্ত্রিত ও ইংরেজি ভাষার যুগের মানুষ। গ্রাম্য সমাজ-সংস্কৃতির প্রতি তার টান নেই। সে জানে গ্রামে ভবিষ্যৎ নেই, ভবিষ্যৎ রয়েছে আধুনিক শহরে। এই নীরেন সম্বন্ধে লেখক বলেন —

“..... বেশ বলিষ্ঠ গড়ন, সুপুরুষ। কলিকাতার কলেজে আইন পড়ে, অত্যন্ত মৌনী প্রকৃতির মানুষ - দিনরাত নভেল পড়িয়া ও বন্দুক ছুঁড়িয়া কাটায়।”<sup>১৩</sup>

‘বঙ্গালী বালাই’ অংশেই দুর্গার সঙ্গে পাঠকসমাজের পরিচিতি ঘটে। দুর্গা হল ইন্দিরের মত কৌমসমাজের প্রতিনিধি। দুর্গাকে উপন্যাসের প্রথম থেকে পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত

সশরীরে দেখা যায়। পরবর্তী দশটি পরিচ্ছেদে সে সশরীরে না থাকলেও তার ছায়া উপন্যাসে উপস্থিত। দুর্গা ছিল প্রকৃতিপ্রতিমা স্বরূপ। ইন্দিরের দুঃখে সে ছিল সমব্যথী। পিসিকে চড়কের মেলা থেকে এনে দেয় দু-পয়সার মুড়কি আর দুটো কদমা। এই দুর্গার পরিচয় লেখক এভাবে দিয়েছেন —

“দুর্গার বয়স দশ-এগারো বৎসর হইল। গড়ন পাতলা পাতলা, রং অপূর মত অতটা ফর্সা নয়, একটু চাপা। হাতে কাচের চুড়ি, পরনে ময়লা কাপড়, মাথার চুল রুদ্ধ, বাতাসে উড়িতেছে, মুখের গড়ন মন্দ নয়, অপূর মত চোখগুলি বেশ ডাগর ডাগর।” ১৪

প্রকৃতি কন্যা বলেই তাকে চার দেওয়ালের গণ্ডির মধ্যে আটকিয়ে রাখা যায়নি। গ্রামের সমস্ত গাছ-পালা, ফুল-ফল, রাস্তাঘাট তার নখদর্পণে। রাস্তাঘাট, বনজঙ্গল থেকে নানাধরনের ফলমূল, কচিআম, কুল-এসব এনে ভাই অপুকে দেয় এবং নিজেও খায়। এসব কাজের জন্য মায়ের কাছ থেকে কত বকুনি, পিটুনি খেয়েছে। মা সর্বজয়া পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধের তাড়নায় তাকে ‘মেয়ে’ হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করেও পারেননি।

এই দুর্গার সাহচর্যেই অপু বড় হয়। দুর্গা যতই স্বাধীন হোক না কেন, মায়ের ভয়ে ঘরে চুপি চুপি আসে, অপুকে নানাধরনের খাওয়ার ফলমূল দেয়, আবার তাকে নিয়ে যায় বিভিন্ন জায়গায় বেড়ানোর জন্য। গ্রামের কোনও ছেলে-মেয়ের সঙ্গে দুর্গা খুব একটা মেলামেশা করে না। সবসময়ই সে পুতুলের বাজ ও খেলাঘরের সরঞ্জাম নিয়ে ব্যস্ত। এই দুর্গা চুরির মিথ্যা অপবাদে মা সর্বজয়ার কাছে মার খায়। অপু কিন্তু চুরির মিথ্যা অপবাদকে মেনে নিতে পারেনি। সর্বজয়া রাগের বশীভূতে দুর্গার চুল ছিড়ে ফেলায় অপু রাগ করে ভাবে —



“..... দিদির উপর অত্যন্ত মমতা হয় - কেমন যেন মনে হয় দিদির  
কেহ কোথাও নাই - সে যেন একা কোথা হইতে আসিয়াছে - উহার  
সাথী কেহ এখানে নাই।” ১৫

অপুর এই ভাবনায় গভীর তাৎপর্য ধরা পড়ে। দুর্গার সমাজ প্রকৃতিগত - যা ঔপনিবেশিক  
সমাজ থেকে অনেক দূরে। ‘এখানে’ শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, সে একা, ঐ গ্রাম সমাজে, ঐ  
ইতিহাসে দুর্গারা একাই এবং পরিসরহীন। দুর্গা মাকে ভয় পায় এবং তা থেকে মুক্তি পাওয়ার  
জন্য পুণ্যপুকুরের ব্রত করে। কিন্তু তার মন, পাখির খাদ্য শেওড়ার পাকা ফলের দিকে। দুর্গারা  
আধুনিক যুগে জন্ম নিয়েও আধুনিকতার পরিসর থেকে দূরে থাকে। সময় বিশেষে, দুর্গার মনে  
ভবিষ্যতের উজ্জ্বল আলোর ঝলকানি দেখা দেয়। গোকুলের বউ যখন নীরেনের সঙ্গে দুর্গার  
বিয়ের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করে তখন তার মনে নতুন ভাবের জন্ম নেয়। আমবাগানে  
নীরেনের সঙ্গে দুর্গার চারচোখের মিলনের মধ্যে বয়ঃসন্ধি কিশোরীর পরিচয় ফুটে ওঠে। নীরেন  
দুর্গাকে নবরূপে দেখে ভাবে —

“যেন পল্লী প্রান্তের নিভৃত চূত-বকুল-বীথির প্রগাঢ় শ্যামলম্লিঙ্কতা  
ডাগর চোখ দুটির মধ্যে অর্ধসুপ্ত রহিয়াছে। ... কত সুপ্ত আঁখির  
জাগরণ কত কুমারীর ঘাটে যাওয়া, ঘরে ঘরে কত নবীন জাগরণের  
অমৃত উৎসব - জানালায় জানালায় ধূপগন্ধ।” ১৬

তখন থেকে দুর্গারও মনে কত রঙিন স্বপ্নের ঢেউ দোলা দেয়।

ভাই অপূর কাছে দুর্গা শুনতে পায়, নীরেনের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাবের কথা। সেসময়ই  
অবধারিতভাবে চলে আসে রেলগাড়ির কথা - যা দুর্গার অবচেতন মনেও কোনও ধারণা ছিল

না। সে এতসময় ভেবেছে, রাণুদিদির বিয়ের কথা, ঠাকুর সুদর্শনের কাছে মানতের কথা, পিসির শেখানো ছড়া ছাড়াও অনেক কিছু। এসব ভাবনার মধ্যেই মায়ের হাতে মার খেতে হয় দুর্গাকে। বিংশ পরিচ্ছেদে আমরা দেখি অপু-দুর্গার প্রথম বনভোজনের আয়োজন। এই বনভোজনের সময়েই দুর্গার মনে এক শূণ্যভাবের প্রকাশ পায়। সে ভাবে অন্যান্যদের মত যদি বিয়ের পর আর কোনদিন বাপের ভিটেয় আসতে না পারে। সে হয়তো প্রকৃতির মধ্যে বিলীন হয়ে যাবে, তাই —

“দুর্গা আজকাল যেন এই গাছপালা, পথঘাট এই অতি পরিচিত

গ্রামের প্রতি অক্লিস্থিকে অত্যন্ত বেশী করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিতেছে।”<sup>১৭</sup>

ঔপন্যাসিক দুর্গাকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে নিয়ে যান। অপু-র অসুখের সময় মেয়েকে গন্ধভেদালির পাতা খুঁজে আনতে পাঠালে দুর্গা সেখানে পাতা খুঁজে খুঁজে গান গায় —

“হলুদ বনে বনে

নাকছাবিটি হারেয়ে গেছে সুখ

নেইকো মনে।”<sup>১৮</sup>

‘হলুদ’ শব্দটির মধ্যে যেন দুর্গার বিবর্ণ হয়ে আসা নিস্তেজ মানসিকতার পরিচয় ফুটে ওঠে। এরপরই সর্বজয়ার মুখ থেকে আমরা জানতে পারি —

“কদিন থেকে তো জ্বর হচ্ছিল - হচ্ছে আবার যাচ্ছে - ম্যালেরিয়ার

জ্বর, কাল সন্দেশ থেকে জ্বর বড় বেশি — ”<sup>১৯</sup>

অনেক চেষ্টা করেও দুর্গাকে ম্যালেরিয়া জ্বর থেকে বাঁচানো যায়নি। রেলগাড়ি দেখা দুর্গার স্বপ্নের মধ্যেই থেকে যায় ; বাস্তবে আর কোনদিন সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এই ম্যালেরিয়া জ্বর হল

উপনিবেশিক শক্তির দান। এখানে সমালোচক সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য উল্লেখনীয়

“রেলপথ বিস্তারের ফলে নদী-ব্যবস্থার যেমন ক্ষতি হয়, থানা-খন্দে  
জমা জলে ম্যালেরিয়াবাহী মশার জননক্ষেত্র হয়ে ওঠে। ম্যালেরিয়া  
আর ওলাওটা উনিশ শতকে ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থারই দান মনে করা  
হয়।” ২০

ইন্দির ঠাকরণের মৃত্যুতে একটি যুগের সমাপ্তি আর দুর্গার মৃত্যু ভয়ংকর এক শিকড় ছিন্ন  
করার প্রয়াস। দুর্গার মৃত্যু এক তথাকথিত উন্নতির - এই ‘উন্নতি’ সংস্কারের বেড়াডাল থেকে  
মুক্ত হয়ে আধুনিকতার দিকে এগিয়ে যাওয়া।

দুর্গার মৃত্যুর খবর পিতা হরিহর জানেন না ; দীর্ঘদিন বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করে আসার  
সময় মেয়ের জন্য নানাধরনের জিনিষপত্র নিয়ে আসেন। বাড়িতে এসে সব জেনে শুনে শেষ  
পর্যন্ত অপুকে নতুন কাপড় পরিয়ে গাঙ্গুলিবাড়ির উৎসবে যাওয়ার সময় অপুকে পিতা হরিহর  
বলেন —

“..... এগিয়ে চলো, অনেক বেলা হয়ে গিয়েচে বাবা —” ২১

এই ‘এগিয়ে চলো’ই হচ্ছে অতীতকে পেছনে ফেলে সামনের দিকে অর্থাৎ আধুনিক জীবন  
পরিসরের দিকে যাওয়ারই আহ্বান। দুর্গার মৃত্যুর পর সর্বজয়া নিশ্চিন্দীপুর গ্রাম থেকে অন্যত্র  
যাওয়ার জন্য স্বামীর কাছে বারবার আন্দের জানায়। শেষপর্যন্ত সবাই শহর কলকাতায় গিয়ে  
বসবাস শুরু করে। শহরে গিয়ে অপু নানাধরনের খবরের কাগজ, বই পড়তে শুরু করে। কিন্তু  
তার মন সেই নিশ্চিন্দীপুর গ্রামের প্রকৃতির জগতে ডুবে থাকে। লেখক বিভূতিভূষণ অপু

সম্পর্কে জানিয়েছেন —

“সেই ছেলেবেলায় প্রথম কুঠীর-মাঠে আসার দিনটি হইতে এই মাঠ-  
বন-নদীর কি মোহ যে তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে।” ২২

এই ‘কুঠীর মাঠের’ ইতিহাসের সঙ্গে অপূর মনের কত ঘটনা জড়িত। নীলকর সাহেবের ভাঙা কুঠি, মাঠের ঝোঁপ, উলুখড়, বনকলমী কিংবা বইয়ের পাতায় আঁকা খরগোশের ছবি জীবন্ত হয়ে লাফায় - তা অপূর কাছে এক আশ্চর্যজনক ঘটনা।

অপূকে স্কুলে পড়ানোর মত ক্ষমতা না থাকলেও পিতা হরিহর তাকে একটি বাংলা কাগজ ‘বঙ্গবাসী’ পড়তে দেন। পত্রিকাটি পড়ে অপূর কল্পনা শক্তি বৃদ্ধি ঘটলেও আধুনিক জীবন পরিসর থেকে দূরে থাকে। ছেলেকে আধুনিক জীবন ভাবনায় উত্তরণের অদম্য পিপাসা দেখা যায় হরিহরের মধ্যে। কিন্তু প্রান্তিকায়িত সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতায় বিশ্বাসী সর্বজয়া সেই পিপাসা থেকে অনেক দূরে। তাই সে ছেলেকে ব্রাহ্মণ্যবৃত্তি শেখাতে উৎসুক। সর্বজয়া অপূর বিয়ে, ভিটেতে পাকাবাড়ি তোলা, পৈতে দেওয়া - এসব কিছু নিয়েই সবসময় চিন্তা-ভাবনা করেন। কিন্তু পূর্বেই আমরা দেখতে পেয়েছি, অপূ গণ্ডিবদ্ধ সমাজ থেকে তার চিন্তা-ধারাকে মুক্ত করে নিয়েছে। তাই সে ভাবে -

“সে ওই সব জায়গায় যাইবে, ওই সব দেখিবে, বিলাত যাইবে,  
জাপান যাইবে, বাণিজ্যযাত্রা করিবে, বড় সওদাগর হইবে, অনবরত  
দেশ-বিদেশে সমুদ্রে সমুদ্রে ঘুরিবে, ... সেসব দেশে কোথায় কাহারো  
যেন তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। সেখান হইতে তাহারও  
ডাক আসিবে একদিন — সে-ও যাইবে।” ২৩

অপু গণ্ডিবদ্ধ জীবন থেকে বৃহৎ জীবনের দিকে যাত্রার জন্য তৈরি। কিছু পূর্বে এই অপু ব্রাহ্মণ্যবাদী চিন্তাধারায় নিমজ্জিত থাকার ফলে শ্রাদ্ধ থেকে মায়ের জন্য ছাঁদা নিয়ে আসে এবং মা সর্বজয়াও এতে খুশি হন। তবে কালের বিবর্তনে মূল্যবোধের কাঠামোও তাড়াতাড়ি বদলে যাচ্ছে - তার প্রমাণ রয়েছে সুনীলের মার কথাবার্তার মধ্যে। সুনীলের মা ও সর্বজয়া দু-জনই প্রান্তিকায়িত শ্রেণীভুক্ত হলেও প্রথমজন কৌমসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন। অপু এতদিন এই পরিবর্তনশীল সমাজের বাইরে বসবাস করলেও সময়কে উপেক্ষা করে বাইরে থাকা তার দ্বারা সম্ভব হয়নি। নিয়তির টানেই হোক আর কালস্রোতের টানেই হোক আধুনিকতার পীঠস্থান শহরের মধ্যেই সে যাবে। ঔপনিবেশিক শক্তি গ্রাম-বাংলার আর্থিক সামাজিক কাঠামোকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে নিজ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে। তাই অপুদের বাঁচাতে হলে শহরই একমাত্র নির্ভরযোগ্য স্থান। গ্রাম্য সমাজে ব্রিটিশ শক্তির অক্টোপাসের জাল বিস্তারের পূর্বে -

“..... গ্রামে ছিল যাত্রাপালা - পাঁচালি, কথকতা-গান আর নাচের উৎসব। মধ্য এবং নিম্নবর্গের মানুষও গ্রামে মন্দির স্থাপন করতেন, ব্রাহ্মণ কথকঠাকুরকে ডেকে পাঠের আসর বসাতেন। ঘরে ঘরে উদ্‌যাপিত হতো মেয়েদের ব্রত পার্বণ।”<sup>২৪</sup>

কিন্তু ব্রিটিশ শক্তি যখনই গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে প্রবেশ করে তখনই আধুনিক সংস্কৃতির চাপে গ্রামীণ সংস্কৃতির বিলোপ ঘটতে শুরু হয়।

নিজ অস্তিত্বকে সজীব রাখার জন্যেই অপু দীর্ঘদিনের লালিত স্মৃতিগ্রন্থিত অন্তর্বাসী জীবনের উপকূলকে একপাশে ফেলে রেখে, মা-বাবার সঙ্গে স্বপ্নের রেলগাড়িতে চড়ে বসে।

এতদিনের স্বপ্নমাখা নিশ্চিন্দিপুর গ্রামের নানা ঘটনা তথা দিদি দুর্গার স্বপ্নমাখা কাল ও পরিসর থেকে আলাদা হওয়ার গভীর দুঃখ অপুকে আপ্লুত করে। তখন —

“হঠাৎ অপূর মন এক বিচিত্র অনুভূতিতে ভরিয়া গেল। ..... কত কি মনে আসিল অল্প মুহূর্তের মধ্যে ..... দিদির কত না-মেটা সাথ ...।”<sup>২৫</sup>

উপন্যাসের এই প্রান্তে এসে ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ পূর্বের ধারাবাহিকতা থেকে সরে গিয়ে আধুনিক পথের যাত্রী অপূর কথা বললেও সে তার অতীত দিনের কথা কিংবা দিদি দুর্গাকে ভুলতে পারেনি। লেখকের ভাষায় বলা যায় —

“..... আমি চাইনি দিদি, আমি তোকে ভুলিনি, ইচ্ছে ক’রে ফেলেও আসিনি - ওরা আমার নিয়ে যাচ্ছে।”<sup>২৬</sup>

দিদির কথা, নিশ্চিন্দিপুর গ্রামের কথা ভুলতে না পারলেও সময় ও পরিসর তাকে রেলগাড়ি করে সামনের দিকে নিয়ে যায়। এখানে সমালোচক রুধ রোনেনের একটি মন্তব্য উল্লেখনীয়—

“Tense differentiation is not employed to mark varying distances between the time of narration and the time of the narrated but to indicate the degree of actualization of the told events. ... The time line of a story is not just the organization of events in a specific order, but also the foreground of the story.”<sup>২৭</sup>

কাল্পনিক উপস্থিত হয়ে অপু নতুন এক পৃথিবীর সঙ্গে পরিচিত হয়। সঙ্গীসাধীদেরকে

পিতৃপুরুষের অস্তিত্বহীন জমিদারীর গল্প শুনায়। অপূর মন কাশীর নতুন ঘরে বসে না, নিশ্চিন্দিপুরের মুক্ত হাওয়ায় লালিত-পালিত তার মন সবসময় উড়ু উড়ু থাকে। সে আবার পাঠশালায় ভর্তি হয়। কাশীতে উপস্থিত হওয়ার তিন বছরের মধ্যে অপূর বাল্যজীবনে ঘটে নানা বিষাদময় ঘটনা। এসব ঘটনার মধ্যে রয়েছে পিতা হরিহরের জ্বরে মৃত্যু, সংসারে চরম দারিদ্রতা, মা সর্বজয়ার রাঁধুণী কাজ নেওয়া, বিনাদোষে বাবুদের বাড়িতে মার খাওয়া। কাশীর জীবনযাত্রা অপূকে বিচিত্র রূপ-রসে জারিত করে তুলে। পিতার অসুখ ও মৃত্যু বালক অপূকে সংসার সম্বন্ধে আরও অভিজ্ঞ করে তুলে। জীবনের চলার পথ নানা বাঁক নিলেও শেষ হয়ে যায়নি। প্রকৃতি বিচ্যুত অপূ কাশীতে একটি থাকার ঘর পেয়েও মাতৃহীন ভাবেই তাকে ঘরে থাকতে হত। ধীরে ধীরে তার মন গণ্ডিবদ্ধ হতে থাকে। নিশ্চিন্দিপুরের প্রকৃতিনির্ভর জগতে ছিল অসংখ্য বন্ধু-বান্ধব, খেলার সঙ্গী আর রাণুদির মত স্নেহপ্রবণ জনেরা। এখানে ‘বাবুদের ছেলে’র সঙ্গে খেলাধুলা করলেও মনের মিল খুঁজে পায়না। সেজবৌরাণী ও লীলার সঙ্গে অপূর নিবিড় মানবিক সম্পর্ক গড়ে ওঠা সত্ত্বেও সবুজহীন ইট-বালু-সিমেন্টের তৈরি পাকা কোঠার পরিবেশ তাকে মূলে ফিরে যাবার ডাক দেয়।

বিভিন্ন লাঞ্ছনা-গঞ্জনায় অপূর মনে জেগে ওঠে নিশ্চিন্দিপুরের পূর্বস্মৃতি। সে তার প্রাণের আরাম তথা মুক্ত পরিবেশ ও আত্মার আনন্দ খুঁজে পায় এই নিশ্চিন্দিপুরের পথ-ঘাট-নদী-মাঠের ভাবনায়। বড়বাবুর হাতে বেত্রাঘাত খাওয়ার দিন বিকেলবেলায় অপূ ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখে -

“নিশ্চিন্দিপুরের পথ যেন ফুরাইতেছে না ..... সে চলিয়াছে .....

চলিয়াছে ..... চলিয়াছে ..... সে আর মা ..... এ পথে একা কখনো

আসে নাই, পথ সে চিনতে পারিতেছে না ..... ও কাস্তে-হাতে  
কাকা, শুনচো, নিশ্চিন্দিপুরের পথটা এটু ব'লে দ্যাও না আমাদের ?  
যশড়া-নিশ্চিন্দিপুর, বেত্রবতীর ওপারে ?” ২৮

অপু স্বপ্নের ঘোরে বেশিসময় থাকেনি। মায়ের ডাকে জেগে ওঠে, বাস্তব চেতনায় উপস্থিত  
হয়। সে স্পষ্ট দেখতে পায় -

“ওই আস্তাবলের মাথায় যে আকাশটা, ওরই ওপারে পূর্বদিকে বহুদূরে  
তাহাদের নিশ্চিন্দিপুর।” ২৯

তিনবছর পূর্বে ফেলে আসা নিশ্চিন্দিপুরের পরিবেশ, প্রিয় শৈশব, নিসর্গের অমলিন প্রাচুর্য  
অপুকে ডাকে। শহরের ঔপনিবেশিক পরিবেশ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য নিশ্চিন্দিপুরের  
প্রকৃতির ডাক সে শুনতে পায় -

“..... নিশ্চিন্দিপুর তাহাকে দিনে-রাতে সবসময় ডাকে, শাঁখারী পুকুর  
ডাক দেয়, ..... দেবী বিশালাক্ষী ডাক দেন।” ৩০

তার মনে পড়ে পিতা হরিহরের ভিটা, শুড়কলমীর বন, মায়ের হাতের লাগানো লেবুগাছের চারা  
- এসব দেখার জন্য অপু বিষণ্ণ মনে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। সেও জানে -

“জনহীন ভিটার ওঠান-ভরা কালমেঘের জঙ্গলে ঝাঁ ঝাঁ পোকা ডাকিবে,  
..... হলদে-ডানা তেড়ো পাখীটা কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরিবে।” ৩১

তা সত্ত্বেও পথের দেবতার আহ্বান শুনে অপু -

“মুখ্ বালক, পথ তো আমার শেষ হয়নি তোমাদের গ্রামের বাঁশের  
বনে, ..... চল এগিয়ে যাই।” ৩২



এগিয়ে যাওয়াটাই হচ্ছে আধুনিকতায় উত্তরণ - যার পরিস্ফুরণ ঘটে পরবর্তী উপন্যাস 'অপরাজিত'-এর মধ্যে। এখানে সমালোচক বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্যের একটি মন্তব্য উল্লেখনীয়

“হরিহরের দারিদ্র, রেলপথ, সাম্রাজ্যবাদী শাসন, নীলচাষ, জমির সঙ্গে প্রাত্যহিক সম্পর্কহীন অনাবাসী বারাণসীর ভূস্বামী সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রা - এসব কিছুই চিনিতে দেয় ভারতবর্ষের প্রাচীন কৃষিভিত্তিক গ্রাম সভ্যতার পরিবর্তন, যদিও সে পরিবর্তন ব্যাপক নয়। ..... চরিত্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক ও নিসর্গের সঙ্গে ব্যক্তিমনের অভিঘাত, দারিদ্রও বঞ্চনা - এ সবই ভারতীয় গ্রামজীবনের একান্ত আপন দৃশ্য। এই উপন্যাসে ধরা পড়েছে ভারতীয় সাহিত্যের এক আধুনিক উত্তরণের ছবিও।” ৩৩

ফলত এই উপন্যাসে একদিকে ফুটে উঠেছে গ্রাম-বাংলার জীবন এবং তার ভাঙনের প্রতিচ্ছবি। অন্যদিকে ঔপনিবেশিক নগরজীবনে আধুনিক জীবনযাপনের হাতছানি। শেষ পর্যন্ত ব্যাপক না হলেও আধুনিক চেতনায় উত্তরণের পটভূমি।

উল্লেখপঞ্জি —

- ১। পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় - 'প্রসঙ্গ : পথের পাঁচালী' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, ২০০২, পাণ্ডুলিপি, পৃ: ২৩৯।
- ২। তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদক)- 'শতবর্ষের আলোকে বিভূতিভূষণ' গ্রন্থে তপোধীর ভট্টাচার্যের লেখা 'বিভূতিভূষণের বিশ্ববীক্ষা : একটি পুনর্বিবেচনা' প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত, ১৯৯৬, উৎক প্রকাশনী, পৃ: ২৭।
- ৩। রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়(অনুবাদক)- স্বাধীনতা সংগ্রাম, ২০০০, ন্যাশন্যাল বিপান চন্দ্র (মূল) বুক ট্রাস্ট, নয়াদিল্লী-১৬, পৃ: ৪।
- ৪। তদেব — পৃ: ৮।
- ৫। দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় - 'পথের পাঁচালী যুগ্ম সমীক্ষা' ২০০০, বামা পুস্তকালয়, পৃ: ৩৮।
- ৬। পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় - 'উপন্যাস রাজনৈতিক', ১৯৯২, র্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন বিভূতিভূষণ, পৃ: ৪৯।
- ৭। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় - 'বিভূতি রচনাবলী', জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ (১ম খণ্ড), ১৪০১, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃ: ৩।
- ৮। তদেব - পৃ: ৪।
- ৯। তদেব - পৃ: ২০।

- ১০। শিলাদিত্য সেন - আনন্দবাজার পত্রিকা (২৬-৮-০৫), পৃঃ ৪।
- ১১। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় - পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৭৪।
- ১২। তদেব - পৃঃ ৭৫।
- ১৩। তদেব - পৃঃ ৭৬।
- ১৪। তদেব - পৃঃ ২৪-২৫।
- ১৫। তদেব - পৃঃ ৩৪।
- ১৬। তদেব - পৃঃ ৮২-৮৩।
- ১৭। তদেব - পৃঃ ৯৪।
- ১৮। তদেব - পৃঃ ১০২।
- ১৯। তদেব - পৃঃ ১১৪।
- ২০। স্বপন বসু ও ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী (সম্পাদিত) 'উনিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি'  
গ্রন্থের সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গ্রাম-বাংলা, উনিশ শতক'  
নামক রচনা থেকে উদ্ধৃত, পৃঃ ৭০।
- ২১। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় - পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১১৯।
- ২২। তদেব - পৃঃ ১২৭।
- ২৩। তদেব - পৃঃ ১৩১।
- ২৪। স্বপন বসু ও ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী (সম্পাদিত) 'উনিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি'  
গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, পৃঃ ৭০।
- ২৫। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় - পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১৪২।

- ২৬। তদেব - পৃঃ ১৪৩।
- ২৭। তপোধীর ভট্টাচার্যের - 'বাখতিন : তত্ত্ব ও প্রয়োগ' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, ১৯৯৬  
পুস্তক বিপণি পৃঃ ১৫৮।
- ২৮। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় - পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১৭৯।
- ২৯। তদেব - পৃঃ ১৭৯।
- ৩০। তদেব - পৃঃ ১৭৯।
- ৩১। তদেব - পৃঃ ১৭৯।
- ৩২। তদেব - পৃঃ ১৮০।
- ৩৩। অরুণ সেন (সম্পাদনা) - 'বিভূতিভূষণ : আধুনিক জিজ্ঞাসা' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত,  
২০০৩, সাহিত্য অকাদেমী, জীবনতারা, পৃঃ ১৭।

## অপরাজিত

দশ শতক থেকে বাংলাদেশের সঙ্গে ব্রিটিশদের সম্পর্ক ঘটে। এই সম্পর্ক ছিল উপনিবেশমূলক। ব্রিটিশরা উপনিবেশ স্থাপন করলেও বাংলাদেশে সার্বিক ক্ষেত্রে এক আমূল পরিবর্তন ঘটায়। এখানে সমালোচক গোলাম মুরশিদ-এর একটি মন্তব্য উল্লেখনীয় -

“এই ঔপনিবেশিক শক্তি যে-ভাবধারা নিয়ে এসেছিলো, তা মধ্যযুগীয় নয়। তার কয়েক শতাব্দী আগেই রেনেসন্সের প্রভাবে ইউরোপের চিন্তার জগতে যুগান্তর ঘটেছিলো। জ্ঞানে-বিজ্ঞানে ইউরোপ ছিলো পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে অগ্রসর। প্রযুক্তিতেও। সুতরাং ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পেনি ব্যবসার পণ্য নিয়ে এসেছিলো, এ কথা বললে কেবল অর্ধেক বলা হয়, তারা পণ্যের থেকেও দুর্মূল্য যা নিয়ে এসেছিলো, তা হলো আধুনিকতার বাণী এবং সে আধুনিকতার দিকে এগিয়ে যাওয়ার বাহন-জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি। সুতরাং ইউরোপীয় শাসকদের প্রভাবে যে-পরিবর্তন সূচিত হলো, সে পরিবর্তন ছিলো মধ্যযুগীয়তা কাটিয়ে আধুনিকতার দিকে পদক্ষেপ।” ১

ঔপনিবেশিক শক্তির শোষণ প্রক্রিয়ার মধ্যেও বাংলাদেশ শিক্ষাক্ষেত্রে এক নতুন যুগে পা রাখে। তবে একথাও সত্য, ব্রিটিশরা বাংলাদেশে জ্ঞান-বিজ্ঞান উপহার দেওয়ার জন্য আসেনি। মূলতঃ তাঁরা এসেছিল বাংলার সম্পদ লুণ্ঠন করার জন্য।

ব্রিটিশরা শাসন ব্যবস্থাকে পাকাপোক্ত করার জন্য স্থানীয় ভাষা, রীতি-নীতি, ধর্মকে

জ্ঞানার জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠে। এমনকি ইংরেজ সরকার ভারতীয় ভাষা-সংস্কৃতি শিখতে আগ্রহী ব্যক্তিদের জন্য পুরস্কারও ঘোষণা করে। ফলস্বরূপ, অনেকেই ভারতীয় ভাষা, সংস্কৃতি, ভূগোল, ধর্মের উপর গবেষণা আরম্ভ করেন। গবেষণার ফলাফল বইয়ের আকারেও প্রকাশ পায়। সেইসঙ্গে দেশীয় নাগরিকদেরকে আধুনিক শিক্ষা-সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত করার জন্য বিভিন্ন স্কুল কলেজ স্থাপন করা হয়। এসব স্কুল-কলেজ স্থাপিত হয় কলকাতা নগরকে কেন্দ্র করে। ফলে কলকাতা ধীরে ধীরে নগরায়ণের দিকে এগিয়ে যায়।

ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ফলে বাঙালির মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে। পুরুষতান্ত্রিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ নারী ঐতিহ্যগত সংস্কারের শৃঙ্খল থেকে কিছুটা হলেও মুক্তি পায়। পরিবারের মধ্যে নারীর অবস্থান এবং মর্যাদা অনেকেই উন্নতি ঘটে। উনিশ শতকের গোঁড়া থেকেই স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতার সূচনা এবং বিশ শতকে এসবের বিকাশ ঘটে। এখানে উল্লেখ্য ১৮৭০-এর দশকে নারীকে উচ্চশিক্ষা দেওয়ার উদ্যোগ নেন অ্যান্ট অক্সফোর্ড সাহেব। এরপর থেকে নারী সমাজকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। ১৮৭৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মেয়েদের পরীক্ষা দেওয়ার অধিকার স্বীকার করে নেয়। নিম্নবর্ণের হিন্দু নারী শিক্ষার সুযোগকে কাজে লাগাতে না পারলেও উচ্চবর্ণের হিন্দু, খ্রিস্টান, ব্রাহ্ম নারী এই সুযোগকে সদ্যবহার করে। আধুনিক চেতনায় উজ্জীবিত হয়।

বিভূতিভূষণের সাহিত্য জীবনের প্রথম উপন্যাস ‘পথের পাঁচালী’র মধ্যে এই আধুনিকতার ছাপ আড়ালে-আবডালে দেখা যায়। বিশেষতঃ ‘পথের পাঁচালী’র যেখানে শেষ সেখান থেকেই শুরু ‘অপরাজিত’ উপন্যাসটি। ‘পথের পাঁচালী’র নায়ক অপু নিতান্ত শিশু ও নাবালক কিন্তু ‘অপরাজিত’ উপন্যাসে সে সাবালক। ‘পথের পাঁচালী’র মধ্যে অপূর সাবালক

ও নাবালকত্বের মধ্যে সহাবস্থান না থাকলেও ‘অপরাজিত’ উপন্যাসে এই দুইয়ের সহাবস্থান দেখা যায়। ফলে, ‘অপরাজিত’ উপন্যাসে অপু এক জটিলতর চরিত্র। লক্ষণীয় বিষয়, এই জটিলতাই অপুকে অসাধারণ করে তুলে।

অপু ‘অপরাজিত’ উপন্যাসের প্রতিবেদনে নানা সংগ্রামে জড়িত। প্রত্যেক সংগ্রামে সে জয়ীও হয়। এই উপন্যাসের গ্রন্থ পরিচয় অংশে সমালোচক শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন

“ ‘অপরাজিত’তে অপূর জীবনে নানান সংগ্রাম এসেছে, দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, তবু সে তার ঐ ‘বিশ্বাস’ বা ‘বোধ’ থেকে একবিন্দুও সরে দাঁড়ায়নি। সে জনোই সে ‘অপরাজিত’।” ২

অপু সংগ্রামী পুরুষ। জীবন সংগ্রামে নিজেকে সজীব রাখার জন্য নানা কাজে জড়িত হয়। একসময়ে ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায় পূজো-অর্চনা ছাড়া কোনও কার্যিক পরিশ্রম-ই করত না। পরবর্তী সময়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণবশতঃ কিছু ব্রাহ্মণ সেই ঐতিহ্যকে আর ধরে রাখতে পারেনি। প্রকৃতপক্ষে, ঔপনিবেশিক শক্তি-ই সমাজ বিনির্মাণের প্রকৃত হোতা। এক শ্রেণীর মানুষ সামাজিক বিনির্মাণের এই ধারাকে মনে-প্রাণে মেনে নিতে পারেনি। এখানে সমালোচক অসিত কুমার দত্তের একটি মন্তব্য উল্লেখনীয় -

“ভারতবর্ষের সামাজিক ব্যবস্থার ধারাবাহিকতার পথ বেয়ে যে উন্নত জীবন প্রতিষ্ঠার স্বাভাবিক প্রবণতা দেখা দিচ্ছিল, তাকে ব্রিটিশের পুঁজিভিত্তিক শাসনব্যবস্থা (Bourgeois rule) পঙ্গু করে দিল। ভারতীয়

পুঁজিগোষ্ঠীর উন্মেষের বীজকে উৎপাটিত করে ব্রিটিশের উন্নত শিল্পবিপ্লবজনিত নতুন আর্থ-সামাজিক কাঠামো ভারতের সমাজবিন্যাসের বিবর্তনের সনাতন প্রবাহকে বাধাপ্রাপ্ত করল।”<sup>৩</sup>

তাদের কাছে নবজাগরণ ছিল ‘অনীপ্সিত অথচ অপ্রত্যাশিত সমাজবিপ্লবের ফল’। তবে একথাও সত্য, এই সমাজ বিপ্লবের মাধ্যমেই ঐতিহ্যবাহী জীবনধারায় ছেদ পড়ে। গড়ে ওঠে এক নতুন জীবনবোধ। এখানে বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক কালমার্শের একটি মন্তব্য উল্লেখনীয় –

“This is the traditional Indian economy which was shattered in its foundations by the onset of foreign capitalism, represented by British conquest shattered that basis and remained a foreign force acting from outside and withdrawing its tribute outside.”<sup>৪</sup>

নবজাগরণ বাংলার মানুষকে প্রভাবিত করে। ফলে সংস্কারের বন্ধন থেকে কিছুটা হলেও মানুষ মুক্তি পায়। প্রান্তিকায়িত নারী সমাজও এই প্রভাবের বাইরে ছিল না। তারাও শিক্ষাগ্রহণের প্রতি মনোনিবেশ করে। উনিশ শতকের পরবর্তী সময়ে অনেক নারীর কথাবয়নে কিংবা গদ্য রচনায় এর প্রমাণ রয়েছে। সেই সময়ের বিশিষ্ট লেখিকা কামিনী রায় তার ‘বালিকা শিক্ষার আদর্শ - অতীত ও বর্তমান’ প্রবন্ধে লেখেন –

“শিক্ষা আমাদের নতুন জ্ঞান এবং নতুন শক্তি দিয়া দুর্বলতা, অভাব এবং দুঃখকে অতিক্রম করিতে সমর্থ করে আর জীবনের গৌরব ও আনন্দ বাড়াইয়া দেয়।”<sup>৫</sup>



কামিনী রায় ‘জ্ঞান বৃক্ষের ফল’ নামক প্রবন্ধে নারী শিক্ষার ফলাফল নিয়ে বলেন –

“নারী যদি কলচালিত পুস্তলিকার মতো না হইয়া আপনার দায়িত্বজ্ঞানে  
কর্তব্য করিতে শেখেন, পূজার মন্ত্র পাখির মতো উচ্চারণ না করিয়া,  
তাহার অর্থ বুঝিতে সমর্থ হন ; যদি কুসংস্কারের আবর্জনারাশি  
সরাইয়া ফেলিয়া, কৌলিক আচার ও ব্রতনিয়মাদির প্রকৃত মর্ম, কবিত্ব,  
সৌন্দর্য ও উপকারিতা অনুভব করেন, তাহা হইলে কি গৃহ কিংবা  
পরিবারে কোনো মহান অনর্থ ঘটে ?” ৬

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে নারী নিজের অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন। এই  
সময়কালেও কিছু নারী চিরায়ত সংস্কারকে ত্যাগ করতে পারেনি। অপু ও তার মা সর্বজয়া  
শহর কলকাতায় বসবাস করে। অপু কলকাতার কোনও এক স্টেশনে ব্যবসার কথা মাকে  
জানাতে তিনি প্রথমাবস্থায় রাজি হননি। তিনি বর্ণবাদে বিশ্বাসী। স্নান না করে ভাত রান্নাও  
করেন না। অপু ভাতের থালা ধরতে গেলে তিনি বলেন –

“ভারি আমার বামুন, সন্ধ্যা নেই, আফিক নেই, বাচবিচের জ্ঞান নেই,  
এঁটো জ্ঞান নেই - ভারি আমার -” ৭

সে সময়ের নানা সংস্কারমূলক আন্দোলনের পটভূমিও নারীর ভূমিকা প্রসঙ্গে সমালোচক স্বপন  
বসু বলেন –

“..... নারীমুক্তি আন্দোলনেও আবার ছিল নিত্যন্ত সীমাবদ্ধতা সমাজের  
সর্বস্তরের নারীকে স্পর্শ করেনি, কেবল উচ্চবর্ণের নারীকে নিয়েই  
ভেবেছে। বিশ্বয়ের কথা, সংস্কারকরা যেখানে উৎপীড়িত নারীর

দুঃখমোচনে অগ্রসর, সেখানে তাঁরা সর্বস্বান্ত জনগণের দুঃখ-দুর্দশা  
সম্বন্ধে উদাসীন। এই কালে শোষণে ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে জনসাধারণ  
চূড়ান্ত দুর্দশার মধ্যে থাকলেও, নবোদিত সমাজচেতনায় তারা রয়ে  
গেল অবহেলিত ও উপেক্ষিত।” ৮

সর্বজয়া উচ্চবর্ণের নারী হলেও আর্থিক দিক দিয়ে ছিলেন নিঃস্ব। অন্যদিকে নারীমুক্তি আন্দোলনের  
উদ্যোক্তারা উচ্চবর্ণের নারীদের নিয়ে ভাবলেও এই শ্রেণীর মধ্যে প্রতীচ্যের শিক্ষা-সংস্কৃতির  
প্রভাব তেমন দ্রুত বিস্তার লাভ করতে পারেনি। কারণ, ব্রাহ্মণদের ছিল কুলবৃত্তি। এছাড়াও  
তাঁরা ছিল গোঁড়া, রক্ষণশীল। এসব কারণেই প্রতীচ্যের শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল  
অত্যন্ত মন্থর গতিতে। এখানে সমালোচক গোলাম মুরশিদের একটি মন্তব্য উল্লেখনীয় -

“উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যেও বর্ণভেদে শিক্ষার সমান বিকাশ ঘটেনি।” ৯

শিক্ষার সমান বিকাশ না ঘটায় জন্যই সর্বজয়ার মত নারীর মন রক্ষণশীল গণ্ডিবদ্ধ জীবনে  
আবদ্ধ।

উনিশ শতকের প্রথমদিকে মানুষের সামাজিক মর্যাদাই ছিল প্রধান। কিন্তু বিশ শতকে  
কূল মর্যাদার চেয়ে আর্থিক শক্তি বেশি গুরুত্ব পায়। এই আর্থিক কারণেই হরিহর রায়  
কূলমর্যাদাকে গুরুত্ব না দিয়ে স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে কাজের সন্ধানে কলকাতায় আসেন। কলকাতার  
নব্য হাওয়া অপূর মনকে স্পর্শ করে। নব্য হাওয়ায় অপূর মন থেকে জাত-পাতের সীমারেখা  
মুছে যায়। তাই মা সর্বজরাকে ব্যঙ্গ করে বলে -

“..... আমি কারুর পাতে বসচি নে, ব্রাহ্মণের খেতে নেই কারুর  
এঁটো।” ১০

পূর্বেই উল্লেখ্য, ঔপনিবেশিক শক্তির সংস্পর্শে এসে বাঙালির মানসিকতা পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু মানুষ প্রতীচ্যের সংস্কৃতিকে অন্ধভাবে অনুসরণও করে। এই অনুসরণ বা অনুকরণ প্রক্রিয়া মূল উৎসস্থল ঔপনিবেশিক নীতি। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক বিপান চন্দ্রের (অনুবাদক - রঞ্জনা চট্টোপাধ্যায়ের) ভাষায় বলা যায় -

“ভারতীয়েরা যাতে ব্রিটিশরাজের বিশ্বস্ত প্রজা হয়ে ওঠে এবং ব্রিটিশ পণ্যের উৎসুক ক্রেতাদের পরিণত হয়, সেজন্য ভারত উপনিবেশের ওপর কেন্দ্র অর্থাৎ ব্রিটেনের সংস্কৃতিকে চাপিয়ে দেবার সবরকম চেষ্টাই করা হত।”<sup>১১</sup>

ঔপনিবেশিক শক্তি তাদের সংস্কৃতিকে চাপিয়ে দিলেও বাঙালি সমাজ সবকিছুকে নতুনভাবে গ্রহণ ও বিচার করার সামর্থ্য অর্জন করে।

এর ফলেই, অপু সম্পর্কিত দাদু ভবতারণ চক্রবর্তীর সঙ্গে মনসাপোতায় গিয়ে কুম্বুড়ি আরম্ভ করলেও বেশিদিন এসব কাজ করেনি। মনসাপোতায় যাওয়ার পূর্বে বাল্যসঙ্গী লীলার সঙ্গে দেখা হয়। লীলা ছিল মনিববাড়ির মেজোবাবুর মেয়ে। বাল্যসঙ্গী লীলাকে দেখে অপু ভাবে

“এ যেন সে লীলা নয়, যাহার সঙ্গে সে দেড়বৎসর পূর্বে অবাধে মিলিয়া মিশিয়া কত গল্প ও খেলা করিয়াছে। তাহার তো মনে হয় না লীলার মত সুন্দরী মেয়ে সে কোথাও দেখিয়াছে - রাগুদিও নয়।”<sup>১২</sup>

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, পুরনোকে নতুন করে দেখা বা ভাবাও আধুনিকতার পরিচায়ক।

লীলা শুধু সুন্দরীই নয়, পড়াশুনার প্রতি গভীর আগ্রহী। লীলা কলকাতা থেকে বাড়িতে

আসার সময় অপূর জন্য ‘সাগরের কথা’ নামে একটি গল্পের বইও নিয়ে আসে। এই বইটি সম্পর্কে লেখক বলেন —

“সাগরের কথা’ বইখানেতে অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প। সাগরের তলায় বড় বড় পাহাড় আছে, আগ্নেয়গিরি আছে, ... কোথায় এক মহাদেশ নাকি সমুদ্রের গর্ভে ডুবিয়া আছে, এইসব।” ১৩

লীলা আধুনিক মেয়ে। উনিশ শতকের পরবর্তী যে আধুনিক পরিসর তৈরি হয়েছিল, তা একদিনে গড়ে ওঠেনি। দীর্ঘদিনের ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে এই আধুনিকতা গড়ে ওঠে। এখানে সমালোচক গোলাম মুরশিদের একটি মন্তব্য উল্লেখনীয় —

“শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পরিবার এবং সমাজে মেয়েদের যে- ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছিলো, শিক্ষা বিস্তার, অবরোধপ্রথার পতন এবং ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভূমিকা পালনের ফলে উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে তা ভেঙে যেতে আরম্ভ করে।” ১৪

বিশ শতকের নারী প্রতিনিধি লীলা গার্লস স্কুলের ছাত্রী। সে অপুকে বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ শিখিয়ে দেয়। কলকাতা শহরের বৈদ্যুতিক গাড়ির কথাও সে অপুকে বলে।

পূর্বেই উল্লেখ্য, অপু মনসাপোতায় কূলবৃত্তি আরম্ভ করলেও সেসব কাজে মন ছিল না। মন না থাকলেও বংশগত বৃত্তিকে এতো তাড়াতাড়ি বিদায় দিতে পারেনি। মায়ের ইচ্ছায় ও মনসাপোতাবাসীর অনুরোধে পুরোহিতগিরি চালিয়ে যায়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও অপু পূজো শেষে চাল, ডাল, ফল-মূল বাড়িতে নিয়ে আসে। এসব দেখে সর্বজয়া ভাবে —

“এবার বোধহয় ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন, এদের ধরে থাকা যাক,

গিল্লী লোক বড় ভালো !” ১৫

তা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় ঔপনিবেশিক শক্তির ছায়ামূর্তি। সামন্ততান্ত্রিক সমাজে উঁচু সম্প্রদায়কে অন্যান্যরা দেবতুল্য হিসেবে মনে করে। তেলি গিল্লীর কথাবয়নে তার প্রমাণও রয়েছে -

“গাঁয়ে একঘর বামুন নেই - কাজকর্মে সেই গোয়াড়ী দৌড়তে হয় -

থাকলে ভালো !” ১৬

কিন্তু ‘ব্রাহ্মণ’ সম্প্রদায়ও ধীরে ধীরে দীর্ঘদিনের সংস্কারকে বিনির্মাণ করে নেয়। তাঁরাও জ্ঞাত-পাতের উর্ধ্ব উঠতে শুরু করে। উপন্যাসের প্রতিবেদনে দেখা যায়, মনসাপোতায় আশ্রয়প্রাপ্ত চাটুয্যে উপাধিধারী এক ব্রাহ্মণ জনৈক গোয়ালার মেয়েকে বিয়ে করে। তা থেকে স্পষ্ট, ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ও সমকালীন সামাজিক-সাংস্কৃতিক স্রোতে সংকরগণশীল।

এই স্রোতে ভেসেই অপু মা সর্বজয়ার উপদেশকে অস্বীকার করে গ্রামের পাঠশালার ভর্তি হয়। স্কুলে সে হেডমাস্টার থেকে আরম্ভ করে স্কুল ইন্সপেক্টরের নজরেও খুব তাড়াতাড়ি পড়ে। স্কুল ইন্সপেক্টরের কাছে বাহবা পেয়ে অপুর মন দ্বিগুণ উৎসাহিত হয়। পড়াশুনাতে তার ঝোঁক আরও বেড়ে যায়। স্কুলের হেডমাস্টার ঔপনিবেশিক শাসকের মত ব্যবহার করেন। তাঁকে স্কুলের সবাই ভয় করে। সবাই ভয় করলেও অপুর সঙ্গে ছিল আন্তরিক সম্পর্ক। অপু পাঠশালার পাঠ সমাপ্ত করে শহরের কোনও এক হাইস্কুলে ভর্তি হয়। শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যেন অপুর মানসিকতারও উন্নতি ঘটে। হাইস্কুলের শিক্ষাই অপুর জীবনকে নতুন পথে নিয়ে যায়। শিক্ষাই বাঙালি জাতি, জীবন ও জগতকে নতুন করে জানতে পারে। কোনও এক সহপাঠীর মুখ থেকে অপু স্কুলের প্রধান শিক্ষকের ভাষাজ্ঞান সম্পর্কে জানে —

“উনি মিঃ দত্ত, হেডমাস্টার - ক্রিস্চান, খুব ভালো ইংরিজি জানেন।”<sup>১৭</sup>

গ্রাম্য পরিবেশে বড় হওয়া অপু শহরের স্কুল, গ্রন্থশালা, বড় ঘড়ির মত ঘন্টা, উচ্চশিক্ষিত শিক্ষক - এ সব দেখে আশ্চর্য হয়। কারণ, গ্রামের মধ্যে এসব দেখা বা জানার কোনও সুযোগ নেই। অপুও বিভিন্ন ইংরেজি শব্দের মূল অর্থ, পত্রিকা পাঠ, দেশ-বিদেশের ভাষা-সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য পুরোদমে পড়াশুনা করে।

এই উদ্যমতার মধ্যেও স্বর্গীয় পিতা হরিহর রায়, মা সর্বজয়া, নিশ্চিন্দীপুর গ্রাম, ইছামতী নদী, দিদি দুর্গার কথা অপু মনে বারবার ভেসে ওঠে। অপু ভাবে -

“নিশ্চিন্দীপুরের কত ক্রীড়াকান্ত শান্ত সন্ধ্যা, মেঘমেদুর বর্ষামধ্যাহ্ন,  
কত জ্যোৎস্না-ভরা রহস্যময়ী রাত্রি ... সেই দশাশ্বমেধ ঘাটের রাণা,  
কাশীর পরিচিত সেই বাঙাল কথকঠাকুর।”<sup>১৮</sup>

কিংবা -

“মধুর নিশ্চিন্দীপুর ! মধুর ইছামতীর কলমর্মর ! ..... মধুর তাহার  
দুঃখী দিদি দুর্গার স্নেহভরা ডাগর চোখের স্মৃতি ! ..... কতদূর, ক’ত  
দূরে চলিয়া গিয়াছে সে দিনের জীবন।”<sup>১৯</sup>

অতীতের নানা স্মৃতি অপু মনে ভেসে উঠলেও পেছনের দিকে ফিরে তাকায়নি। নানা সংস্কারে আবদ্ধ সর্বজয়া ছেলেকে আটকিয়ে রাখতে পারেনি। সর্বজয়ার মানসিক দৃষ্টিভঙ্গিকে লেখক এভাবে তুলে ধরেন -

“তাহার স্নেহদুর্বল দৃষ্টি তাহাকে দেখিতে দিতেছিল না যে, ছেলের ডাক  
আসিয়াছে বাহিরের জগৎ হইতে। ..... সাধ্য কি সর্বজয়ার যে

চিরকাল ছেলেকে আঁচলে লুকাইয়া রাখে ?” ২০

বাড়ি ছেড়ে ছাত্রাবাসে একা থাকতে অপূর মন ছট্‌ফট করে। স্কুলের মধ্যে খুঁজে পাওয়া একটি কাগজের টুকরোতে ‘Literature’ শব্দটি দেখে অপূ আশ্চর্য হয়। সহপাঠী একজনের কাছে শব্দটির অর্থ জেনে অপূ ভারী আনন্দিত হয়। ‘বঙ্গভাষী’ পত্রিকায় ‘বিলাত যাত্রীর দ্বিটি’ নামক প্রবন্ধ থেকে বিশিষ্ট লেখক ভিক্টর হিউগোর নাম সে জানতে পারে। পাঠাগারে বসে বিভিন্ন ইংরেজি বই পড়তে না পারলেও এসব বইয়ের ছবি দেখে নিজে গর্ববোধ করে। এ সবই হচ্ছে অপূর প্রতীচ্যর জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জন করার আগ্রহতার প্রমাণ। এই আগ্রহতা-ই মানুষকে আত্মনির্ভরশীল করেছে। এজন্যেই অপূ নিজের পড়াশুনার খরচ নিজে বহন করে। সে প্রাইভেট ছাত্র পড়ায়। হাইস্কুলের পাঠ শেষ করে শহরের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে চায়। হেডমাস্টার মশাইও শহরের কলেজে ভর্তি হতে পরামর্শ দেন। তিনি বলেন -

“..... পাড়ারগাঁয়ের কলেজে খরচ কম পড়ে বটে কিন্তু সেখানে মন বড়

হয় না, চোখ ফোটে না, কলকাতাকেই ভাল বলি।” ২১

এসব টানাপোড়নের সময় অপূ মায়ের কাছে চলে যায়। মায়ের অনুমতিও পেয়ে যায় কলকাতার কলেজে পড়াশুনার জন্য। সর্বজয়া আধুনিক কলকাতার জীবন-যাপন থেকে দূরে থাকলেও এ সবের ছায়া তাকেও স্পর্শ করে।

অপূর দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ছিল কলকাতা শহরকে দেখা, ট্রাম গাড়িতে ওঠা, বায়োস্কোপ দেখা ছাড়া আরও অনেককিছু। অপূর চরিত্র সম্বন্ধে হেডমাস্টার জানান -

“..... ভাবময়, স্বপ্নদর্শী বালক, জগতে সহায়হীন, সম্পদহীন !

হয়ত একটু নির্বোধ, একটু অপরিণামদর্শী - কিন্তু উদার, সরল,

নিষ্পাপ, জ্ঞান পিপাসু ও জিজ্ঞাসু।” ২২

অপু ‘জ্ঞান পিপাসু’ হওয়ার ফলেই রাইডার হ্যাগার্ডের ‘ক্লিওপেট্রা’ পড়ে ভীষণ আনন্দ পায়। মনে জেগে ওঠে এক নতুন চেতনা। এই নতুন চেতনার জন্যেই সে অতীতের ঘটনার মধ্যে ভবিষ্যতের এক রঙিন ছবিও দেখতে পায়। রিপন কলেজে সে ভর্তি হয়। কলেজের মধ্যে বৈদ্যুতিক পাখা ও অন্যান্য সামগ্রী দেখে অপু উল্লসিত হয়। শুধু উল্লসিত নয়, এগুলি হাত দিয়ে নাড়াচাড়াও করতে চায়। এ সব আধুনিক যন্ত্রপাতির প্রতি আকর্ষণ শুধু অপূর নয় ; সমকালীন বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়েরও। এখানে সমালোচক রাজনারায়ণ বসুর একটি মন্তব্য উল্লেখনীয় -

“..... ইংলন্ডের উপর আমাদের নির্ভর দিন দিন বাড়িতেছে। কাপড় পরিতে হইবে, ইংলন্ড হইতে কাপড় না আনিলে আমরা পরিতে পাই না। ..... দেশলাইটি পর্যন্ত বিলাত হইতে প্রস্তুত হইয়া না আসিলে আমরা আগুন জ্বালিতে পাই না। দেশ হইতে কিছুই হইতেছে না।” ২৩

তা থেকে স্পষ্ট, বাংলাদেশে সেসময়ে চাহিদা মত আধুনিক শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি। আধুনিক শিল্প ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে না উঠার ফলেই আমদানীকৃত জিনিষের প্রতি আমাদের ঝোঁক বেড়ে যায়।

তবে এসময়ে ব্রিটিশরা নিজ প্রয়োজনে কিছুটা হলেও শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে। গড়ে ওঠে মিশ্র সম্প্রদায়ের মিলনস্থল আধুনিক নগর কলকাতার সঙ্গে গ্রামের সংযোগ। শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠার মধ্যদিয়ে মানুষের মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটে। সৃষ্টি হয় নতুন মূল্যবোধ। এই নতুন মূল্যবোধের প্রভাব বাংলার আনাচে-কানাচে কম-বেশি পড়ে। মানুষের ঐতিহ্যগত



সংস্কারও পরিবর্তন ঘটতে শুরু হয়। পুরনো বৃত্তির পরিবর্তে চালু হয় নতুন বৃত্তি। এতদিন অপুকে কুলবৃত্তিতে মনোনিবেশ করতে সর্বজয়া চাপ দিতেন। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাল মিলিয়ে তিনিও আধুনিক কলকাতা নগরকে নিজ চোখে দেখে নিতে ইচ্ছে প্রকাশ করেন। অপুও এসব কারণে আনন্দে আত্মহারা। কিন্তু তার আনন্দে ভাটা পড়ে বিজ্ঞান সাধক অনিলের অকাল মৃত্যুতে। এখানে লক্ষণীয়, ঔপনিবেশিক পরিসরে শাসিত শ্রেণী মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সুযোগ নেই। আর এ জন্যেই হয়তো লেখক উপন্যাসের বয়নে অনিলের মৃত্যুর ছবি অঙ্কিত করেন।

অনেক আশা-ভরসা নিয়ে অপু কলকাতার রিপন কলেজে ভর্তি হয়। কিন্তু বিভিন্ন অসুবিধে দেখা দেওয়ার ফলে অপুর মন পড়াশুনাতে বসে না। সে ভাবে -

“এই লাইব্রেরী, এত বই, বন্ধুবান্ধব, কলেজ সব ফেলিয়া হয়তো  
মনসাপোতায় গিয়া আবার পুরাতন জীবনের পুনরাবৃত্তি করিতে হইবে।  
..... প্রাচীন দিনের জগৎ, অধুনালুপ্ত অতিকায় প্রাণীদল, বিশাল  
শূণ্যের দৃশ্য, অদৃশ্য নক্ষত্ররাজি, ফরাসী বিদ্রোহ - নানা কথা। এইসব  
ছাড়িয়া শালগ্রাম হাতে মনসাপোতার বাড়ি-বাড়ি ঠাকুর পূজা .....।”<sup>২৪</sup>

কিন্তু অপু আর পূর্বতন কর্মবৃত্তিতে চলে যাওয়া সম্ভবপর নয়। সে ঐতিহ্যগত সংস্কারের উর্ধ্বে। আধুনিক শিক্ষাই মানুষকে আধুনিক বৃত্তি গ্রহণে বলা যায় স্ববৃত্তি পরিবর্তনে বাধ্য করেছে। আধুনিক বৃত্তি গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে চলে আসা জাত-পাতের গণ্ডিরেখাও একটু শিথিল হয়। এখানে সমালোচক সমরেন্দ্র কুমার জানার একটি মন্তব্য উল্লেখনীয় -

“পরিবহণ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নতি, শিক্ষার প্রসার, শিল্পোন্নয়নের ফলে  
নতুন নতুন আধুনিক কর্মসংস্থানের সুবিধা প্রভৃতির জন্য আমাদের

জাতিবিভক্ত সমাজে বিভিন্ন জাতের মধ্যে তাদের কুলগত স্ববৃত্তিকে

পরিত্যাগ করে আধুনিক বৃত্তি গ্রহণের ঝোঁক বেড়ে গেছে।”<sup>২৫</sup>

বৃত্তি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনযাত্রারও পরিবর্তন হয়। অবশ্য জীবনযাত্রার পরিবর্তনে বিশ্বযুদ্ধের ভূমিকাও কম নয়। বিংশ শতাব্দীতে অনুষ্ঠিত যুদ্ধ কিছু সংখ্যক মানুষকে দুঃখ-দারিদ্র্যের দিকে যেমন ঠেলে নিয়েছে তেমনি কিছু মানুষকে আরও আধুনিক ও আত্মকেন্দ্রিক হতেও সাহায্য করেছে। যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে জিনিষপত্রের দাম অতিরিক্ত বেড়ে যাওয়ার মানুষ চাহিদামত খাদ্য ও ব্যবহারের জিনিষপত্র ক্রয় করতে পারেনি। অপূর জীবনেও এই বিশেষ দিকটি লক্ষ্য করার মত।

ক্ষুধা, অনাহার, দুঃখ-দারিদ্র্য অপূর কলেজ জীবনের নিত্যসঙ্গী। এসব সমস্যার মধ্যেও বিভিন্ন সভা-সমিতিতে অপূ যোগদান করে। কলেজে অনুষ্ঠিত ‘আমাদের সামাজিক সমস্যা’ বিষয়কে কেন্দ্র করে তর্কসভায় অপূ উপস্থিত হয়। এই সভায় দুটি দলের নেতৃত্ব দেয় প্রণব ও মন্যুথ। প্রণবের দল ছিল সনাতনপন্থী ; ঐতিহ্যে বিশ্বাসী। সে যুক্তি সহকারে দৃঢ় দৃপ্তকণ্ঠে বাল্যবিবাহ সমর্থন করে বক্তব্য রাখে। অন্যদিকে নব্যপন্থী মন্যুথ দৃঢ়কণ্ঠে প্রণবের সব যুক্তি খণ্ডন করে সনাতন হিন্দুধর্মের সংস্কারগুলির নিন্দা করে। ফলে সভার বেশিরভাগ সভ্য মন্যুথের বিপক্ষে চলে যায়। প্রতীচ্য শিক্ষাকে রপ্ত করার, মন্যুথের কথা বলার ভঙ্গিতে সাহেবী কায়দা লক্ষণীয়। বস্তুত নবজাগরণের প্রভাবে ও ইংরেজদের সংস্পর্শেই এই নব্যদলের সৃষ্টি হয়। এই নব্যদলের সভ্যরা পুরনো ধ্যান-ধারণার বিনির্মাণ করে নতুন পথে এগিয়ে যায়। তবে লক্ষণীয় বিষয় সে সময়েও একদল মানুষ এই নতুন পথ ও ভাব-প্রেরণা থেকে দূরে ছিলেন। বলা বাহুল্য প্রণবের সহপাঠীরা এই দলের অন্তর্ভুক্ত।

অপু বিতর্কসভায় উপস্থিত থেকে নতুন সমিধ সংগ্রহ করে। তার দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়। সে কয়েকদিনের মধ্যে ‘নতুনের আহ্বান’ নামে একটি প্রবন্ধও লেখে। এধরনের বিতর্কসভায় প্রবন্ধটি উপস্থাপিত করাই অপুর মূল উদ্দেশ্য। এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে লেখক আমাদেরকে জানিয়েছেন -

“এক সপ্তাহ খাটিয়া প্রবন্ধ লিখিয়া ফেলিল। নাম - ‘নূতনের আহ্বান’;  
সকল বিষয়ে পুরাতনকে ছাঁটিয়া একেবারে বাদ। কি আচার-ব্যবহার,  
কি সাহিত্য, কি দেখিবার ভঙ্গি - সব বিষয়েই নূতনকে বরণ করিয়া  
লইতে হইবে।” ২৬

তার প্রবন্ধটি কলেজের অন্যান্য ছাত্ররাও পাঠ করে। প্রত্যুত্তরে কলেজের বিজ্ঞান শাখার এক ছাত্র অপুকে উদ্দেশ্য করে লেখে -

“..... উচ্চলক্ষ্য, উচ্চ আশা বাঙ্গালায় এনে দাও বীর  
সুযোগ্য সন্তান যে রে তোরা সবে বঙ্গ-জননীর।” ২৭

কবিতাটি পড়ে অপু খুশিতে আত্মহারা হয়। তবে বিস্মিতও হয়।

পূর্বেই উল্লেখ্য, অপু নতুনের প্রতি আগ্রহী। অনিলও এই ভাবধারায় ভাবিত। অপুর মত নব্য বুদ্ধিজীবীরা যারা সমাজের উন্নতি ও সংস্কার সাধন নিয়ে ব্যস্ত তাদের চরিত্র সম্বন্ধে অনিলের অভিমত -

“সাহিত্য, বিজ্ঞানে, আর্টে, দেশ সেবায়, গানে - সবকিছুতে, নতুন দল  
যারা উঠছে, বিশেষ ক’রে যাদের মধ্যে গিফ্ট আছে, তাদের কি  
হুল্লোড় ক’রে কাটাবার সময়?” ২৮

এই অনিলের হঠাৎ একদিন মৃত্যু ঘটে। অপু হয়ে পড়ে সঙ্গীহারা।

অপু ছাত্র-ছাত্রী পড়িয়ে দিনাতিপাত করে। আধুনিক শিক্ষার পীঠস্থান বেথুন স্কুলের ছাত্রী প্রীতিবালাকে পড়াতে গিয়ে অপু এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়। এ সব শিক্ষিতা মেয়েরা অনেকটা আত্মকেন্দ্রিক ও কুসংস্কারমুক্ত। বলা ভাল ব্যক্তিত্বময়ী। নারীর এই ব্যক্তিত্বাত্ম্য আধুনিক চেতনারই ফসল বা এখানে দৃষ্টিগোচর হয়। নারী ব্যক্তিত্বের এই পরিস্ফুটনের জন্যই হেমলতার মত নারী অপুকে বিয়ের জন্য আহ্বান জানায় নিজস্ব ঢং-এ। জানলার লিখে -

“হেমলতা আপনাকে বিবাহ করিবে।” ২৯

ঊনবিংশ শতাব্দীর এই ব্যক্তিত্বাত্ম্যময়ী নারী হেমলতাকে অপু সহপাঠীরা পাগল বলে অভিহিত করে। কারণ, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর আশা-আকাঙ্ক্ষাকে কোনও গুরুত্ব দেওয়া হয় না। সেখানে নারীর নিজস্ব ভাবনা চিন্তার প্রকাশ করা তো পাগলেরই সামিল। নারীকে তারা পণ্য হিসেবে ব্যবহার করে। বর্তমান সময়ে সবাই পণ্য। কিন্তু নারী একটু বেশি। অপু পুরুষতান্ত্রিক সমাজে লালিত হলেও তার মন আধুনিক। তাই হেমলতার জন্য অপু মনে দুঃখ হয়। তাকে অপু সান্ত্বনা দিতে চায়।

প্রতীচ্যের শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নারী-পুরুষের মধ্যে মেলামেশার গতি শিথিল হয়। ফলে রক্ষণশীল সমাজ শঙ্কিত হয়ে ওঠে, সমাজে বিশৃঙ্খলা অর্থাৎ নারীর নৈতিক অধঃপতনের আশঙ্কায় এসব ঘটনার জন্য রক্ষণশীলেরা নারীশিক্ষাকেই দায়ী করে। তবে কিছু ক্ষেত্রে অবাধ মেলামেশার জন্য সমাজে বিসঙ্গতিও দেখা দেয়। তবে, এই অবাধ মেলামেশার ভাল দিকও রয়েছে। এরই ফল স্বরূপ অপু বিভিন্ন নারীর সংস্পর্শে এসে নানা অভিজ্ঞতা অর্জন করে। নির্মলা, হেমলতা, প্রীতিবালা, দীলা, অপর্ণা কিংবা শব্দুদত্ত তেওয়ারীর বৌ-কে

অপু ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখেছে। অপু প্রতিদিন চাকুরির বিজ্ঞাপন দেখে বেড়ায়। কেননা ঐ সময়ে চাকুরির সংস্থান একটু সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। নতুন নতুন বিষয় নিয়ে ভাবতে থাকে। সে ‘বড় ছবি, জাতির পতনের কাহিনী, টাঁদের দেশের পাহাড় শ্রেণী, বর্তমান মহাযুদ্ধ, কোন বড়লোকের জীবনী’- এসবই নিয়ে ভাবে। এসব ভাবনার মধ্যে রয়েছে অপূর আধুনিক মানসিকতার পরিচয়। কারণ, আধুনিক শিক্ষা-সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পূর্বে এসব ভাবনা ছিল অকল্পনীয়।

আত্মকেন্দ্রিক আধুনিক জীবনযাত্রার অভ্যস্ত কলকাতার নাগরিক জীবন পরিসরে অপু দিনের পর দিন যেন হারিয়ে যায়। কোথাও চাকুরির আশ্বাস পায় না। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে অনিলের দেহ সংস্কারের পর সবার সঙ্গে গঙ্গায় স্নান না করে সংস্কারমুক্ত মানসিকতার পরিচয় দেয়। কারণ, ঐতিহ্যপন্থী হিন্দুদের কাছে গঙ্গায় স্নান করা একটি পবিত্র কাজ। এখানে সমালোচক ভাস্কর দাশগুপ্তের একটি মন্তব্য উল্লেখনীয় -

“সমকালীন - অর্থনৈতিক জটিল প্রবাহ উৎসারিত চেউ বিভূতিভূষণে  
দ্বন্দ্বিক বৈপরীত্য এনেছে। দুঃখবাদকে তিনি শাস্ত্রতর সম্মান দিয়েছেন,  
কারণ আপাতত তাই তার কাছে স্বাভাবিক। হয়ত সমাজতাত্ত্বিক  
চিন্তনে তিনি প্রয়াস পাননি কিন্তু তাঁর রোজনামচা যে চিন্তাধারার সাক্ষ্য  
বহন করে তার ভিত্তিতে তিনি চমকপ্রদভাবে অতি আধুনিক।” ৩০

অনিলের মৃত্যুর পর বঙ্গবাসী পত্রিকার ‘বিলাত বাতীর চিঠি’-র লেখক সুরেন্দ্রনাথ মল্লিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটায় অপু অত্যন্ত খুশী। এখানে উল্লেখ্য, দশ বৎসর বয়সেই অপু ‘বঙ্গবাসী’ পত্রিকার সঙ্গে পরিচিত। সে সময় থেকেই অপূর মনে দেশ-বিদেশ ভ্রমণের নেশা ধরে।

সুরেন্দ্রবাবুর সঙ্গে দেখা হওয়ায় অপু ভাবে -

“..... শুধু বাঁচিয়া থাকাই এক সম্পদ, তোমার বিনা চেষ্টাতেই এই অমৃতময়ী জীবনধারা প্রতি পলের রসপাত্র পূর্ণ করিয়া তোমার অন্যমনস্ক, অসতর্ক মনে অমৃত পরিবেশন করিবে ... সে যে করিয়া হউক বাঁচিবে।” ৩১

অপুর বেঁচে থাকার আর্তির মধ্যে নিহিত আধুনিক ভাবনা। এখানে সমলোচক ভাস্কর দাশগুপ্তের একটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য -

“..... বাংলার নবজাগরণ নামক উপপ্লব, তার যথাবিহিত আধুনিকতার ছাপ লাগিয়েছিল বিভূতিভূষণেও। সেই হেতু ‘চরম বৈ মধুবিন্দতি’ তার জীবনদর্শন। চলার বেগে অমৃতময় জীবনের প্রতি যে আর্তি, তা একান্তই আধুনিক।” ৩২

আধুনিক জীবনদর্শনে অনুপ্রাণিত অপু দীর্ঘদিন পর মনসাপোতায় মায়ের কাছে যায়। মা সর্বজয়ার ইচ্ছে ছিল অপু যেন পড়াশুনা শেষ করে নিশ্চিন্দিপুরের বন্ধকি আমবাগানটি নিজের হাতে নেয়। একসময় সর্বজয়াও অপুকে ইংরেজি স্কুলে ভর্তি হতে বাধা দিয়েছিলেন। তার ইচ্ছে ছিল, অপু যেন পুরোহিতগিরি-ই করে। লক্ষণীয় বিষয়, পুরোহিতগিরির মধ্যেও নিহিত একধরনের ঔপনিবেশিক ভাবনা। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সর্বজয়ারও মনের পরিবর্তন ঘটে। তিনিও পুত্রের চাকুরির অপেক্ষায় থাকেন। আবার নিশ্চিন্দিপুরের বাড়িতে দালান কোঠা তুলে বাস করতে চান। কিন্তু অপুর বিশ্বাস, তার ‘মা’ আর বেশিদিন বাঁচবেন না। সে ভাবে -

“মা কি ওই শাকের ক্ষেতের শাক খাইতে পারিবে ?” ৩৩

এসব মানসিক টানা-পোড়েনের মধ্যে অপু কলকাতায় ফিরে আসে।

ব্যস্ততম শহর কলকাতায় অপুর মাথা রাখার স্থান নেই। ঔষধের কারখানার ছোট এক কোঠায় থেকে এতদিন পড়াশুনা করেছে। কারখানার ডিরেক্টর মিঃ লাহিড়ীর সঙ্গে দেখা করে সেখানে থাকার সুবিধে করতে গিয়ে বাল্যসঙ্গী লীলার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে। পূর্বেই উল্লেখ্য, লীলা ইংরেজি জানা আধুনিক নারী। সে কলা বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্রী। লীলা মামার বাড়ি থাকে। সেখানকার পরিচয় লীলার মুখ থেকে আমরা এভাবে শুনি -

“দাদামশায় - উনি ব্যারিস্টার, তবে আজকাল আর প্র্যাক্টিস করেন না

- বড় মামা হাইকোর্টে বেরুচ্ছেন। এ-বছর বিলেত থেকে এসেছেন।”<sup>৩৪</sup>

লীলার কথাতেই আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত একটি পরিবারের চিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

অপুর কলেজ জীবনের শেষদিকে সর্বজয়ার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্বে সর্বজয়া দীর্ঘদিন ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগেন। মায়ের মৃত্যুতে অপু যেন মুক্তির স্বাদ খুঁজে পায়। ঐতিহ্যগত সংস্কারের বন্ধন থেকে আজ সে মুক্ত। সর্বজয়া ছিলেন সংস্কারাচ্ছন্ন জীবনের প্রদীপের সলতে স্বরূপ। তাঁর মৃত্যুতে অপুর মনে ক্ষণিকের জন্যে দেখা দেয় -

“..... একটা যেন মুক্তির নিঃশ্বাস ..... একটা বাঁধন-ছেঁড়ার উল্লাস .....

অতি অল্পক্ষণের জন্য - নিজের অজ্ঞাতসারে।”<sup>৩৫</sup>

মাকে প্রচণ্ড ভালবাসলেও দীর্ঘদিনের সংস্কারের বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে ক্ষণিকের জন্য তার মনে উৎসাহ দেখা দেয়। কিন্তু পরবর্তী সময়েই সে ভাবে -

“সে মুক্তি চায় না ..... অবাধ অধিকার চায়না - তুমি এসে শাসন করো,

এসব ছুঁতে দিও না, হাত দিতে দিও না - ফিরে এসো মা ..... ফিরে



এসো .....।” ৩৬

এখানেই অপূর ঔপনিবেশিক মননে আধুনিক চেতনার সঙ্গে ঐতিহ্যের শেকড় প্রোথিত। অবশ্য অপূর তার মাকে ফিরে পেতে ইচ্ছে করলেও তা সম্ভব নয়। আবার অপূর যে সংস্কার থেকে বের হয়ে এসেছে সেখানে ফিরে যাওয়াও তার কোনদিন সম্ভব নয়। এখানে সমালোচক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য -

“..... যদি ভাবি তবে বুঝব মায়ের মৃত্যুতে পিছুটান থেকে মুক্তি ভাবার ও দেখবার দৃষ্টি কী অনন্য, কী নিষ্ঠুর, অথচ সত্য এবং সর্বাধুনিক। এয়েন সাহিত্য নয় - জীবন। শুধুই জীবন। জীবনের সত্য।” ৩৭

এই সত্য-ই হচ্ছে সবচেয়ে আধুনিক।

মায়ের পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম শেষ করে অপূর কলেজে ফিরে এসে নতুন নতুন বই, ম্যাগাজিন পড়তে থাকে। নতুন জ্ঞান আহরণ করাই অপূর একমাত্র নেশা। জ্ঞান আহরণ করার আকাঙ্ক্ষাই অপূরকে নিত্য-নতুন পথে নিয়ে যায়।

জীবনের টানাপোড়েনের মধ্যে বন্ধু প্রণবের ঘটকালিতে প্রণবেরই মামাতো বোন অপর্ণার সঙ্গে অপূর বিয়ে হয়। বিয়ের পূর্বে অপূর ও প্রণব গঙ্গানন্দকাঠি টেনে যায়। দীর্ঘদিন পর টেনেযাত্রায় অপূর অত্যন্ত আনন্দিত। বিজ্ঞানের নির্মিত ও পরিচালিত জিনিষপত্রের প্রতি অপূর আকৃষ্ট। ঐতিহ্যকে স্বীকার করেই অপূর পুরোহিতের কথা মত বিয়ের মন্ত্র পড়ে যায়। হিন্দু প্রথানুযায়ী তাদের বিয়েও হয়। বিয়ের পরই অপূর মনে পড়ে স্বর্গলোক প্রাপ্ত মা সর্বজয়ার কথা। যাকে সে ঐতিহ্যের প্রতিনিধি হিসেবে ভাবত তাকে সে স্মরণ করতেই হয়।



অপু ও অপর্ণার সামাজিক বন্ধনের মধ্য দিয়ে এক নতুন জীবনের সূত্রপাত। গ্রাম ও

শহরের মধ্যে মিলন ঘটে। শহরের আবহাওয়ায় অপর্ণার মানসিকতার কম-বেশি পরিবর্তন ঘটে। অপর্ণা সম্পর্কে লেখক জানান -

“..... তখন ছিল বালিকা - এখন ইহাকে দেখিলে যেন আর চেনা যায়

না। লীলার মত চোখ-বালসানো সৌন্দর্য ইহার নাই ঘটে, কিন্তু অপর্ণার

যাহা আছে, তাহা উহাদের কাহারও নাই।” ৩৮

প্রাচীনকে নতুন করে নির্মাণ করার মধ্যেই আধুনিকতা নিহিত। কঠিন, দুপ্রাপ্য বিষয়কে আবিষ্কার করাই একধরনের আধুনিকতা। অপর্ণা পৃথিবীর সব ধবরাখবর রাখে। বিশ্বযুদ্ধ বাংলার মানুষের জীবনধারাকে পরিবর্তন করে দেয়। সেই পরিবর্তনের ডেউ অপর্ণাকেও স্পর্শ করে। যুদ্ধের প্রসঙ্গে অপর্ণা বলে -

“ইংরেজের সঙ্গে আর জার্মানির সঙ্গে - আমাদের বাড়িতে বাংলা

কাগজ আসে। আমি পড়ি যে।” ৩৯

এমনকি অপর্ণা রবীঠাকুরের কবিতা আবৃত্তি করতে পারে। সে পাড়ার নারী হয়েও আধুনিক শিক্ষা তথা পড়াশুনার প্রতি গভীর আগ্রহী।

জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে অপু স্কুল শিক্ষকের চাকুরি পায়। তবে চাকুরি পাওয়ার পূর্বেই অপু-অপর্ণা স্থায়ীভাবে কলকাতায় বসবাস শুরু করে। এখানে বিশিষ্ট ঐতিহাসিক নরহরি কবিরাজের একটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য -

“এই শিক্ষিত যুবকেরা কর্মজীবনে প্রবেশ করে কেউ শিক্ষক হলেন,

কেউ উকিল হলেন, কেউ ডাক্তার হলেন, আর কেউ সওদাগরী

অফিসের কেরানি হলেন।”<sup>৪০</sup>

চাকুরি পেয়ে অপু বিভিন্ন দেশের ছবিওয়ালা বর্ণনাপূর্ণ বই ক্রয় করে। নানা দেশের নানা কথা জানার জন্য অপু অত্যন্ত আগ্রহী। এমনকি বিদেশ থেকে আমদানীকৃত সিগারেট মুখে দিয়ে মনকে তৃপ্তি দেয়। সেসময়ে সিগারেট কিংবা এধরনের নেশা জাতীয় পদার্থ ব্যবহার করাই ছিল আধুনিকতার-ই অঙ্গ। অপর্ণা শত চেষ্টা করেও অপুকে সিগারেট টানা থেকে বিরত রাখতে পারেনি। এই কলকাতাতেই দীর্ঘ কয়েকদিন পর বাল্যসঙ্গিনী লীলার সঙ্গে অপুর দেখা হয়।

লীলার সঙ্গে তার রয়েছে গোপন প্রেম। লেখক তাদের সম্পর্কে বলেন —

“অপু বুঝিল সে লীলাকে ভালবাসে, গভীর ভাবে ভালবাসে, কিন্তু তা  
আবেগহীন, শান্ত, ধীর ভালবাসা।”<sup>৪১</sup>

লীলাও অপুকে ভালবাসে। অপু বিবাহিত হয়েও লীলার গোপন প্রেমে সাদা দেয়। কিন্তু তাদের এই প্রেম কোনদিনই প্রকাশ পায়নি। এখানে উল্লেখ্য বিংশ শতাব্দীতে নারী আরও উদার মনোভাব নেয়। এখানে সমালোচক গোলাম মুরশিদের একটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য —

“বিশ শতকে মহিলাদের মধ্যে যেসব পরিবর্তন আসে, তা চোখে না  
পড়ে পারে না। শিক্ষা, পোশাকের উন্নতি, অবলোম্ব প্রথার কড়াকড়ি  
হ্রাস এবং আংশিক অর্থনৈতিক স্বাवलম্বনের দরুন তাঁদের মধ্যে যে-  
ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে, তা পুরুষদের মনে মহিলাদের সম্পর্কে এবং  
মহিলাদের মনে নিজেদের সম্পর্কে ধারণাকে ব্যাপকভাবে বদলে  
দিয়েছে।”<sup>৪২</sup>

বিংশ শতাব্দীর প্রতিনিধি লীলা ছবি আঁকে, বিদেশে যাওয়ার প্রস্তুতি নেয় - বা প্রাক-ব্রিটিশ

পারো সম্ভবই ছিল না।

পূর্বেই উল্লেখ্য, অপর্ণা গ্রামেই বড় হয়। এ জন্যেই শহরে পরিবেশকে মানিয়ে নিতে তার অসুবিধে হয়। ফলস্বরূপ অপু ও অপর্ণা কিছুদিনের জন্য মনসাপোতায় চলে যায়। মধ্যে কয়েকদিন অপর্ণা পিতৃভূমিতেও গিয়ে থাকে। কলকাতায় থাকা অবস্থায় বাল্যবন্ধু দেবব্রতের সঙ্গে অপু দেখা হয়। দেবব্রতের আমেরিকা ভ্রমণের কথা শুনে অপু অত্যন্ত আনন্দিত। একসময় দেবব্রত ছিল অন্তর্মুখী। কিন্তু দিন বদলের সঙ্গে সঙ্গে তারও চিন্তাভাবনার পরিবর্তন হয়। অপুও প্রতীচ্যের দেশগুলি ভ্রমণ করে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে নিজেকে জড়িত করতে চায়। কিন্তু অপর্ণার মৃত্যুতে তার এসব চিন্তা ভাবনায় ছেদ পড়ে। অপর্ণা ছিল ভারতীয় ঐতিহ্যময়ী নারী। লীলার মত সাহেবী চাল-চলনে অভ্যস্ত ছিল না। অপর্ণার মধ্যে অপু ভারতীয় আদর্শ নারীর ছায়া দেখতে পায় —

“..... মায়ের মত স্নেহশীলা, সেবাপরায়ণা, সেইরকমই অন্তর্মুখিনী।

বার্ধক্যের কর্মরূপান্তর মা যেন ইহারই নবীন হাতে সকল ভার সঁপিয়া

দিয়া চলিয়া গিয়াছেন।” ৪৩

রবীন্দ্রনাথ যেমন নারীকে তিনরূপে দেখেছেন তেমনি বিভূতিভূষণও নারীর তিনরূপ দেখেছেন।

অপর্ণা যেন সর্বজয়ার নবসংস্করণ। সর্বজয়ার মত সেও আধুনিক পৃথিবীর ভার সহ্য করতে পারেনি। কাজলের জন্মের পরই অপর্ণার মৃত্যু ঘটে। কাজল হল ভবিষ্যতের সুত্রধার। অপর্ণাহীন পৃথিবীতে অপু নিঃসঙ্গ। কলকাতার জীবনযাত্রা অপু আর ভাল লাগে না। নানা মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করে অপু নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তি পেতে চায়। লীলার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে সে জানতে পারে বিলাতফেরৎ এক ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে লীলার বিয়ে হয়। ফলে

খাঁটি সাহেবের মত লীলার বরের চাল-চলন। লীলার বিয়ের কথা শুনে অপু আনন্দ প্রকাশ করলেও অবচেতন মনে দুঃখ পায়। ডাকঘরের নিত্যনতুন চিঠি-পত্র দেখে আনন্দ পায়। একসময়ে মিথ্যা বদনামে গ্রামের স্কুলের চাকুরি হারিয়ে অপু মুক্তির স্বাদ খুঁজে পায়। তখন তার মনে হয় -

“..... আজ আর স্কুল নাই, টিউশনি নাই - ..... আজ সমস্ত সময়টা তাহার নিজের, তাহা লইয়া সে যাহা খুশি করিতে পারে - আজ সে মুক্ত ! ..... মুক্ত ! ..... মুক্ত ! ..... বহুকাল পর স্বাধীনতার আশ্বাদন আজ পাওয়া গেল।” ৪৪

স্কুলের গণ্ডিবদ্ধ চাকুরি জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে বিভিন্ন বক্তৃতা সভায় উপস্থিত থাকে। বিভিন্ন গবেষণার ফলাফল জেনে অপু চমকিয়ে ওঠে।

মানুষের পুনর্জন্ম হয় - একথা আধুনিক চিন্তা চেতনা সম্পন্ন ব্যক্তির কাছে অবিশ্বাস্য। জনৈক সম্যাসীর প্রদত্ত পুনর্জন্মের তত্ত্বটি অপু বিশ্বাস করে না। অপূর বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে সম্যাসী বলেন -

“ইংরেজি পড়ে আপনারা তো এসব মানেন না ! তাই হতে হবে।” ৪৫

ধর্মীয় সংস্কারকে অপু বিশ্বাস না করলেও অপূর্ণার স্মৃতি ও কাজলের ভবিষ্যতের চিন্তা তার মনে ঘোরপাক খায়। উদাস বাউলের মত অপু নানা ঐতিহাসিক স্থান ঘুরে বেড়ায়। এসব স্থান দেখে অপু ভাবে -

“গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে, কবিতায় যাহা পড়িয়াছে, সে সবটাই কল্পনা, বাস্তবের সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক নাই।” ৪৬

লাকালে ‘জীবন প্রভাত’ পড়তে পড়তে অপু কত কল্পনা করত। কিন্তু সরাসরি এসব স্থান  
থেকে অপুর মন আরও বৃহৎ হয়ে ওঠে। লেখকের ভাষায় বলা যায় -

“জীবনের চক্রবালনেমি এতদিন যে কত ছোট, অপরিসর ছিল, আজকার  
দিনটির অপু তাহা জানিত না।”<sup>৪৭</sup>

অপু বাল্যকাল থেকেই দূরে অবস্থিত ‘আকাশ ও গ্রহ-নক্ষত্রের প্রতি আকৃষ্ট’।

শহরে ব্যস্ততা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার জন্য সে ‘উমেরিয়া’ অঞ্চলে চলে যায়।  
স্থানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে জন্মভূমি নিশ্চিন্দিপুরের কথা অপুর মনে পড়ে। শহরের  
রেল, মোটর, এরোপ্লেন, ট্রেড ইউনিয়ন’ থেকে অনেক দূরে এই পাহাড়ী অঞ্চল। অমরকন্টকে  
নৈক এক সাধুর মুখে পৌরাণিক গল্প-কাহিনী শুনে অপুর মনের অবসাদের অবসান ঘটে।  
এসব গল্প শুনে অপু যেন ‘অনেক দূরের এক সুপ্রাচীন জাতির অতীত সভ্যতা ও সংস্কৃতির  
মধ্যে গিয়া পড়িল একেবারে’। অতীত ইতিহাসচেতনাই একধরনের আধুনিকতা। বস্তুতপক্ষে,  
চিরকালীন তা-ই বিনির্মাণ করে নতুন পথে এগিয়ে যেতে হয়। লেখক বিভূতিভূষণ  
উপনিবেশিক পরিবেশে সাহিত্যিক প্রতিবেদন রচনা করলেও ঐতিহ্যগত উৎস থেকে রস  
সংগ্রহ করেন। এই রস সংগ্রহ করে বাংলাদেশের তথা ভারতবর্ষের পুরনো ও বর্তমানের চিন্তা-  
ভাবনাকে নতুন করে বুঝার চেষ্টা করেন। এই চেষ্টার মধ্যেই স্ফুট প্রকৃত ভারতীয় আধুনিকতা।  
সমালোচক ভূদেব চৌধুরীর ভাষায় বলা যায় -

“উনিশ শতকের বাঙালি রেনেসাঁসের সার্থকতার মূলে রয়েছে প্রতীচ্য  
শিক্ষার প্রভাবে মুক্ত-চিত্ত বাঙালি সামাজিকের হাতে ভারতীয়  
জীবনাদর্শের পুনর্মূল্যায়ন।”<sup>৪৮</sup>

এই পুনর্মূল্যায়নের জন্য বাংলার বালু-বিধবা নারীও সমাজের যে কোনও শুভ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারে। তবে প্রকৃতার্থে, মুক্ত মনে, মুক্তভাবে কোনও সামাজিক অনুষ্ঠানে বিধবা নারী অংশগ্রহণ করতে পারে না। আজও তার চারদিকে পুরুষতান্ত্রিক বেড়াজাল রয়েছে। রক্ষণীয় ব্যাপার, বর্তমানে কিছু পুরুষের সহযোগিতায় কিংবা নারী নিজস্ব আর্থিক ক্ষমতাবলে এই বেড়াজালকে কিছুটা হলেও অতিক্রমণ করেছে। এর সঙ্গে ঘটে পুরনো সংস্কারের বিনির্মাণ। কালে দেবব্রত বর সেজে বিয়ের অনুষ্ঠানে যাওয়ার প্রাক-মুহূর্তে তার পিসিমা বলেন —

“আমার ছেলেবেলায় আমাদের বাঙ্গাল দেশে নিয়ম ছিল দেখেছি  
সাতজন এয়ো আর সাতজন কুমারী এই চোদ্দজনকে দোর-ধরুণীর  
টাকা দিয়ে তবে বর বেরুতে পেত বাড়ি থেকে। একালে তো সব  
দাঁড়িয়েছে - ।” ৪৯

তা থেকে স্পষ্ট, বিশ শতকের বাংলার সামাজিক কাজকর্মে এক আমূল পরিবর্তনের সূচনা। সামাজিক ও নৈতিক কাঠামোর বন্ধন শিথিল হওয়ার ফলেই কিছু নারী রক্ষণশীল গণ্ডিকে উপেক্ষা করে প্রগতিবাদী চিন্তাধারা গ্রহণ করে। তাই দেবব্রতের মা জনৈক বিধবা মেয়েকে দেখে বলেন —

“..... বিধবা মেয়েকে কি বলে আজ সামনে রাখে বল না ? হিঁদুর  
নিয়মগুলো তো মানতে হবে, .....। মেয়েটার দোষ দিইনে, তার আর  
বয়স কি ... তার বাপ-মায়ের তো এটা দেখতে হয়।” ৫০

কিংবা, দেবব্রতের পিসিমা এই বিধবা মেয়েকে শুভকাজে উপস্থিত দেখে নানা সংস্কারমূলক কথাবার্তা বলায় দেবব্রত তার মাকে বলে -

“ছোটপিসিমাকে বলা বুঝিয়ে ওতে শুবকাজ এগোয় না, আরও  
পিছিয়ে যায়।” ৫১

এসব কথাবয়ন থেকে স্পষ্ট, তারা আর পুরনো সামাজিক সংস্কারের গণ্ডি কিংবা উপনিবেশে  
আবদ্ধ নয়। আধুনিক চেতনায় তাদের মন উদ্বুদ্ধ।

এখানে উল্লেখ করা যায়, লীলা বিলাতফেরৎ জনৈক ব্যক্তিকে বিয়ে করেও সুখ-  
শান্তিতে দাম্পত্যজীবন অতিবাহিত করতে পারেনি। তার স্বামী ছিল লম্পট। লীলা উচ্চশিক্ষিত,  
নিজ অধিকার সম্বন্ধে সচেতন। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যময়ী লীলা লম্পট স্বামীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে।  
সর্বোপরি, বিদ্রোহিণী লীলা পরপুরুষ হীরক সেনকে বিয়ে করতে কোনও দ্বিধাবোধ করেনি।  
আবার নিজের মর্জি মত তার সঙ্গে কিছুদিন দাম্পত্যজীবন কাটিয়ে তাকেও ত্যাগ করে। এখানে  
সমালোচক গোলাম মুরশিদের একটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য -

“এখন অনেক ব্যাপারেই মহিলারা স্বাধীনভাবে চলতে চান এবং সিদ্ধান্ত  
নিতে চান। এতে অনিবার্যভাবেই পুরুষশাসিত সমাজ এবং পরিবারের  
সঙ্গে তাঁদের বিরোধ দেখা দিচ্ছে। সেই বিরোধ থেকে কেবল ঝগড়াঝাটিই  
হচ্ছে না, অনেকক্ষেত্রে বিয়েও ভেঙে যাচ্ছে। ... বিয়েতে আগে পাত্রীদের  
মতামত বলে তখন কিছু ছিলো না। কিন্তু শিক্ষার বিকাশ, বিয়ের বয়স  
বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনের ফলে এখন বিয়েতে মেয়েদের  
মতামত জিজ্ঞেস করা হয়। এমন কি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে মেয়েরা  
পছন্দ করেই বিয়ে করেন।” ৫২

স্বামীর অনৈতিক কাজের জবাব দিতে গিয়ে লীলা সামাজিক রীতির বিনির্মাণ করে। ব্যক্তিত্বময়ী

আধুনিক নারী লীলা নিজে গাড়ি চালিয়ে যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়। সমাজ ও সংসারের কোনও বাঁধনে সে আবদ্ধ নয়। কলকাতার আধুনিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত লীলা অপূর সঙ্গে গল্পগুজব করে সময় কাটায়। পুত্র কাজলের কথাও অপূ গল্প করে।

কাজল মামার বাড়িতেই বড় হয়। আধুনিক শহর কলকাতার সঙ্গে তার কোনও পরিচয় নেই। কাজলের গণ্ডিবদ্ধ জীবন সেখানেই আরম্ভ। কিন্তু বাবাকে সামনে পেয়ে কাজল আর সেখানে থাকতে চায়নি। শেষপর্যন্ত অপূর সঙ্গে কলকাতায় চলেও আসে। গ্রামের জীবনকে ত্যাগ করে মানুষ বাঁচার তাগিদে শহরাভিমুখী হয়, একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এরই ফলস্বরূপ কাজলও গ্রাম গঙ্গানন্দকাঠি ত্যাগ করে শহরাভিমুখী হয়। কাজলও মামার বাড়ির বদ্ধজীবন থেকে মুক্তি চায়।

কাজলকে সঙ্গে নিয়ে অপূ কলকাতায় চলে আসে। তার মাস্টারি চাকুরি না থাকলেও প্রাইভেট ছাত্র পড়ায়, বই লেখে। ছোট একটি অফিসে অপূ কেরানির চাকুরি করে। শেষপর্যন্ত, কাজলকে সঙ্গে নিয়ে অপূ কয়েকদিনের জন্য মনসাপোতার যায়। মনসাপোতাবাসীরা অপূকে সেখানে বসবাস করার জন্য অনুরোধ করে। কিন্তু সেখানে অপূ কয়েকদিন থেকে আবার কলকাতার আধুনিক জীবনযাত্রার সঙ্গে মিশে যায়। কাজলও এই শহরের জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। অপূ কলকাতায় এসে অসুস্থ লীলার আত্মহত্যার কথা জানতে পারে। লীলার মৃত্যু আধুনিক জীবনযুদ্ধে এক আধুনিক নারীর পরাজয়। সে পুরুষতান্ত্রিক ঔপনিবেশিক সমাজ থেকে নিঃশব্দে বিদায় নেয়। শেষপর্যন্ত সে ঐতিহ্যের কাছেই আত্মসমর্পণ করে।

লীলার মৃত্যুর জন্য অপূ রক্ষণশীল সমাজকেই দায়ী করে। সব দিক থেকে একা হয়ে অপূ ছেলের ভবিষ্যতের দিকে মনোনিবেশ করে। কাজলও পড়াশুনার প্রতি গভীর আগ্রহী।



কাজল সময় পেলেই অপুকে নানা বিষয়ে প্রশ্ন করে। বিভাবরী পত্রিকার নাম শুনেই ‘বিভাবরী’ সম্পর্কে জানতে চায়। অপুও কেনা বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকাগুলি কাজল হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করে দেখে। জানা-অজানা সব বিষয়ই কাজল নিজের দখলে কিংবা আয়ত্রে রাখতে চায়। অপুও কলকাতার পুরানো বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে মেলামেশা করে। পুরনো দিনের স্কুল ঘরগুলি দেখে সে আনন্দ পায়। নিশ্চিন্দীপুরবাসী জ্যাঠাইমা ও লীলাকে দেখে খুশী হয়। অতীতদিনের স্মৃতি অপু রোমন্থন করে।

আবার কলকাতায় থাকা অবস্থায় বাল্যবন্ধু সদ্যমৃত লীলার মায়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য অপু তাদের বাড়িতে যায়। সেখানে লীলার মেয়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কথাবার্তা হয়। কথাপ্রসঙ্গে অপু বলে —

“লেখাপড়া শিখুক, বিয়ে নাই বা হ’ল, তাতে কি?” ৫৩

সে সময়ে স্ত্রীশিক্ষা সমগ্র দেশে আলোড়নের সৃষ্টি করে। তবে একথাও সত্য, সে সময়ে স্ত্রীশিক্ষা বিরোধী লোকের সংখ্যাও কম ছিল না। এদের বিরোধিতাকে উপেক্ষা করে লীলা আধুনিক জীবন-যাপন করে। বর্তমানে তার অনাথ নাবালিকা মেয়েও সেই একই পথের যাত্রী। বরং লীলার চেয়ে তার মেয়ে আরও একধাপ এগিয়ে রয়েছে। অপুও মনে মনে পুত্র কাজলের সঙ্গে এই মেয়েটির বিয়ের পরিকল্পনা করে রাখে। অপু কিংবা লীলার চেয়ে তাদের পরবর্তী প্রজন্ম আরও আধুনিক। বিশেষতঃ সে সময়ে সংস্কারকরা নারীশিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। শ্রীমত চ্যাটার্জি “The Reformer” পত্রিকায় “On Female Education” সম্পর্কে বলেন

“Education is a thing which makes man certainly happy

and guides him through the path of virtue and happiness.”<sup>৫৪</sup>

শিক্ষাই মানুষের মনকে নিত্য-নতুন পথের যাত্রী করেছে। আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠার আগে নারী মুক্ত জায়গায় মুক্ত মনে গান গাওয়ার সুযোগ পায়নি। কোনও এক অনুষ্ঠানে অপু নারীর কণ্ঠে গান শুনে আনন্দিত হয়। কিছু মানুষ ঐতিহ্যকে গর্ব সহকারে আঁকড়িয়ে ধরে। বদ্ধ সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে এসব লোকের বসবাস। কিন্তু অপু এই সমাজ থেকে অনেক দূরে থাকে। অপু -

“এই বদ্ধজল, পঙ্কিল, পচা পানা পুকুরের মত গতিহীন, প্রাণহীন,

ক্ষুদ্র জীবনের কথা ভাবিলেও তাহার গা কেমন করিয়া উঠে !”<sup>৫৫</sup>

এমনকি কাজলকে ইট-সিমেন্টের বদ্ধ ঘরে রাখার জন্যে অপু নিজেকে দোষী বলে মনে করে। কাজলকে মুক্ত বাতাসে, মুক্ত জীবনে বড় করতে চায়। শেষপর্যন্ত কাজলকে নিয়ে নিশ্চিন্দিপুরের পিতৃভূমিতে যাওয়ার বন্দোবস্ত করে।

নিশ্চিন্দিপুরে যাওয়ার মুহূর্তে অপু মনে পড়ে, একদিন বাবা হরিহরের হাত ধরে যে স্থান ছেড়ে এসেছিল, সেই জায়গায় কি আবার যেতে পারবে। শৈশবের স্বপ্নলোকের কথা আজকাল এতো তার মনে নেই। জন্মভূমি যেন আজ ‘অনতিস্পষ্ট সুখস্মৃতি মাত্র’। ঔপনিবেশিক শক্তি গ্রাম-বাংলার অর্থনৈতিক-সামাজিক বনিয়াদ ধ্বংস করার মুহূর্তেই অপু কলকাতায় আসে। দীর্ঘ চব্বিশ বছর পর পুত্র কাজলকে সঙ্গে নিয়ে আবার পিতৃভূমিতে অপু উপস্থিত হবে। নিশ্চিন্দিপুর গ্রামের পূর্ব পরিবেশ আর নেই। গ্রামের পরিকাঠামোর অনেক অদল-বদল ঘটে গিয়েছে। লেখকের ভাষায় বলা যায় -

“বাজারেরও চেহারা অনেক বদল হইয়া গিয়াছে। তেইশ বছর আগে  
এক কোঠাবাড়ি ছিল না। ..... মোটরবাস ও ট্যাক্সির দরুণ ভাড়াটিয়া  
গরুর গাড়ি আজকাল নাকি এদেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছে।” ৫৬

গ্রাঘাট উন্নতি হওয়ার মধ্যদিয়ে গ্রাম্য সমাজ ব্যবস্থায় নগর জীবনের ছোঁয়া লাগে। তবে এই  
বর্তির মূলে রয়েছে ঔপনিবেশিক শক্তির শাসন ও শোষণ করার এক গভীর প্রক্রিয়া।

যে বয়সে অপু পিতার হাত ধরে চড়ক পুজোর পরদিনই নিশ্চিন্দীপুর গ্রাম ছেড়ে  
হরের দিকে অভিযাত্রা করে ; পুত্র কাজলের সেই বয়সেই অপু আবার গ্রামে ফিরে আসে।  
কাজলকে নিয়ে সন্ধ্যার কিছু পূর্বে সোনাডাঙার মাঠে পৌঁছেই অপুর মনে পড়ে ঠাকুরপুকুর,  
গাঙাড়ে বট গাছটির সঙ্গে পূর্বপুরুষের অতীতদিনের কথা। অপুর মনে হয় —

“শৈশবের গ্রামখানাতে ফিরে এসে জীবনের এই সৌন্দর্য রূপটাই শুধু  
চোখে দেখছি। এতদিনের জীবনটা একচমকে দেখবার এমন সুযোগ  
আর হয়নি কখনও।” ৫৭

অপু গ্রামে উপস্থিত হয়ে দেখতে পায়, ভুবনবাবুর বাড়ির বিশাল ঐতিহ্যমণ্ডিত চণ্ডীমণ্ডপ আজ  
ধ্বংসস্তূপে পরিণত। এই ধ্বংসের মধ্যে রয়েছে এক প্রতীকী তাৎপর্য। যাকে আমরা বলতে  
পারি, চণ্ডীমণ্ডপ ধ্বংসের মধ্যে রয়েছে গ্রাম্য সমাজব্যবস্থার ধ্বংসের প্রতিচ্ছবি।

গ্রামে অনুষ্ঠিত চড়ক পুজোর ঐতিহ্যমণ্ডিত পরিবেশ এখন আর নেই। লেখকের ভাষায়  
লা যায় —

“আর তেমন জাঁকজমক হয় না, চড়ক গাছ পুঁতিয়া কেহ ঘুরপাক  
খায় না।” ৫৮

ধু নামমাত্র মেলা অনুষ্ঠিত হয়। নামমাত্র মেলাতেও ছেলেমেয়েরা আনন্দস্ফূর্তি করে বেড়ায়।

গজলও মেলা দেখে আনন্দ পায়। এসব পর্যবেক্ষণ করে অপু ভাবে -

“পাকা বটফলের গন্ধে কতকাল পরে তাহার সেই অত্যন্ত শৈশবের

একটা সন্ধ্যা আবার ফিরিয়া আসিয়াছিল সেদিন।” ৫৯

বিভিন্ন গাছ, ফল, ফুলের গন্ধের মধ্যে অপু অতীতের নানা ঘটনার মুখোমুখি হয়। বিশেষতঃ

মায়ের কত রাত্রে আদরের ডাক, দিদির কত কথা, বাবার পদাবলী গাছের সুর’ এসব অপু

মনে পায়। মনে মনে অপু ভাবে হয়তো একদিন বাংলা ভাষা লুপ্ত হয়ে যাবে। ইংরেজ

সাম্রাজ্যের কথা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত হবে। গড়ে উঠবে এক নতুন ধরনের ভাষা।

II আধুনিক যুগের মানুষের মনের ভাব আদান প্রদানের মাধ্যম হয়ে উঠবে।

আগেই বলা হয়েছে, ঔপনিবেশিক শক্তির হস্তক্ষেপে গ্রাম বাংলার রাজনৈতিক, সামাজিক,

অর্থনৈতিক ভিত্তি নড়বড়ে হয়ে ওঠে। এর সঙ্গে সাহিত্য-সংস্কৃতির কাঠামোগত পরিবর্তনও

ঘটে। লক্ষণীয় ব্যাপার, এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে মানুষের মানসিকতারও

পরিবর্তন ঘটে। অপুও আধুনিক শহর কলকাতায় থেকে সেখানকার পরিবেশে অভ্যস্ত হয়ে

উঠেছে। ফলে খুব স্বাভাবিক ভাবেই নিশ্চিন্দিপুরের পূর্ব আনন্দ সে আর এখন পায় না।

তাছাড়া নিশ্চিন্দিপুরের জনসমাজ পুরোপুরি শহরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার সুবিধা পায়নি।

তাই তারা পুরোপুরি আধুনিকতাকে রপ্ত করতে পারেনি। তারা আত্মবিশ্লেষণও শেখেনি।

কুয়োঁর ব্যাঙের মতই জীবনধারণ করতে শিখেছে। লেখকের ভাষায় বলা যায় -

“এখন সে তুলনা করিতে শিখিয়াছে, সমালোচনা করিতে শিখিয়াছে ...

এই পঁচিশ বৎসরে গ্রাম ছাড়িয়া অনেকেই কোথাও যায় নাই ... তাহাই

হইয়াছে তাদের কাল।” ৬০

ইছাড়াও অপূর বাল্যসঙ্গীদের মধ্যে অনেকেই গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছে। আবার অনেকেই দুর্গালোকে পাড়ি দিয়েছে।

কাজলকে রাণুদির কাছে রেখে অপূ কলকাতায় ঘুরে-ফিরে আবার নিশ্চিন্দিপুর্নে ফিরে আসে। গ্রামে এসে অপূর মনে হয় –

“..... ঘন সুঁড়ি পথের দূরপারে শৈশবসঙ্গিনী দিদির ডাক যেন শূন্য যায়।” ৬১

আবার সঙ্গে গ্রাম ছেড়ে চলে যাবার সময় অপূ দিদি দুর্গাকে উদ্দেশ্য করে বলে ‘আমি যাইনি দিদি, আমি তোকে ভুলিনি’ সত্যিই অপূ ভুলেনি। তাই দীর্ঘদিন পরেও পুত্র কাজলকে নিয়ে পড়াভিটেতে বাস করার জন্য আসে। সে মনে করে দিদি দুর্গা হয়তো এতে শান্তি পাবে। যদিও পূর্বের নিশ্চিন্দিপূর ও তার পরিবেশ এখন আর নেই। গ্রামের ছেলে-মেয়েরা এখন এরোপ্লেনের নাম কিংবা দেখতেও পায়। এমনকি ইছামতী নদী তীরবর্তী গ্রামের প্রাকৃতিক দৃশ্যেরও পরিবর্তন ঘটে। অপূর মুখ দিয়ে লেখক আমাদেরকে জানান –

“..... আজকাল সেখানে সাঁইবাবুলার বন, ছেলেবেলার সে গাছটা আর চিনিয়া লওয়া যায় না।” ৬২

অপূর এই ভাবনা ও দেখা আধুনিক চিন্তা প্রসূত।

দীর্ঘদিন পূর্বে সর্বজয়ার লুকিয়ে রাখা সোনার সিঁদুর কৌটেটি অপূ খুঁজে বের করে। কৌটেটি ফিরে পেয়ে অপূ অতীত স্মৃতিকে রোমন্থন করে। সে কাজলকে কোনও বন্ধতার মধ্যে আবদ্ধ করে রাখতে চায় না। তাই অপূ রাণুদিকে বলে –

“কোনোদিকেই গোঁড়ামি ভাল নয় — তা ওর ওপর চাপাতে যাওয়ারও  
দরকার নেই। যা বোঝে বুঝুক, সেই ভাল।” ৬৩

এই কয়েক বছরে অপু জীবনের অনেক কিছু হারিয়ে ফেললেও যেন মনে হয় তার জীবনের  
আবাহিকতা এখনও বজায় রয়েছে। কলকাতার উপনিবেশ তথা আধুনিক ঔপনিবেশিক  
পরিসর থেকে পুত্র কাজলকে সঙ্গে নিয়ে অপু নিশ্চিন্দিপুরের প্রকৃতি সন্দর্শনে যায়। তার  
মাধ্যমে গ্রামেও আধুনিক জীবনযাত্রার আভাস সঞ্চারিত হয়। নগরকেন্দ্রিক জীবন যাত্রার বার্তা  
পৌছায়। এতে একদিকে ধরা পড়েছে লেখকের ঐতিহ্যের প্রতি টান; অন্যদিকে সূচিত হয়েছে  
গ্রামেও আধুনিক চেতনার উত্তরণ। বস্তুত এই উপন্যাস দুটিতে (পথের পাঁচালী ও অপরাজিত)  
স্বায়ক অপূর মানসিকতার ঔপনিবেশিক পরিসর থেকে আধুনিকতায় উত্তরণের প্রতিচ্ছবি লক্ষ  
প্রা যায়। আর এটা শুধু অপূর মানসিকতার উত্তরণ নয়, এটা হল ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণের  
মানসিকতার উত্তরণ।

## উল্লেখ পঞ্জি —

- ১। গোলাম মুরশিদ : হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি, ২০০৬ (পুনর্মুদ্রণ),  
নয়া উদ্যোগ, কলিকাতা, পৃঃ ৯৮-৯৯।
- ২। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : 'অপরাজিত' উপন্যাস (২য় খণ্ড), গ্রন্থের ভূমিকা অংশ  
থেকে উদ্ধৃত, ১৪০২, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স,  
পৃঃ ৬১৯।
- ৩। ড. অসিত কুমার দত্ত : ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নবজাগরণ ও রবীন্দ্রনাথ,  
প্রথম প্রকাশ- ১৯৯৭, পুনশ্চ, কল-৯, পৃঃ ২৮।
- ৪। 'তদেব' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত : পৃঃ ৩২।
- ৫। সুতপা ভট্টাচার্য (সংকলন ও সম্পাদনা): 'বাঙালি মেয়ের ভাবনামূলক গদ্য' গ্রন্থ  
থেকে উদ্ধৃত, ২০০৩, সাহিত্য অকাদেমি, কল - ৬০,  
পৃঃ ১৯৬।
- ৬। তদেব : পৃঃ ১৯২।
- ৭। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৪।
- ৮। স্বপন বসু : বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস, তৃতীয় সং, ২০০৩, পুস্তক  
বিপণি, কল-৯, পৃঃ ১১০।
- ৯। গোলাম মুরশিদ : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২৪৩।
- ১০। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৪।

- ১। ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় (অনুবাদক) : স্বাধীনতা সংগ্রাম, ২০০০, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট,  
নয়া দিল্লী-১৬, পৃঃ ২৩।
- ২। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৭।
- ৩। তদেব : পৃঃ ৮।
- ৪। গোলাম মুরশিদ : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২৫২।
- ৫। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১৩।
- ৬। তদেব : পৃঃ ১২।
- ৭। তদেব : পৃঃ ২২।
- ৮। তদেব : পৃঃ ২০।
- ৯। তদেব : পৃঃ ৩৫।
- ১০। তদেব : পৃঃ ২০।
- ১১। তদেব : পৃঃ ৪৮।
- ১২। তদেব : পৃঃ ৪৮।
- ১৩। রাজনারায়ণ বসু : সেকাল ও একাল, পৃঃ ৬৪-৬৫।
- ১৪। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৫৬।
- ১৫। সমরেন্দ্র কুমার জানা : আধুনিক যুগদৃষ্টিতে শরৎসাহিত্যের সমস্যাাবলী, ১৯৮২,  
পুষ্টিপত্র, কল-৯, পৃঃ ২২৯।
- ১৬। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৬৫।
- ১৭। তদেব : পৃঃ ৬৭।



- ২৮। তদেব : পৃঃ ৭৮।
- ২৯। তদেব : পৃঃ ৭২।
- ৩০। অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদক): 'শতবর্ষের আলোকে বিভূতিভূষণ' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত,  
১৯৯৬, উথক প্রকাশনী, কল-৬০, পৃঃ ৪২৫।
- ৩১। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৮৯।
- ৩২। অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদক): পূর্বোক্ত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, পৃঃ ৪২৫।
- ৩৩। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৯২।
- ৩৪। তদেব : পৃঃ ৯৬।
- ৩৫। তদেব : পৃঃ ১০২।
- ৩৬। তদেব : ~~অরুণ~~, পৃঃ ১০৪।
- ৩৭। অরুণ সেন (সম্পাদক): বিভূতিভূষণ : আধুনিক জিজ্ঞাসা, ২০০৩, সাহিত্য  
অকাদেমী, জীবনতারা, কল-৫৩, পৃঃ ৫৪।
- ৩৮। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : তদেব, পৃঃ ১২৪।
- ৩৯। তদেব : পৃঃ ১২৫।
- ৪০। নরহরি কবিরাজ : স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা, ১৯৯৯, মনীষা, কল-৭৩,  
পৃঃ ১১২।
- ৪১। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১৩৭।
- ৪২। গোলাম মুরশিদ : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২৫৬।
- ৪৩। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১৪৮।

|     |                              |   |                                                                                                |
|-----|------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ৪।  | তদেব                         | : | পৃঃ ১৭১।                                                                                       |
| ৫।  | তদেব                         | : | পৃঃ ১৫৩।                                                                                       |
| ৬।  | তদেব                         | : | পৃঃ ১৭৮।                                                                                       |
| ৭।  | তদেব                         | : | পৃঃ ১৭৭।                                                                                       |
| ৮।  | ভূদেব চৌধুরী :               |   | বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (২য় পর্যায়), ১৯৬৪,<br>বুঃ প্রাঃ লিঃ, কল-৬, পৃঃ ৮২।                    |
| ৯।  | বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : |   | পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১৯৩।                                                                     |
| ১০। | তদেব                         | : | পৃঃ ১৯৩।                                                                                       |
| ১১। | তদেব                         | : | পৃঃ ১৯৩।                                                                                       |
| ১২। | গোলাম মুরশিদ                 | : | পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২৫৭।                                                                     |
| ১৩। | বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : |   | পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২৩৩।                                                                     |
| ১৪। | স্বপন বসু :                  |   | ‘বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস’ গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, তৃতীয়<br>সং, ২০০৩, পুস্তক বিপণি, কল-৯, পৃঃ ২৯৬। |
| ১৫। | বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : |   | পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২৪৫।                                                                     |
| ১৬। | তদেব                         | : | পৃঃ ২৪৭।                                                                                       |
| ১৭। | তদেব                         | : | পৃঃ ২৫৮।                                                                                       |
| ১৮। | তদেব                         | : | পৃঃ ২৪৮।                                                                                       |
| ১৯। | তদেব                         | : | পৃঃ ২৫৩।                                                                                       |
| ২০। | তদেব                         | : | পৃঃ ২৫৫।                                                                                       |

|    |      |   |          |
|----|------|---|----------|
| ১। | তদেব | : | পৃঃ ২৫৭। |
| ২। | তদেব | : | পৃঃ ২৬২। |
| ৩। | তদেব | : | পৃঃ ২৬৫। |

## তৃতীয় অধ্যায়

### ঐতিহ্য থেকে আধুনিক চেতনার দিকে অভিযাত্রা

ঐতিহ্য থেকে আধুনিক চেতনার দিকে অভিযাত্রা - এই পর্যায়ের উপন্যাসগুলো হল 'ষ্টিপ্রদীপ', 'কেদাররাজা', 'ইছামতী'। ঐতিহ্য এবং আধুনিক চেতনা সম্পর্কে একটু আলোকপাত করে এই পর্যায়ের উপন্যাসগুলো নিয়ে স্বতন্ত্র ভাবে আলোচনা করা যাক।

ঐতিহ্যানুসারে বর্ণ-জাতি-ধর্মের উপর হিন্দু সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত। এই ত্রয়ের নিয়মানুসারে প্রাচীনকাল থেকে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় সামাজিক স্তরবিন্যাসের শীর্ষাসনে বসে সামাজিক প্রতিপত্তি ভোগ করে আসছে। যজ্ঞ-যাজন-অধ্যাপন ছিল ব্রাহ্মণদের বংশগত বৃত্তি। তেমনি বর্ণ-ধর্মের অনুশাসনগুলিকে তর্জমা করে লৌকিক সমাজ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পৌঁছে দেওয়াও ছিল অন্যতম কর্তব্য। কর্মানুসারে গঠিত ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য ও শূদ্র এই চার বর্ণের প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব বর্ণগত বৃত্তি জন্মগতভাবে স্থির থাকত এবং বৃত্তি অনুসারে কাজ করার অধিকার ভোগ করত। বর্ণানুসারে নিম্নবর্ণ হল শূদ্র এবং তাদের প্রধান কাজই হল উচ্চবর্ণের সেবা করা। শুধু উচ্চবর্ণের সেবা করা নয় ; তাদের উপর সেসময়ে সামাজিক অত্যাচার ও শোষণ ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। এই ব্যাপকতার জন্যেই হাজার হাজার ব্যক্তি অন্যধর্মে দীক্ষিত হয়। ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা জাতিভেদ প্রথার মূলে আঘাত করার জন্য সেদিন বেদ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বৈষম্যপূর্ণ অনুশাসনকে অস্বীকার করতে চেয়েছিল। সময়ানুসারে অনার্য এবং অন্যান্য জাতি-উপজাতিরা আর্য সমাজের অঙ্গীভূত হয়ে বিভিন্ন ধরনের বর্ণসংকর সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ঘটে।

প্রত্যেক জাতিই নিজ-নিজ আচার-অনুষ্ঠান, বংশগত বৃত্তি এবং নানা প্রথাকে মেনে চলত। তারা এসব প্রথাকে জন্মগত অধিকার বলে স্বীকার করে নিত এবং তা মেনে চলতে বাধ্য থাকত। বংশগত কাজ, নিজবর্ণে বিয়ে করা, সাধারণভাবে নিজ জাতের মধ্যে বসবাস করা এবং সামাজিক আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে নিজ জাতের অনুশাসনগুলিকে মেনে চলত। বিভিন্ন প্রকার উপর ভিত্তি করে প্রত্যেক জাতি নানা বর্ণ-জাতি অধ্যুষিত সমাজের মধ্যে তার নিজস্ব পরিসরযুক্ত জগৎ গড়ে তুলত। তাই আজও দেখা যায়, গ্রামে গৃহবিন্যাসের ক্ষেত্রে এক একটি পাড়ায় এক এক সম্প্রদায়ের ঘর-বাড়ি উঠেছে। সাধারণতঃ উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের কাছে নিম্ন বংশোদ্ভূত মানুষ অস্পৃশ্য হয়ে ওঠে। এসব জাতির উপর ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের উপনিবেশ স্থাপন করা কিংবা শোষণ ও শাসন করা একটি প্রথা হয়ে দাঁড়ায়।

জাতিভিত্তিক সামাজিক স্তরবিন্যাসের আদর্শগত ভিত্তিটিকে কর্মফলবাদ ও জন্মান্তরবাদ আরও শক্ত করে তুলে। মানুষ নিজ কর্ম অনুসারে কিংবা কৃতকর্মের ফল অনুসারে পরজন্মে কোন্ বর্ণে স্থান পাবে তা নির্ধারিত হয় বলে ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজের বিশ্বাস। তাদের মতে, ভাল কাজ করলে উচ্চবর্ণে এবং খারাপ কাজ করলে নিম্নবর্ণে স্থান পায়। এছাড়াও কোনও ব্যক্তি নিজের জাতের সংস্কার ও অনুশাসন না মেনে চললে তার শাস্তি স্বরূপ সে নিম্নবর্ণে জন্মগ্রহণ করবে এবং অত্যন্ত দুঃখের মধ্য দিয়ে তার জীবন অতিবাহিত হবে। বর্ণবাদের সুযোগ নিয়ে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় কায়িক পরিশ্রম থেকে দূরে থাকে। তবে জাতিগত স্তরবিন্যাসের পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে অপরিবর্তনীয় ছিল না। নিম্নবর্ণের ধনী লোকেরা জাতিবিন্যস্ত সমাজের মধ্যবর্তী স্তরে উন্নীত হওয়ার চেষ্টা করে এবং স্ব-গোত্রীয় আচার-আচরণ ত্যাগ করে কিংবা নিজ পদবী পরিবর্তন করে এবং অন্ত্যজ ঘরে মেয়ে বিয়ে দিতে অস্বীকার করে। এই শ্রেণীর মানুষ মধ্যস্তরে

উন্নীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চশ্রেণীকে অনুকরণ করত এবং তারাই আবার নিচু শ্রেণীর অন্যান্য মানুষের উপর রক্ষণশীল মানসিকতা নিয়ে সামাজিক বৈষম্যমূলক আচরণ করত। এসব আচরণের ফলে বর্ণভেদ প্রথার গোঁড়ামি আরও শক্তপোক্ত হয় এবং বিভিন্ন উচ্চবর্ণের মানুষের প্রধান্য বাড়তে থাকে। ফলস্বরূপ ব্রাহ্মণরাই সমাজের হর্তা-কর্তা-বিধাতা স্বরূপ উপস্থিত হয় এবং এই সম্প্রদায়ই গ্রামাঞ্চলে অন্যান্য বর্ণের ধনীলোকের সঙ্গে মিলিত হয়ে নিম্নবর্ণের মানুষের উপর প্রভুত্ব কায়েম করে।

ঔপনিবেশিক শাসনকালের প্রথমদিকে ঔপনিবেশিক শক্তি বাংলাদেশের তথা ভারতবর্ষের অনাচে-কানাচে নিজেদের শাসন ব্যবস্থাকে পাকাপোক্ত করার জন্য যে নিয়মনীতি অনুসরণ করে, এতে হিন্দু সমাজে প্রচলিত গোঁড়ামি, বর্ণভেদ ও উচ্চবর্ণের রক্ষণশীল মনোভাব আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এই সময়ে দেশীয় ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চার উপর গুরুত্ব আরোপ করাই ছিল ঔপনিবেশিক শক্তির শিক্ষানীতির প্রধান অঙ্গ। এভাবে শাসকদলের সমর্থন লাভ করে গ্রাম-বাংলার ও শহর অঞ্চলের রক্ষণশীল দিকটি আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তবে ইংরেজি তথা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের চাপে ও ইউরোপীয় প্রগতিবাদী বুদ্ধিজীবীদের প্রভাবে ভারতে অবস্থানরত ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী কিছু কিছু সমাজ সংস্কারমূলক আইন চালু করলেও হিন্দু সমাজের রক্ষণশীল কাঠামোতে মোক্ষম আঘাত হানতে পারেনি।

তবে প্রশাসনিক পরিসরের বাইরে সমাজের বৃহত্তর অংশে কিছু অর্থনৈতিক, সামাজিক পট পরিবর্তনের ফলে বর্ণবাদী রক্ষণশীল সমাজ কাঠামোতে কিছুটা হলেও ফাটল ধরতে শুরু করে। বর্ণবাদী সমাজ ব্যবস্থাও কিছুটা ওলট-পালট হয়। অন্যদিকে রেল-সড়কের উন্নতির ফলে গ্রাম ও শহরের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং সামাজিক সচ্ছলতাও বৃদ্ধি

পায়। ঔপনিবেশিক অর্থনীতি বাজারসর্বস্ব হওয়ার ফলে আদান-প্রদানের মাধ্যম হয় টাকা-পয়সা। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে উৎপন্ন কৃষিজাত দ্রব্যের বহির্বাণিজ্যিক চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং বাণিজ্যিক ফসল উৎপাদন করে অনেকে বিস্তারিত হয়ে ওঠে। যোগাযোগ ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরে, সরকারি প্রশাসনিক মেশিনে ও আংশিক শিল্পায়নের ফলে নতুন করে গড়ে ওঠা শিল্পপ্রতিষ্ঠান, খনি, চা-বাগানে গ্রাম থেকে উৎখাত হওয়া জমিহারা নিঃসহায় মানুষ চাকুরি গ্রহণ করতে থাকে। পূর্বের কুলগত বৃত্তি ও বংশগত মান-মর্যাদাই ছিল জাতিভেদ প্রথার মূল ভিত্তি। কিন্তু সামাজিক স্থিতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ঐতিহ্যগত পরিধি বিনির্মিত হয় এবং অনেকেই আধুনিক বৃত্তিগুলি গ্রহণ করতে আরম্ভ করে। ফলস্বরূপ বিভিন্ন বর্ণের সংমিশ্রণে উচ্চ-মধ্য, মধ্য-মধ্য ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণী সামাজিকভাবে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এই নব্য শ্রেণীর মানুষ ধীরে ধীরে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার প্রতি ঝুঁকে পড়ে। তবে ঝুঁকে পড়লেও তারা সম্পূর্ণরূপে আধুনিকতাকে আত্মস্থ করতে পারেনি। এখানে বিশিষ্ট সমালোচক ড. তপোধীর ভট্টাচার্যের একটি মন্তব্য উল্লেখনীয় -

“একদিকে মধ্যবিত্ত বর্ণের মধ্যে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার প্রতি আনুগত্যময় সংলগ্নতা বাড়ছে এবং ফলে ঐতিহ্যের সঙ্গে বিচ্ছেদ ক্রমাগত বেড়ে চলেছে আর অন্যদিকে তারই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে অনন্যর ও পরনির্ভরতা। উপন্যাস-বীক্ষণে সামাজিক আধুনিকতার মীমাংসাহীন কুটাম্বাসগুলি যে-পরিমাণে প্রকট হয়ে উঠেছিল, ঠিক সেই অনুপাতে নান্দনিক আধুনিকতার আদল কথাবস্তুও প্রকরণে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি।”

তবে এই সময়ে বৃত্তিগত কাঠামোর পরিবর্তনের ফলে আর্থিক জীবনের মানোন্নয়ন ও



সামাজিক মর্যাদা লাভের জন্য তীর প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়। জন্মগত স্ববৃত্তি জাতিভেদ প্রথার প্রধান ভিত্তি বলে বৃত্তিগত কাঠামোর পরিবর্তনের ফলে জাতিভেদ প্রথার ভিত্তি ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে। এভাবে নানা ধরনের ঘাত-প্রতিঘাতে আমাদের বর্ণ-জাতি-ধর্মের সনাতন সংস্কার ও মূল্যবোধগুলির সঙ্গে আধুনিক মূল্যবোধের সংঘাত শুরু হয়। এই সংঘাতেই আমাদের চিরকালীন ঐতিহ্যের পরিসর বিনির্মিত হয়ে আধুনিক পরিসরের দিকে এগিয়ে যায়। সমাজের আধুনিকতা আর সাহিত্যের আধুনিকতার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। পার্থক্য থাকলেও এই দুই সত্তার মধ্যে সম্পর্কও নিবিড়। যা-ই হোক, এদের প্রকাশের ধরন যেমন আলাদা তেমনি ক্রিয়ার ক্ষেত্রও আলাদা। আধুনিক সমাজ সাধারণতঃ আধুনিক সাহিত্যেই নিজেকে প্রকাশ করে। সমাজ রক্ষণশীল তথা ঐতিহ্যের মনোভাবে চালিত হলে সাহিত্যে আধুনিকতার সন্ধান পাওয়া যাবে না। আবার সমাজে আধুনিকতার সঞ্চার ঘটলেই সাহিত্যে ঐতিহ্যের প্রভাব পড়বেই না এমন কোনও কথা নেই। বরং বলা যায়, চিন্তায়, অনুভবে এবং কর্মে ঐতিহ্যের জের দীর্ঘকাল ধরে বাহিত থাকে। অন্যদিকে, সাহিত্যে আধুনিকতার সঞ্চার ঘটলেই বুঝতে হবে সমাজে অনিবার্যভাবেই পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে।

ঐতিহ্য ও আধুনিকতা সবসময়ই দুটো মেরুতে অবস্থিত। ঐতিহ্য হচ্ছে দীর্ঘদিন থেকে আমাদের সমাজে লালিত বিশেষতঃ পুরুষাণুক্রমে প্রাপ্ত বিভিন্ন রীতি-নীতি আজও যা পালন করে যাচ্ছে। তবে ঐতিহ্য সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বারবার বিনির্মিত হয়ে সামাজিক স্তরে ঢালু থাকে। ঐতিহ্যের মধ্যে রয়েছে ‘ধারাবাহিকতা, নিশ্চয়তা এবং স্থিতিশীলতা’। কিন্তু এর সম্পূর্ণ বিপরীত হচ্ছে আধুনিকতা। প্রতীচ্যের সংস্পর্শে এসে চিরকালীন রীতি-নীতি পুননির্মিত হয় এবং এই পুননির্মিত পরিসরকে আধুনিকতা বলা যায়। এখানে সমালোচক বোরহানউদ্দিন



খান জাহাঙ্গীর-এর একটি মন্তব্য উল্লেখনীয় —

“আধুনিকতার একটি অর্থ স্বাভাবিকতার বিরোধিতা, সমাজের বিপরীত  
তাত্ত্বিকতা। আধুনিকতা শব্দটি তৈরি হয় ধারাবাহিকতা এবং পরিবর্তন,  
ঐতিহ্য এবং উদ্ভাবন বিষয়ক ইঙ্গিতময়তা।” ২

আধুনিকতার সাধারণ পরিসর থেকে বিভূতিভূষণের উপন্যাসের আধুনিকতার পরিসর  
একটু আলাদা। বিভূতিভূষণ সমাজের গণ্ডি কিংবা ঐতিহ্য থেকে মুক্ত থাকার জন্য বারবার  
প্রকৃতির কাছে আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি প্রকৃতিকে উপন্যাসের উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেছেন।  
প্রকৃতিকেই আধুনিক দৃষ্টিতে দেখেছেন। উপন্যাসে প্রকৃতির ব্যবহার সম্পর্কে সমালোচক  
প্রমথনাথ বিন্দী বলেছেন —

“প্রকৃতিকে জীবনের উপাদানরূপে গ্রহণ ও স্বীকার নতুন যুগের  
লক্ষণ, সে নতুন যুগ এখনও পুরাতন হয় নাই। পশ্চিমের হাত হইতে  
রবীন্দ্রনাথ ইহা গ্রহণ করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের হাত হইতে রবীন্দ্রোত্তরগণ  
গ্রহণ করিয়াছেন, রবীন্দ্রোত্তর কথাশিল্পীদের মধ্যে বিভূতিভূষণ সবচেয়ে  
অধিক পরিমাণে গ্রহণ করিয়াছেন। এখানেই বিভূতিবাবুর রচনায়  
নতুনত্ব, দেশ-কালের চিহ্ন। এই উপাদানটি সবচেয়ে বেশি আধুনিক।” ৩

উপনিবেশ শাসিত বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতিতে ইউরোপীয় নবজাগরণের ঢেউ  
এ তো সহজ সরলভাবে প্রবেশ করতে পারেনি। বস্তুত নবজাগরণের ঢেউ বাংলাদেশে আহুড়ে  
পড়লেও বাঙালি মানসিকতায় তখনও ঐতিহ্য আর আধুনিকতার দ্বন্দ্ব ছিল। এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব  
বিভূতিভূষণের সাহিত্যে যেমন প্রতিফলিত হয়েছে তেমনি তা থেকে উত্তরণের ছবিও দেখা

যায়। এখানে বিশিষ্ট তাত্ত্বিক তথা সমালোচক ড. তপোধীর ভট্টাচার্যের একটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য

“তার বিশ্ববীক্ষায় প্রকৃতিও জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ; ফলে ইতিহাসের  
ভিত্তিভূমি হিসেবে দ্বন্দ্বময় বাস্তব এবং বিশেষভাবে বর্ণ-বর্ণ-লিঙ্গ  
বিভাজিত সমাজের বিভিন্ন অনুপুঙ্খ কিংবা ঔপনিবেশিক শোষণের  
তীব্রতা ঝাপসা হয়ে পড়ে।”<sup>৪</sup>

আমাদের মানসিকতায় যুগ যুগ ধরে যেসব রীতি-নীতি প্রচলিত রয়েছে সেসব রীতি-নীতি  
নানাধরনের ঘাত-প্রতিঘাতের তথা বিনির্মাণের মধ্য দিয়ে আজও কম-বেশি আমাদের মানসিকতায়  
লালিত রয়েছে। তবে এ সব রীতি-নীতি তথা ঐতিহ্য বারবার ভেঙে পুনর্নির্মিত হয়ে নানাধরনের  
সমিধ সংগ্রহ করে নতুন পথে এগিয়ে যায়। এই এগিয়ে যাওয়ার স্পষ্ট ছবি আমরা দেখতে  
পাই এই পর্যায়ের উপন্যাসগুলির মধ্যে।

‘দৃষ্টিপ্রদীপ’ বিভূতিভূষণের রচিত অন্যান্য শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের মধ্যে একটি বিশেষ স্থান  
দখল করতে সক্ষম। উপন্যাসটির নায়ক জিতুর মধ্যদিয়ে ঔপন্যাসিক নিজের মানসিকতাকে  
পাঠক সমাজের সামনে তুলে ধরেছেন। উপন্যাসটির প্রথমেই দেখা যায়, গ্রাম-বাংলার যৌথ  
পরিবারের সমাজচিত্র। যে সমাজ ছিল সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় আবদ্ধ। ইংরেজ শাসকদের  
সহযোগিতায় আমরা পরিচিত হই আধুনিক সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে। আধুনিক সমাজ  
আত্মপরায়ণ ও আত্মসচেতন। এই আত্মপরায়ণতার জন্যই বাংলার ঐতিহ্যগত যৌথ পরিবার  
ভাঙতে শুরু করে। যৌথ পরিবার ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই সবাই যেন আরও আত্মকেন্দ্রিক হয়ে  
ওঠে। ইংরেজ পরিচালিত চা-বাগানের প্রাক্তন কর্মচারী ভূষণবাবু সর্বস্ব হারিয়ে স্ত্রী, পুত্র-কন্যা

সহ খুড়তুতো ভাইয়ের সংসারে আশ্রয় নেন এবং সেখানে তাদের অনেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করে জীবন অতিবাহিত করতে হয়। ভাত খেতে বসলে ঘরের অন্যান্যরা যখন পেটপুরে মাছ-মাংস খায় তখন ভূষণবাবুর ছেলে-মেয়ে সীতা, জিতু ও নিতুর ভাগ্যে জুটে শুধু নামমাত্র আহার। এছাড়াও ভূষণবাবুর স্ত্রীকে অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হয় এ বাড়িতে।

প্রতীচ্যের শিক্ষা, আয়, চাকুরিতে পদমর্যাদা প্রভৃতির ভিত্তিতে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত সমাজে ব্যক্তির আর্থিক-সামাজিক মান-মর্যাদা সম্পর্কে নতুন মূল্যায়ন আরম্ভ হয়। এর ফলে যৌথ পরিবারের সনাতন জীবনাদর্শ, কর্তৃত্ব কাঠামো, দায়দায়িত্ব সম্বন্ধে প্রাচীন ধারণার সঙ্গে আধুনিক জীবনাদর্শের সংঘাত আরম্ভ হয়। এই সংঘাতের জন্য যারা যৌথ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত নর, অথচ নির্ভরশীল তাদের পরগাছা হিসেবে দেখা শুরু হয়। তবে এই ধরনের মনোভাবের মধ্যে আর্থিক কারণও রয়েছে। গোঁড়া রক্ষণশীল সমাজভুক্ত ব্যক্তির ধর্মের বাইরে জীবনের কোনও পরিসর নেই বলেই ভাবত। তবে অন্য ধর্মকে তারা ধর্ম বলে কখনও স্বীকার করত না। জিতুর জ্যাঠামশাইদের সংসার সম্পর্কে লেখক বলেছেন —

“এঁদের সংসার অত্যন্ত সান্ত্বিক গোঁড়া হিন্দুর সংসার - পূজো-আচ্চার

ব্যাপারে পান থেকে চুন খসবার জো নেই।” ৫

এধরনের পরিবারে কিংবা সমাজব্যবস্থায় নবীনদের তুলনায় বয়সে প্রবীণদের বিশেষ করে বয়ঃজ্যেষ্ঠ পুরুষ ও নারীর কর্তৃত্ব বেশি। পরিবারের সবাই প্রবীণদের মতামতকে মেনে নিতে বাধ্য থাকে। এধরনের সমাজে যৌথ পরিবারের গঠন সম্পর্কে সমালোচক সমরেন্দ্র কুমার জানা দিয়েছেন —

“সাধারণ আবাস স্থল, সাধারণ পারিবারিক সম্পত্তি, পারিবারিক

পালপার্বণ, গৃহ দেবতার পূজা ও অন্যান্য ধর্মীয় আচারকে যৌথভাবে পালন, সাধারণ রান্নাঘর বা হেন্সেল ও পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য সংক্রান্ত সাধারণ মূল্যবোধগুলির উপর ভিত্তি করে একটি আদর্শ যৌথ পরিবারের কাঠামোগত দিকটি গড়ে উঠে।”<sup>৬</sup>

এ ধরনের পরিবারে তথা সমাজে নারীজাতির বিশেষতঃ বিধবা নারীর কোনও পরিসর নেই। উনিশ শতকের সমাজ ব্যবস্থায় বিধবা বিয়ের বিধান থাকলেও সমাজে প্রচলিত ছিলনা। এমনকী বিধবা নারী সমাজের কোনও মাসুলিক কাজকর্মের অংশীদার হতে পারত না। ফলে সবধরনের মাসুলজনক কাজ থেকে তাদেরকে দূরে রাখা হত। তবে এদের মধ্যে অনেকেই বাহ্যিক শিক্ষার আলো থেকে অনেক দূরে থাকলেও অন্তরে ছিলেন আধুনিক শিক্ষার গুণ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। তাই ভুবনের মা ভুবনকে স্কুলে নিয়ে যাবার জন্য জিতুকে অনুরোধ করে বলেন

“..... এই উব্গারটুকু তোমাকে করতে হবে বাবা জিতু - আমার কেউ

নেই, কাউকে বলতে পারি নে, ..... কিন্তু কি বলে যার-তার সঙ্গে

কথা কই বল তো বাবা ?”<sup>৭</sup>

একই সময়ে আর এক নারী জিতুর জ্যাঠাইমার রক্ষণশীল মনোভাবকে লেখক এভাবে তুলে ধরেন

“.....ও-সব খ্রিস্টান চাল এ বাড়িতে চলবে না বোলে দিচ্ছি, মুড়ো

বাঁটা মেয়ে বাড়ি থেকে বিদেয় করে দেবো জানো না ?”<sup>৮</sup>

পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় চিরাচরিত নিয়মের নিগড়ে আবদ্ধ নারী সত্তার মানসিক প্রতিচ্ছবি

এখানে ধরা পড়েছে দুটি নারীর মাধ্যমে। আবার এর মাধ্যমে ধরা পড়েছে প্রথানুগ ভাবনার সঙ্গে নারীর আধুনিক চেতনার বিরোধ।

জিতু সবসময়-ই গোঁড়ামির বিরুদ্ধে কথা বলত বলেই সে জ্যাঠাইমার কাছে ছিল অসহ্য। জিতুদের সমগ্র পরিবারকে জনৈক এক বয়স্ক নারী বলেন —

“ও হোঁড়ার জ্ঞান-কান্ড একেবারেই নেই - একেবারে মেলেছো-ওর

মাও তাই। হিন্দুয়ানি তো শেখেনি কোনোদিন -” \*

এসব নারীর বাকব্যয়ন আসলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজেরই বাকব্যয়ন। তারা শুধু পোষাপাখির মত পুরুষের কথা মুখ দিয়ে বলে যায়। কিন্তু সে সময়েও কিছু পুরুষের প্রচেষ্টায় নারী রক্ষণশীল গণ্ডি থেকে মুক্ত হয়ে আধুনিক শিক্ষায় মনোনিবেশ করে। এখানে উল্লেখনীয়, ২৫ জুলাই, ১৮৫৫-র মানিকতলা স্ট্রিটে অনুষ্ঠিত এক সভায় হরচন্দ্র জোরালো ভাষায় স্ত্রীশিক্ষাকে সমর্থন জানিয়ে বলেন —

“The education of the females is a duty which we owe to ourselves, and more speedily it is fulfilled it is better.” <sup>১০</sup>

সে সময়ে কিছু ইংরেজি শিক্ষিত আধুনিক রুচিসম্পন্ন পুরুষের সহযোগিতায় নারী সম্প্রদায় মুক্ত আবহাওয়ায় পাঠ্যপুস্তক তথা লেখাপড়ার সুযোগ পায়। তাই চা-বাগানের কর্মচারী ইংরেজি শিক্ষিত ও আধুনিক রুচিসম্পন্ন ভূষণবাবু নিজের স্ত্রী ও মেয়েকে আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষায় দীক্ষিত করার জন্য মিশনারীর সহযোগিতা নিতে পিছপা হননি। উপন্যাসের নায়ক জিতুর মুখ দিয়ে আমরা জানতে পারি—

“এরা মাঝে পড়ায়, সীতাকেও পড়ায়। মিস্ নটন দিনাজপুরে ছিল,

বেশ বাংলা বলতে পারে।” ১১

এই সময়ে রক্ষণশীল সম্প্রদায় ভাবত মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে তাড়াতাড়ি বিধবা হবে, সমাজ ধ্বংস হবে। তাই সীতার পড়াশুনা কিংবা শরীরচর্চা দেখে তাদের আশ্রয়দাত্রী জ্যাঠাইমা বলেন -

“ও-সব অলুক্ষণে কাণ্ড বাপু-মেয়ে-মানুষের আবার অত বই পড়ার

শখ, অত সাজগোজের ঘটা কেন ? পড়বে তেমন শাশুড়ীর হাতে,

ঝাঁটার আগায় বই পড়া ঘুচিয়ে দেবে তিন দিনে।” ১২

উনিশ শতকের প্রথমদিকে নারীশিক্ষার জোয়ার খুব জোরালোভাবে দেখা না দিলেও তাদের মনে আধুনিকতা জেগে ওঠে। সীতা মিশনারীদের সংস্পর্শ পেয়ে আত্মস্বাতন্ত্র্যবোধ ও ব্যক্তিত্ব পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। সে যা ভাল মনে করত তা-ই করত। আসলে স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার ও মেয়েদের তুলনামূলক ভাবে অধিক বয়সে বিয়ে হওয়ার কারণে নারীর মনের মধ্যে আত্মস্বাতন্ত্র্যবোধ ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ হতে থাকে। সেই সময়ে সাধারণতঃ শহর অঞ্চলকে কেন্দ্র করে আধুনিকতার যাত্রা শুরু হয়। তখন চাকুরি উপলক্ষ্যে কোনও কোনও লোককে গ্রাম থেকে শহরে গিয়ে বাস করতে হত বলেই আধুনিক জীবনের প্রভাব তাদের উপর পড়ে কিংবা আধুনিক জীবনের প্রতি তাদের আকর্ষণ বাড়তে থাকে। জ্যাঠামশাইয়ের কুটকৌশলে গ্রামের এক রক্ষণশীল পরিবারে সীতার মত আধুনিক রুচিসম্পন্ন মেয়ের বিয়ে হয়। সীতা সেখানে আগের মত শরীর চর্চা ও পড়াশুনা শুরু করে। জিতুর মুখ দিয়ে আমরা জানতে পারি -

“সীতার সে পুরোনো অভ্যাস এখনও আছে, কথা বলতে বলতে হঠাৎ

খোঁপায় হাত দিয়ে দেখে ঠিক আছে কি-না। ... এখনও সেই কতকাল

আগেকার পুরোনো বইগুলোই পড়চে, কিছুই শেখেনি, কিছুই দেখেনি।”<sup>১৩</sup>

এছাড়াও জীবন-মান সম্বন্ধে পুরানো নিয়ম কানুন ও অভ্যস্ত ধারণার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে জীবন সংগ্রামে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য পুরুষদের বেশি সময় অতিবাহিত হওয়ার ফলে তাদের বিয়ের বয়স তুলনামূলক বাড়তে থাকে। জিতুর মত আধুনিক শিক্ষিত পুরুষ সংসার জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার স্বপ্নে বিভোর থাকায় অনেক মেয়ের সংস্পর্শে এসেও বিয়ে করার সাহস পায়নি।

জিতুদের বাবা ভূষণবাবু ব্রিটিশ সাহেবদের মত সাজ-পোশাক, আচার-আচরণ করতেন। মিশনারীদের কাছ থেকে ইংরেজি শেখা, তাদের কাছে সীতার ছবি আঁকা, সেলাইয়ের কাজ শেখা, কেক বানানো, ঘীণ্ডুর বাণী পড়া - সবকিছুতেই ভূষণবাবু পরিবারের সবাইকে উৎসাহ দিতেন। সাহেবদের মত তিনি মদ-মাংসও খেতেন। ভূষণবাবু ও তার পরিবারের এসব আচার-আচরণ ভারতীয় সনাতন বিরোধী কাজ বলে গণ্য করা হয়। জিতু ছিল দ্রষ্টাচক্ষু সম্পন্ন যুবক। ফলে অদূর ভবিষ্যতে সংঘটিত হবে এমন কিছু বিষয় তার চোখে ধরা পড়ত। সংসারের গণ্ডিবদ্ধ জীবন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য জিতু মাঝে-মধ্যে মুক্ত পরিবেশের আশ্রয় নেয়। লেখকের ভাষায় বলা যায় —

“..... বাবা ম্যানেজারের বাংলোতে গিয়েছেন, সীতা ও দাদা ঘুমুচ্ছে -

— আমি কাউকে না জানিয়ে চুপিচুপি বেরিয়ে কার্ট রোড ধরে অনেক

দূরে চলে যেতাম ..... পথ ক্রমে যত নীচে নেমেচে, বন জঙ্গল ততই

ঘন, ততই অন্ধকার ..... সেই ধরনের একটা নিস্তব্ধ স্থানে একা গিয়ে

বসতাম।”<sup>১৪</sup>

এধরনের নির্জন জায়গায় বসে বসে কতদিন কতধরনের অদ্ভুত জিনিষ জিতু দেখেছে কিন্তু এসব কথা সে কাউকে বিশ্বাস করাতে পারে না। জনৈক এক নেপালি সন্ন্যাসী জিতুকে দেখে ভাগ্যবান বলে অভিহিত করেন।

প্রতীচ্যের শিক্ষা-সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে উঠতি বয়সের ছেলে-মেয়েরা শাস্ত্রবাক্য অপেক্ষা যুক্তিবাক্যকে অনুসরণ করলেন। তবে একশ্রেণীর মানুষ তাঁদের রক্ষণশীলতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেনি। তাই নিতু, জিতু ও সীতা খেলনাঘর তৈরি করার জন্য আঁস্তাকুড়ে গেলে তাদের কাকিমা বলেন —

“..... ওখানে গিয়ে জুটেছে সব ? ভাগ্যিস চোখে পড়ল! এক্ষুণি তো

ওইসব নিয়ে উঠতে এসে দোতলার দালানে ! ..... মা গো মা, মেলেছ

খ্রিস্টানের মত ব্যাভার, আঁস্তাকুড়ে ঘেঁটে খেলা হচ্ছে দ্যাখো !” ১৫

কিন্তু যুক্তিবাদী জিতুরা ভাবে —

“সামনে হাত তিন-চারেক দূরে গোটাকতক ভাঙা হাঁড়ি-কুড়ি পড়ে

আছে বটে, কিন্তু তার দরুন গোটা বনটা অপরিষ্কার কেন হবে তা

বুঝতে পারলাম না আমরা তিনজনে কেউ।” ১৬

এখানেই ফুটে ওঠে জিতুর মাধ্যমে লেখক বিভূতিভূষণের আধুনিক যুক্তিবাদী মানসিকতার পরিচয়। চাকুরি থেকে বরখাস্ত হওয়ার কিছুদিন পর ভূষণবাবু মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। তাদের সংসারে দেখা দেয় গভীর আর্থিক সংকট। জিতুর স্কুলের বেতন বাকি পড়ে, স্কুলের কেরানি রামবাবু সবার সামনে জিতুকে লজ্জা দেন। সংসারের অভাব-অনটনের কণী ভাবতে গিয়ে জিতু পূর্ব অভ্যাস মত দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পায় —



“হঠাৎ আমি অবাক হয়ে পথের ওপারে চেয়ে রইলুম – ওপারে সামু

নাপিতের মুদিখানার দোকানটা আর নেই, ..... দূরে সাদা রঙের

একটা অদ্ভুত গড়নের বাড়ি, মন্দিরও হ’তে পারে।” ১৭

বাক্তব জগতে যা সম্ভব নয়, কল্পনার মধ্যদিয়ে সে ইচ্ছাপূরণ করতে হয়। গোঁড়া রক্ষণশীল সমাজব্যবস্থায় যা সম্ভব নয়, তাকে সম্ভব করে তুলতে হলে কল্পজগতের আশ্রয় নিতে হয়। এছাড়াও জিতুর মা বাংলার সমাজব্যবস্থার বাইরে দীর্ঘকাল বসবাস করার জন্য এই সমাজের আচার-আচরণ, নিয়ম-কানুন সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল নয়। জিতু তার মা সম্পর্কে বলে –

“..... চিরকাল সমাজের বাইরে-পাড়াগাঁয়ের ব্রত-নেম পুজোআচ্চা

আচার এ-সব তেমন জানা ছিল না।” ১৮

লক্ষণীয় বিষয় চাকুরিহীন ভূষণবাবু গ্রামের বাড়িতে কয়েকদিন থাকার পর পাগল হয়ে যান। এই পাগল হওয়ার মধ্যেও একটি প্রতীকী তাৎপর্য রয়েছে। দীর্ঘদিন আধুনিক শহরে জীবনের পরিবেশে প্রতীচ্য সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত থাকার পর ভূষণবাবু আবার যখন বদ্ধ গ্রাম্য সমাজব্যবস্থায় আটকে পড়েন, তখন এই বদ্ধ সমাজব্যবস্থা তার কাছে ঈর্ষিসিত নয়। অন্ধকারাচ্ছন্ন গ্রাম্য সংস্কার থেকে মন মুক্তির পিয়াসী বলেই হয়তো লেখক তাকে মানসিক ভারসাম্যহারা করে তুলেন। তবে শেষপর্যন্ত মৃত্যুর মধ্যদিয়ে ভূষণবাবুর মুক্তি ঘটে এই রক্ষণশীল বদ্ধ সমাজব্যবস্থা থেকে।

তবে তার মৃতদেহ বিনা প্রায়শ্চিত্তে পাড়ার কেউ-ই শ্মশানে নিয়ে যেতে চাননি। কেননা পাড়া প্রতিবেশিরা ভূষণবাবুকে স্নেহ বলে জানে। ব্রাহ্মণ্যবাদী মনোভাবকে লেখক এভাবে পাঠকসমাজের সামনে তুলে ধরেন –

“প্রায়শ্চিত্ত এখন না করালে কেউ ও মড়া হোঁবে না।” ১৯

এই গোঁড়া হিন্দু সম্প্রদায় সম্পর্কে ইংরেজ মিশনারী ডব্লু. ওয়ার্ড (W. Ward) -এর একটি মন্তব্য উল্লেখনীয় —

“... if the vices of lying, deceit, and impurity can degrade a people, the Hindoos have sunk to the lowest depths of human depravity.” ২০

কিন্তু তৎকালীন সময়েও কিছু যুবক-যুবতী এধরনের সংস্কারের উর্ধ্বে ছিলেন। এই শ্রেণীর মানুষ ভূষণবাবুর মৃতদেহ সংস্কার করতে কোনধরনের দ্বিধাবোধ করেনি। ‘সতীদাহ প্রথা’ বন্ধ হওয়ার পূর্বে আমাদের সমাজে স্বামীর চিতায় স্ত্রী মৃতা হওয়াই প্রথা ছিল। কিন্তু ইউরোপীয় সংস্কৃতির প্রভাবে কিংবা তাঁদের সাহায্য-সহযোগিতায় ও বাংলার নব-সংস্কারের পথপ্রদর্শক রামমোহন রায়ের অশেষ প্রচেষ্টায় এই কুপ্রথার বিলোপ ঘটে। ঐতিহ্যানুসারে নারী পুরুষের সম্পত্তি ; নারীদের কোনও আলাদা পরিসর নেই, পুরুষরা সব সময়ই নারীকে দাসীর মত মনে করে। এখানে বিশিষ্ট সমালোচক R. Lewinson এর একটি মন্তব্য উল্লেখনীয় —

“..... it is the consequence of an unpararelled sexual slavery imposed on women by men and society.” ২১

কিন্তু প্রতীচ্যের সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রভাবে কিছুটা হলেও পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে। নারীও তার আপন সত্তার জোরে ব্যক্তিত্বময়ী হয়ে ওঠে এবং নিজ অস্তিত্বকে বুঝতে সক্ষম হয়। এখানেও লক্ষণীয় জিতুর মা বাংলার গ্রাম্য সংস্কারকে আন্তরিকভাবে মেনে নিতে পারেননি। কারণ নিজ বুদ্ধিমত্তা ও চেতনা সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন।

উনিশ শতকের শেষের দিকে নানাবর্ণের সংমিশ্রণে গড়ে ওঠা মধ্যবিত্ত শ্রেণী ধীরে ধীরে আত্মপ্রত্যয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে সমাজ-সংস্কার আন্দোলন থেকে আরম্ভ করে দেশের বিভিন্ন আন্দোলনের প্রধান শক্তিতে পরিণত হয়। বিশ শতকের অর্থনৈতিক সংকট, ক্রমবর্ধমান শিক্ষিত বেকার - এসব সমস্যা মধ্যবিত্ত সমাজ জীবনের স্বচ্ছন্দ জীবন পরিসরে ছেদ ফেলে। শহরের ন্যায় গ্রামাঞ্চলেও ভূস্বামীদের আমলা গোষ্ঠী, গোমস্তা, সামান্য জমির মালিক প্রভৃতিকে নিয়ে গড়ে ওঠে গ্রামীণ মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি অংশ জমিদারের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে চাষীর জায়গা-জমি আত্মসাৎ করতে থাকে এবং নানাভাবে তাদেরকে শোষণ ও অত্যাচার চালিয়ে যায়। ভূষণবাবুর খুড়তুতো ভাইয়েরা হলেন এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি। তারা ভুবনের মায়ের জমি, হীরা ঠাকুরের সম্পত্তি নানা অজুহাতে নিজেদের করায়ত্ত করে নেয়। অন্যদিকে দারিদ্র্যক্লিষ্ট গ্রামীণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষেরা চাকুরির সন্ধানে শহর বাংলার নানাস্থানে ভাগ্যান্বেষণে বেরিয়ে পড়েন। এমনকী জিতুর দাদাও সংসার চালানোর জন্য ব্যবসার নেমে অকৃতকার্য হয়ে শেষপর্যন্ত চাকুরির সন্ধানে দূর-বিদেশে বের হয়ে পড়ে।

একদিকে সংসারের অভাব-অনটন অন্যদিকে লেখা-পড়ার ইচ্ছে—এই দুইয়ের দ্বন্দ্বকে সঙ্গী করে জিতু পড়াশুনা চালিয়ে যায়। তবে তার পড়াশুনার পেছনে অনেকেরই অবদান রয়েছে। সে ছোটবেলা থেকে মিশনারীদের সংস্পর্শে থাকায় হিন্দুদের দেব-দেবীর চেয়ে খ্রীষ্টের বাণী কিংবা ছবিকে ভালবাসে। জ্যাঠাইমাদের পূজো-অর্চনার চেয়ে সে কৃষ্ণদাসের ‘চৈতন্যচরিতামৃত’কে হিন্দুসমাজের উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় গ্রন্থ বলে মনে করে। সর্বধর্ম, সর্বজাতি, সর্ববর্ণের একত্রীকরণেই হচ্ছে চৈতন্যদেবের মূলমন্ত্র - যা খ্রীষ্টের বাণীর সমতুল্য। এমনকী জ্যাঠাইমাদের গুরুদেবকে দেখে এবং পাণ্ডিত্যশক্তি পর্যবেক্ষণ করে জিতু অবাক হয়।

সে তার ছোটকাকিমার মেয়ে পানীর মৃত্যুর আগে দিব্যদৃষ্টির সহযোগে সবকিছুই যেন দেখতে পায় - যা সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব। জিতুর কাছে ‘হিন্দু ধর্ম’ গোঁড়া রক্ষণশীল মানুষের ধর্ম। বন্ধু বনমালীর কাছে হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন কথা শুনে জিতু ভাবে -

“..... হয়ত চা-বাগানে থাকার দরুন ওদের ধর্ম আমরা শেখবার

সুযোগ পাইনি, যে আবহাওয়ার মধ্যে ছেলেবেলা থেকে মানুষ হয়েছি,

সেটাই এখন ভাল লাগে।” ২২

মিশনারী সম্প্রদায় হিন্দুধর্মকে ‘মিথ্যাধর্ম’ বলে আখ্যায়িত করে। জিতুও মিশনারীদের সংস্পর্শ থেকে বড় হওয়ার সুবাদে তাদের মতামতকে খুবই গুরুত্ব দেয়। আলেকজান্ডার ডাফ ১৮৩৯ খ্রিঃ তার ‘India & India Missions’ গ্রন্থে খ্রিস্ট ধর্ম ও হিন্দুধর্মের তুলনা করে লেখেন -

“Unlike christianity, which is all spirit and life, Hinduism

is all letter and death.” ২৩

কিন্তু জিতুর হিন্দুধর্ম সম্পর্কে এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে পিতৃভূমির নিকটবর্তী গ্রামের প্রতিবেশি মেয়ে শৈলবালার সংস্পর্শে। শ্রীরামপুরে অবস্থিত শৈলবালার শ্বশুরবাড়িতে থেকে জিতু পড়াশুনার সুযোগ পায়। এ বাড়ির প্রত্যেকেই উদারমনা ; কোনধরনের কুসংস্কার তাদের মনের মধ্যে নেই। এখানে থাকা অবস্থায় জিতু সবসময়ই মা, ভাই-বোনের কথা চিন্তা করতে করতে মুক্তির জন্য প্রকৃতির রাজ্যে চলে যায় -

“কতকাল রডোডেনড্রন ফুল দেখিনি, পাইন বন দেখিনি, কাঞ্চনজঙ্ঘা

দেখিনি ..... এদের সবাইকে দেখাতে ইচ্ছে হয় সে দেশ।” ২৪

শৈলবালার শ্বশুরবাড়ির প্রত্যেকেরই আদর-যত্নে জিতু খুশি থাকলেও ছোট বউঠাকরুণের সঙ্গে

তার এমন কোনও ভাব নেই। তবে শেষপর্যন্ত এই মহিলার সঙ্গে তার আন্তরিক ভাব ফুটে ওঠে। ছোটবৌয়ের অঙ্গস্পর্শে তার মনে হল —

“নতুন নেশার মত এ অনুভূতি আমার সারা দেহমন অভিভূত ক’রে  
তুললে।” ২৫

শেষপর্যন্ত জিতু একদিন ছোটবৌকে না জানিয়ে চিরদিনের মত শৈলদির বাড়ি ছেড়ে আটঘরায় চলে আসে।

উনিশ শতকে নর-নারীর সম্পর্কের স্বাভাবিক স্বীকৃতি-এককে অবলম্বন করে অন্যের সার্থক হওয়ার বাসনা কিংবা এককে নিয়ে অন্যের স্বপ্ন দেখার কল্পনা, প্রতীচ্যের এই জীবনবোধের সংস্পর্শে এসে বাঙালিসমাজ তত্ত্বগতভাবে তা স্বীকার করে নেয়। তবে জীবনে ও সাহিত্যে এতো সহজে এর স্বীকৃতি ঘটেনি। এরই ফলশ্রুতি লক্ষণীয় লোচনদাসের আখড়ায় সেবায়েতের কাজে নিয়োজিত মালতীর প্রেমে বাঁধা পড়েও তাকে বিয়ে করতে পারেনি জিতু। দীর্ঘদিন এই আখড়ায় থাকার ফলে জিতুর সঙ্গে মালতীর আত্মার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মালতীর জন্মদাতা পিতা নিজ ইচ্ছা মত পতি বরণ করার আদেশ দিয়ে গেলেও শুধুমাত্র ধর্মের খাতিরে মালতী বিয়ে করতে পারেনি জিতুকে। আমাদের ধর্মশাসিত সমাজে মানুষের প্রেম, ভালবাসার পরিসর ক্ষুদ্র এবং এই ক্ষুদ্রতার জন্যেই নর-নারীর জীবনভাবনার স্বপ্ন সমাজে স্বীকৃতি পায়নি।

তবে মালতী বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হয়েও ধর্মীয় গোঁড়ামিকে নিজ মনে স্থান দেয়নি। সে লেখা-পড়া জানা মেয়ে। পুরনো হিন্দু কাঠামো ব্যবহার করে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলাকে কেন্দ্র করে মালতী কাব্য রচনা করে। তার স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে লেখক আমাদেরকে জানান —

“বৈষ্ণব-ধর্মের আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছে বটে, কিন্তু ও নিজে যেন

কিছুই মানে না - এই ভাবের।” ২৬

উনিশ শতকে কিংবা তার পরবর্তী সময়ে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে প্রেম-ভালবাসাকে সামাজিক স্বীকৃতি না দিলেও একজন অন্যজনের পরিপূরক হিসেবে ভাবতে আরম্ভ করে ; তখনই সুস্থ সমাজবোধের সন্ধান পাওয়া যায়। মালতী সম্পর্কে জিতু ভাবে -

“বড় অদ্ভুত ধরনের মেয়ে, ও একালেরও নয়, সেকালেরও নয়। এই

পাড়াগাঁয়ে মানুষ হয়েছে, যেখানে কোনো আধুনিকতার ঢেউ এসে

পৌঁছয় নি, কিন্তু বুদ্ধিমতী এমন যে আধুনিকতাকে বুঝতে ওর দেরি

হয় না।” ২৭

মালতী সামাজিকভাবে সনাতন ঐতিহ্যরীতিতে বিশ্বাসী হলেও মানসিক ভাবে সে আধুনিক। বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হওয়ার জন্য সে নিজে মাছ-মাংস না খেলেও অন্যকে রোঁধে দিতে তার কোনও অসুবিধে নেই। মালতী ধর্মীয় গন্ডিবদ্ধতার মধ্যে থেকেও মুক্ত মানসিকতার পরিচয় দিয়েছে উপন্যাসের প্রতিবেদনের মধ্যে।

পূর্বেই উল্লেখ্য, উনিশ শতকে ভারতীয় হিন্দু সমাজ জীবনে বিধবা বিয়ের প্রচলন শুরু হলেও প্রকৃতঅর্থে বাস্তব জীবনে তা পুরোপুরি চালু হয়নি। চালু না হওয়ার কারণে, প্রেমচেতনার কোনও নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি হলে বিধবাকে অবৈধ উপায় গ্রহণ করতে হত। যখন মেয়েটির বিয়ে হয়েছে, তখন সে বিয়ের অর্থই বুঝতে পারেনি। কিন্তু সে যখন যৌবনা হয়েছে, বুঝতে পেরেছে জীবনপ্রবৃত্তির তাড়না, তখন পুরুষতান্ত্রিক সমাজ তাকে বিধবা বলে চিহ্নিত করে। ফলে দেহ ও মনের তাড়নার রোমাঞ্চিক জীবনের আকাঙ্ক্ষায় সে যখন কোনও পুরুষকে নিজ হৃদয়ের মধ্যে স্থান দিতে গিয়েছে-সমাজ তাকে ব্যভিচারী বলে চিহ্নিত করেছে। এই উপন্যাসের নীরদা

চল্লির মধ্যে আমরা দেখতে পাই, বৈধব্যদশা অবস্থায় পরপুরুষে আকৃষ্ট হওয়ার ফলে তার মৃত পিতা শত্রু বাঁড়ুয়োর দেহ সংকার করার জন্য গ্রামের কোনও মানুষই আসেনি। লেখকের ভাষায় বলা যায় —

“তার একমাত্র বিধবা কন্যাকে নিয়ে কি-সব কথা নাকি উঠেছিল-তাই

থেকে গ্রামে শত্রু বাঁড়ুয়ো একঘরে হন।” ২৮

শেষপর্যন্ত, মালতীর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে মৃতব্যক্তির সংকার সম্পন্ন হয়। আর এখানেই ফুটে ওঠে মালতীর মত রক্ষণশীল ধর্মে দীক্ষিত একটি নারীর আধুনিক মানসিকতার পরিচয়।

মালতী ও জিতুর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হলেও, জিতু সামাজিক গণ্ডিবদ্ধতার জন্য তাকে বিয়ে করতে পারেনি। বিয়ে করতে না পেরে জিতু একদিন মালতীকে না জানিয়ে অচেনা প্রকৃতির দিকে যাত্রা করে। শেষপর্যন্ত হাসপাতালে শয্যাশায়ী দাদা নিতুর কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়। নিতুর মৃত্যুর পর জিতু ভাইয়ের সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব নিজ কাঁধে নেয়। বাতাসার কল্লখানার চাকুরি করতে গিয়ে জিতু ভাবে —

“...অতীতকে আঁকড়ে ধরে বসে থাকা আমার রীতি নয়। তাতে দুঃখ

বাড়ে বৈ কমে না।” ২৯

এসব আঘাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য জিতু মানসিকভাবে তৈরি —

“জীবনে মানুষ ততক্ষণ ঠিক শেখে না অনেক জিনিসই, যতক্ষণ সে দুঃখের সম্মুখীন না হয়। ... দুঃখকে জয় ক’রে আমি আমার বিরাট চেতনার রথচক্র চালিয়ে দিই শতাব্দীর পথে, জন্মকে অতিক্রম ক’রে মৃত্যুর পানে, মৃত্যুকে অতিক্রম ক’রে আবার আনন্দ-ভরা নবজন্মের

কোন অজানা রহস্যের আশায়।” ৩০

এসব দুঃখ-কষ্টের সময়ে তাদের মায়ের মৃত্যু ঘটে। জিতুর বিধবা বৌদিও কঠিন রোগে আক্রান্ত হয় এবং তার সদ্যোজাত মেয়ে খুকী চিরকালের জন্য সংসার ত্যাগ করে। বোন সীতাকে দেখতে গিয়ে নানা দুঃখে জিতুর মন ভরপুর হয়ে ওঠে।

এসব দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য জিতু কামালপুরে একটি নতুন পাঠশালা খুলে এবং খুব কম-সময়ের মধ্যে প্রচুর ছাত্রও জুটে যায়। উপনিবেশ গ্রাম-বাংলায় ধীরে ধীরে সর্ব বর্ণে শিক্ষার প্রসার ঘটতে শুরু করে। বিশেষতঃ নারীসমাজ মুক্ত বাতাসে শিক্ষা গ্রহণ করতে সুযোগ পায়। ঐতিহ্যানুসারে একমাত্র উচ্চবর্ণের পুরুষদের শিক্ষা গ্রহণের এতদিন সুযোগ ছিল। বাংলায় ব্রিটিশ উপনিবেশের অন্যতম সুফল হল স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার। স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে দেশি-বিদেশি কিছু বুদ্ধিজীবীর অবদান অনস্বীকার্য। এমনকী অনেক রক্ষণশীল ব্যক্তি উনিশ শতকে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে প্রত্যক্ষভাবে সমর্থন ও সহযোগিতা করেন। তাই হিরন্ময়ীর মত কৈশোর অতিক্রম করা মেয়ে নির্দিষ্টায় জিতুর স্কুলে ভর্তি হয়। হিরন্ময়ীর পড়াশুনার আগ্রহ, বিশেষ করে ইংরেজি শেখার মানসিকতা দেখে জিতু বিস্মিত হয়। উনিশ শতকের নারী ব্যক্তিত্বের পূর্ণ ছাপ রয়েছে হিরন্ময়ীর মধ্যে। সে স্কুলের সবার উপর নিজ ক্ষমতাকে আরোপ করে ; তার হুকুম মেনে চলতে সবাই বাধ্য থাকে। জিতুর মুখ দিয়ে ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ হিরন্ময়ী সম্বন্ধে বলেন —

“..... ওর চোখ দুটি অত্যন্ত ডাগর, টানা-টানা জোড়া ভুরু দুটি কালো

সবু রেখার মত, কপালের গড়ন ভারী সুন্দর, চাঁচা, ছোট, অর্ধচন্দ্রাকৃতি।

মাথায় একরাশ ঘন কালো চুল।” ৩১



সে যেন আত্মস্বাতন্ত্র্যময়ী নারী হিসেবে উপন্যাসে উপস্থিত।

উপন্যাসের নায়ক জিতু যেন নবজাগৃতির আলোকপুষ্ট যুবক। সে সমাজের সবধরনের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ; আধুনিক জীবনবোধের সঙ্গে পরিচিত। স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবোধে সে হিরন্ময়ীর প্রেমে আসক্ত। জিতুর মুখ দিয়েই আমরা জানতে পারি —

“প্রেম আসে এই সব সামান্য তুচ্ছ খুঁটিনাটি সূত্র ধরে। ..... ফলুই

মাছের সরু চুল-চুল কাঁটার মত।” ৩২

শাস্ত্রের শাসনে নারীকে বাইরের সমাজবর্জিত এক লক্ষণরেখার মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছে। কিন্তু হিরন্ময়ী পুরুষের লক্ষণরেখাকে অতিক্রম করে সর্বক্ষেত্রে নিজস্ব ব্যক্তিসত্তার প্রয়োগ করে। মা ও বিধবা দিদিকে পুলিশের ধরে নিয়ে যাওয়া, জিতুর পাঠশালা বন্ধ করে অন্যত্র চলে যাওয়া, তাকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে বিয়ে দেবার প্রচেষ্টা - প্রত্যেকটি বিষয়ে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়ে হিরন্ময়ী আধুনিক নারীর পরিচয় দেয়। অনেক ঝড়-তুফান থেকে ওঠে হিরন্ময়ী একদিন জিতুকে সামনে পেয়ে নিজের মন তার কাছে উজাড় করে দেয়। তখন জিতুর মনে পড়ে দ্বারবাসিনী আখড়ার বৈষ্ণবী মালতীর কথা, শ্রীরামপুরের ছোটবৌঠাকরুণের কথা। একই সঙ্গে সে মালতীর সঙ্গে হিরন্ময়ীর পার্থক্য ও মিলের কথাও চিন্তা করে।

নারীকে নতুন করে মূল্যায়ন করাও পুরুষতান্ত্রিক সমাজে একধরনের আধুনিকতার পরিচয়। ঔপনিবেশিক শিক্ষা-সংস্কৃতির দৌলতে আমরা ঐতিহ্যভিত্তিক সমাজ কাঠামোকে বিনির্মাণ করতে সুযোগ পাই। উপনিবেশ পূর্বে আমাদের জাতিভেদের কঠোর অনুশাসনের নিয়মনুযায়ী বিয়ে প্রথা, সতীদাহ, নারীর সতীত্ব ও পাতিব্রত সংস্কার, পিতা-মাতার নির্বাচিত পাত্র কিংবা পাত্রীর মধ্যে বিয়ে, দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারিবারিক সামাজিক দূরত্ব

- এসব প্রথা ও অনুশাসনে নর-নারীর জীবনে রোমান্টিক প্রেম-ভালবাসার স্বাভাবিক বিকাশ লাভের কোনও পথ ছিল না। কিন্তু প্রতীচ্যের শিক্ষার প্রসার, স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার, প্রতীচ্যের কাব্য-সাহিত্যের রোমান্টিক যুগের সঙ্গে শিক্ষিত মানুষের হৃদয়গত পরিচয় প্রভৃতির প্রভাবে বাংলাদেশে কিংবা সমগ্র ভারতবর্ষে নর-নারীর মধ্যে প্রেম প্রবণতা ও নিজ পছন্দের ব্যক্তিকে বিয়ে করার আকাঙ্ক্ষা লুকিয়ে কিংবা প্রকাশ্যভাবে প্রবল হয়ে উঠতে থাকে। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী জীবনদর্শন ও নারীর নবজাগ্রত অতি স্বাতন্ত্র্যবোধ ও স্বাধিকারবোধ এই আকাঙ্ক্ষাকে তীব্র করে। এই তীব্রতাই হিরন্ময়ীর মত সদ্য যৌবনা মেয়েকে নির্দিষ্টায় জিতুর কাছে নিয়ে উপস্থিত করে।

হিরন্ময়ীকে বিয়ের কিছুদিন পর জিতু জানতে পারে মালতীর দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গিয়েছে। জনৈক বৈষ্ণবের কাছে এই সংবাদ পেয়ে জিতু ভাবে -

“বিষ্ণুমন্দিরে প্রদীপ দিতে গিয়ে কখনো একদিনও কি অন্যমনস্ক

হয় নি ?”<sup>৩৩</sup>

এসব কথা ভাবতে ভাবতে জিতু প্রকৃতির মুক্ত পরিসরে নিজেকে হারিয়ে ফেলে -

“মহাকালের বীথিপথ অনাগত দিনের শত বসন্তের পাখির কাকলীতে

মুখর, যা পেলুম তাই সত্য, আবার পাব, আবার ফুরিয়ে যাবে ... তার

চলমান রূপের মধ্যেই তার সার্থকতা।”<sup>৩৪</sup>

যান্ত্রিক জগতে তাদের প্রেম-ভালোবাসা সার্থকতা লাভ করতে না পারলেও প্রকৃতির কুলে মানসিকভাবে দুজনের মিলন ঘটে। এই বন্ধন যেন চিরকালের বন্ধন। প্রাচীনকালে যেখানে নারীর প্রেমের কোনও মর্যাদা দেওয়া হয়নি, সেখানে প্রতীচ্যের ভাবধারায় পরিপুষ্ট হয়ে জিতু

তথা ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ নারীর প্রেমকে মর্যাদা দিয়ে আধুনিক মানসিকতার পরিচয় দেন।  
আর এখানেই ‘দৃষ্টিপ্রদীপ’ উপন্যাসের পরিসর ঐতিহ্য থেকে আধুনিকতার দিকে অভিযাত্রা  
করে।

## উল্লেখপঞ্জি:—

- ১। তপোধীর ভট্টাচার্য - উপন্যাসের ভিন্নপাঠ, ১৪১২, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, পৃঃ ১৪।
- ২। বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর : আধুনিকতাবোধ এবং বাংলাদেশ (প্রবন্ধ), সমীরণ মজুমদার (সম্পাদিত) - 'আধুনিকতা, শিল্প ও সাহিত্যে' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, ১৯৯৬, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, পৃঃ ৯৯।
- ৩। অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত) - 'শতবর্ষের আলোকে বিভূতিভূষণ' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, ১৯৯৬, উষক প্রকাশনী, পৃঃ ২৯।
- ৪। তপোধীর ভট্টাচার্য - পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৭০।
- ৫। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় - 'বিভূতি রচনাবলী' (প্রথমবার্ষিকী সংস্করণ), ৩য় খণ্ড, ১৪০৪, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃঃ ৪।
- ৬। সমরেন্দ্র কুমার জানা - আধুনিক যুগদৃষ্টিতে শরৎ সাহিত্যের সমস্যাবলী, ১৯৮২, পুথিপত্র, পৃঃ ২৭।
- ৭। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় - পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৪।
- ৮। তদেব - পৃঃ ৬।
- ৯। তদেব - পৃঃ ৮।
- ১০। রূপন বসু - 'বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, ২০০৩,

পুস্তক বিপনি, পৃঃ ১৭৫।

- ১১। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় - পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১১।
- ১২। তদেব - পৃঃ ৩৩।
- ১৩। তদেব - পৃঃ ৫৯।
- ১৪। তদেব - পৃঃ ১৩।
- ১৫। তদেব - পৃঃ ২০।
- ১৬। তদেব - পৃঃ ২১।
- ১৭। তদেব - পৃঃ ২৩-২৪।
- ১৮। তদেব - পৃঃ ২৪।
- ১৯। তদেব - পৃঃ ২৯।
- ২০। স্বপন বসু - পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৬২।
- ২১। তদেব - পৃঃ ১১২।
- ২২। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় - পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৪৯।
- ২৩। স্বপন বসু - পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৬২।
- ২৪। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় - পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৪৯।
- ২৫। তদেব - পৃঃ ৫৩।
- ২৬। তদেব - পৃঃ ৯৫।
- ২৭। তদেব - পৃঃ ১০০।
- ২৮। তদেব - পৃঃ ১০৩।

|            |              |
|------------|--------------|
| ২৯। তদেব - | পৃঃ ১১৭।     |
| ৩০। তদেব - | পৃঃ ১১৮-১১৯। |
| ৩১। তদেব - | পৃঃ ১২৭।     |
| ৩২। তদেব - | পৃঃ ১৩২।     |
| ৩৩। তদেব - | পৃঃ ১৩৮।     |
| ৩৪। তদেব - | পৃঃ ১৩৮।     |

## কেদার রাজা

প্রাক-ব্রিটিশ যুগে বঙ্গভূমির যে ইতিহাস তা স্বাধীন সামন্ততান্ত্রিক বাঙলার ইতিহাস। এই সময়সীমায় নানা রাজবংশ গড়ে উঠেছে এবং ধ্বংস হয়েছে। হিন্দু শাসকের পরিবর্তে মুসলমান শাসকের আবির্ভাব হয়েছে। মুসলমান শাসকেরা হিন্দুদের সম্পদ লুণ্ঠন, মন্দির ভেঙে ফেলা ছাড়াও নানাধরনের অত্যাচার, শোষণ-শাসন চালিয়েছে। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল এতেও বাঙলার সামন্ততান্ত্রিক চরিত্রের কোনও পরিবর্তন ঘটেনি। সাধারণভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল এই সমাজ। এই সমাজভুক্ত মানুষের জীবন পরিসর ছিল বৈচিত্র্যহীন। এইসব গ্রামের প্রধান বাসিন্দা ছিল কৃষক ও কারিগর। তারা নিজেদের প্রয়োজনানুযায়ী খাদ্য ও অন্যান্য কৃষিজাত সামগ্রী উৎপাদন করত। পরবর্তীকালে যখন বঙ্গভূমিতে কিংবা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ উপনিবেশ স্থাপিত হয়, তখন থেকেই শুরু হয় ভারত ইতিহাসের এক মর্মান্তিক কাহিনী। বস্তুত সেই সময় থেকে ভারতবর্ষের সমাজ বিকাশের নিয়ম ভারতমাতার স্বার্থে পরিচালিত না হয়ে ব্রিটিশ উপনিবেশের বাণিজ্যনীতি ও পরে শিল্পপতিদের স্বার্থে পরিচালিত হতে থাকে।

প্রাক-ব্রিটিশ আমলে ভারতবর্ষের সামন্ততান্ত্রিক প্রথা-কাঠামো বিনির্মিত হয়ে ব্রিটিশ আমলে ‘চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত’ নামে রূপ লাভ করে। এই নীতিতে কৃষকদের অধিকার কেড়ে নিয়ে জমিদারদেরকে মালিকানা স্বত্ত্ব দেওয়া হয়। ফলে কৃষকরা শক্তিশালী জমিদারদের অধিদাসে পরিণত হয়। এরপর ধীরে ধীরে ভারতের বাজার অধিকার করে ব্রিটিশ শিল্পপতি গোষ্ঠী। এসব শিল্পপতি গোষ্ঠীর স্বার্থে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি ভারতের অর্থনীতির মূল

কেন্দ্রে আরও গভীরভাবে প্রোথিত হয়। এর ফলে রেলপথ প্রতিষ্ঠা, পথঘাটের উন্নতি, কোম্পানির আমলে যে সেচব্যবস্থা সম্পূর্ণ অবহেলিত ছিল এসব দিকে মনোযোগ দেওয়ার সূচনা হয়। আবার বৈদ্যুতিক, টেলিগ্রাফ ও ডাকব্যবস্থার প্রবর্তন, কেরানি অর্থাৎ অনুগত চাকর যোগাড় করবার জন্য ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন, ইউরোপীয় ব্যাংক ব্যবস্থার প্রচলন— এসব কিছুর প্রয়োজন জরুরি হয়ে পড়ে। ঔপনিবেশিক শক্তির এসব কিছু প্রচলন করার মূল উদ্দেশ্য ছিল বিজ্ঞান সম্মত তথা আধুনিকভাবে ভারতবাসীকে শোষণ করা।

‘কেদার রাজা’ উপন্যাসের প্রথমেই রয়েছে গ্রামীণ ঐতিহ্যনির্ভর জমিদারদের যৌথ মালিকানা স্বত্ব নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদের কথা। গ্রামের উচ্চবর্ণের জমিদারবর্গ নিম্নবর্ণের মানুষের উপর বিভিন্নভাবে শোষণ ও শাসন করত। জমির মালিকানা ও তার খাজনা নিয়ে দ্বন্দ্বের প্রমাণ পাওয়া যায়, উপন্যাসটির বিশেষ চরিত্র নীলমণি চাটুজের একটি মন্তব্যের মধ্যে —

“বাঁটুল নাপিতের দরুন আমার অংশে আমি চার আনা করে

বহরশাল খাজনা পাই, তা গাঁয়ের শুদ্ধুর ভদর কে না জানে ? এ

বহরের খাজনা কেদার রাজা দিবি আদায় করে নিয়ে বসে আছে।

দ্যাখো তো কি উৎপাত !”

কেদার এই উপন্যাসের নায়ক ; শুধু নায়ক নয়, সে লুপ্তপ্রায় একটি রাজবংশের একমাত্র পুরুষ সদস্য।

নীলমণিবাবু সেকালের লোক, তবে টাকার হিসাব খুব ভালভাবে করতে জানেন। নিজের পাওনা কড়া-গণ্ডায় মিটিয়ে নেন। ঔপনিবেশিক পর্বে জমিদারবর্গ রায়ত প্রজাদের



উপর থেকে চড়াহারে সুদ কিংবা খাজনা সংগ্রহ করে এর একটি অংশ শাসক সম্প্রদায়ের হাতে তুলে দিতে হত। এখানে জনৈক সমালোচকের একটি মন্তব্য উল্লেখনীয় -

“একদিকে যেমন রায়তদের কাছ থেকে আদায় করা ভূমিরাজস্বের অধিকাংশই তাদের তুলে দিতে হত সরকারের হাতে, অন্যদিকে তেমনি পল্লীসমাজের ওপর তাদের প্রভুত্ব ছিল সামগ্রিক।” ২

কেন্দার রাজ্যের বর্তমান অবস্থা তেমন সুবিধাজনক নয় ; কোনমতে আধপেটা অবস্থায় মেয়ে শরৎসুন্দরী ও তাঁর দিন অতিবাহিত হয়। তাঁদের দৈনন্দিন অবস্থা সম্পর্কে লেখক বলেন -

“কাঁসার জিনিসপত্র ছিল বড় সিঁদুক বোঝাই - সব গিয়েছে একে একে-

- অভাবের তাড়নায় বিক্রী হয়ে, নয়তো বাঁধা দিয়ে। আর উদ্ধার করা যায়নি।” ৩

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক চিন্তা চেতনায় বাংলাদেশে জাতপাত ভিত্তিক মানসিকতার কিছুটা হলেও ভাঙন ধরে। আবার উঁচু-নীচু জাতি বা বর্ণের মধ্যে সামাজিক স্তরে কিছুটা হলেও মিলন ঘটে। ঐতিহ্যভিত্তিক চলে আসা বাল্যবিবাহ, সতীদাহ প্রথা ছাড়াও অনেক কুসংস্কারের পরিবর্তন ঘটে। তাই কেন্দারবাবু ব্রাহ্মণ হয়েও নির্দিধায় গণেশ মূর্তির সঙ্গে ওঠা-বসা, মাছধরা -এককথায় সবকাজেই গণেশ হল কেন্দারের সঙ্গী।

প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থায় বংশগত বৃত্তি ও পরম্পরাগত বন্ধনের উপর নির্ভর করে যে সামাজিক বণবিভাগ হয়েছিল তাতে প্রধান ছিল বংশগত পদমর্যাদা। কিন্তু উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের ভূমি রাজস্ব নীতি, ব্যবসায়িক নীতি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার ফলে গড়ে ওঠে নতুন এক অর্থনৈতিক পরিবেশ। এই অর্থনৈতিক

পরিবেশে বংশগত মানদণ্ডের পরিবর্তে আর্থিক মানদণ্ড বড় হয়ে ওঠে। তাই বংশগতভাবে  
 কেশররাজা 'রাজা' উপাধি পেলেও আর্থিক দৈন্যদশার জন্য কেউই তাঁকে গুরুত্ব দেয় না।  
 করং উল্টো ইউনিয়ম বোর্ডের সভাপতি অস্ব্যজ শ্রেণীর ব্যক্তি পঞ্চানন বিশ্বাস, ছিদাম মুদি -  
 এদেরকে কেশর সন্ত্রম করে চলে। এমনকী রাসু কামারের নাতি প্রভাস আজকাল প্রচুর ধন-  
 সম্পত্তির মালিক। প্রভাসের বাবা হারাণ কলকাতায় গিয়ে ব্যবসা করে বড়লোক হন। প্রভাস  
 কীঘরের সম্মান হলেও বখাটে ছেলে, শহরের বিভিন্ন অবৈধ কাজে লিপ্ত। প্রভাসের চারিত্রিক  
 দোষ জানাসঙ্গেও গড়শিবপুরের মানুষ তাকে প্রচুর সন্ত্রম করে। গড়শিবপুরের মানুষ গ্রামে  
 বসবাস করলেও তারা আধুনিক চাল-চলন, শিক্ষা- সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত। তারা জোর করে  
 প্রভাসের কাছ থেকে গ্রামের প্রাথমিক স্কুলঘর পাকা করে দেওয়ার সম্মতি আদায় করে নেয়।  
 এই প্রভাস সম্পর্কে সাতকড়িবাবু বলেন -

“ওরা হল আজকাল বড়লোক, এ দিগের সাত-আটখানা গাঁয়ের  
 মহাজন হ'ল ওরা। ..... তার ছেলে কি করে না করে সে-সব কথার  
 আলোচনা রাস্তায় দাঁড়িয়ে না করাই ভালো।”<sup>৪</sup>

তবে স্কুলঘর পাকা করার পেছনে কেশরবাবুর ভূমিকাও কম নয়। সে তার বাড়ির ইট স্কুলের  
 একাজে দান করে। এখানে আমরা কেশরের মহান ও মুক্তমনের পরিচয় পাই।

কেশর গ্রামীণ ঐতিহ্যে বিশ্বাসী হলেও ধর্মীয় রীতি-নীতি অর্থাৎ সঙ্কে- আহ্নিকে তাঁর  
 বিশ্বাস নেই। মেয়ে শরৎসুন্দরী বিধবা। বিধবা নারীর পরিসর পুরুষতান্ত্রিক সমাজে একেবারেই  
 গণ্ডিবদ্ধ। রাজলক্ষ্মী ছাড়া গ্রামের অন্যান্য মানুষের সঙ্গে শরৎসুন্দরীর এমন কোনও যোগাযোগ  
 নেই। সমাজ পরিবর্তনশীল। রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কারের পূর্বে মেয়েদেরকে

বাল্য বয়সে বিয়ে দেওয়া হত। কিন্তু ঊনবিংশ শতকে সমাজ সংস্কারের পরে মেয়েদেরকে বেশি বয়সে বিয়ে দেওয়া কিংবা মেয়ের নিজস্ব মত বিয়ে করতে এমন কোনও আপত্তি ছিল না। বলা যায় নারীর যেখানে নিজস্ব মতামত জানানোর কোনও অধিকার ছিল না সেখানে প্রতীচ্যের প্রভাবে নারী ভাল-মন্দ বিচার করার সুযোগ পায়। ঐতিহ্যগতভাবে সমাজের কিংবা কারও কোনও মঙ্গল কাজে বিধবা নারীর অংশ নেওয়া নিষিদ্ধ থাকলেও রাজলক্ষ্মী নিজের বিয়েতে উপস্থিত থাকার জন্য সখিসম শরৎকে অনুরোধ জানায়। রাজলক্ষ্মী বলে —

“তোমার মত মানুষ আমার বিয়েতে গিয়ে দাঁড়ালে আমার অকল্যাণ হবে না শরৎদি।” ৬

শরৎ সুন্দরীকে বিয়েতে উপস্থিত থাকার অনুরোধ জানিয়ে রাজলক্ষ্মী চিরাচরিত প্রথাবদ্ধ গণ্ডিকে অতিক্রম করে আধুনিক মানসিকতার পরিচয় দেয়।

ব্রিটিশ আগমনের ফলে আমাদের সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে পরিবর্তন ঘটে। সেসময়ে বাঙালির সংস্কৃতির জগতে কবি, টম্পা, বাত্রা, পাঁচালি, ভক্তীগীতি - এসবের প্রচলন ছিল। কৈদার রাজা অলস, গরীব হলেও গান-বাজনার প্রতি তাঁর ছিল প্রবল ঝোঁক। মেয়ে শরৎকে নানা অভ্যুহাত দেখিয়ে বাড়িতে একা রেখে কৈদাররাজা গ্রামের কোনও এক গানের আসরে বেহালা বাজানোর জন্য চলে যেতেন। মেয়ে অনেক চেষ্টা করেও পিতাকে গানের আসরে যাওয়া থেকে বিরত রাখতে পারেনি। এসম্পর্কে লেখক বিভূতিভূষণ পাঠকসমাজকে জানান

“এখানে এখন গান-বাজনা হবে - শরৎসুন্দরী ঠিকই আন্দাজ করেছিল,

তবে বারুইপাড়ার কৃষ্ণযাত্রার দলে নয়, এই যা তফাৎ।” ৬

কিন্তু উনিশ শতকের পরবর্তী সময়ে বাংলা সাহিত্য কিংবা সমাজে শুধু কবি, যাত্রাগান, পাঁচালি, রাখাক্ষের খেউড় - এ সবে সীমাবদ্ধ থাকেনি। প্রতীচ্যের সংস্কৃতির প্রভাবে বাংলায় বিশেষতঃ কলকাতা শহরে নতুন এক সামাজিক পরিসর তৈরি হয়। সেই সামাজিক - সাংস্কৃতিক পরিসরে আকৃষ্ট হয়ে কৈদার রাজা ও শরৎসুন্দরী কলকাতা ভ্রমণে মনস্থ করে। তাঁদের ভ্রমণের প্রধান উদ্যোক্তা ছিল আধুনিক নগর কলকাতার বর্তমান অধিবাসী প্রভাববাবু। আধুনিক শিক্ষা - সংস্কৃতি ও ভাবধারা বাঙালি জাতিকে যেমন প্রগতির পথে নিয়ে এসেছে তেমনি কিছু যুবককে বিপথগামীও করে তুলে। এই বিপথগামী যুবকদল মদ-মাংস-নারী ছাড়াও নানাধরনের অবৈধ, অনাচারী কাজে ছিল লিপ্ত।

বিপথগামী যুবকদল বাইরে দেশীয় আচার-আচরণ বজায় রাখলেও অন্তরে ছিল ওরা কুচক্রান্তকারী। এই দুই কুচক্রান্তকারী, সাহেবী আদব-কায়দার বিশ্বাসী যুবক সম্প্রদায় নবজাগরণের বিরোধী ছিল না। প্রভাস ও অরুণের মত যুবক গড়শিবপুরের রাজবাড়ি থেকে নানা হলনায় ছুটিয়ে শরৎসুন্দরী ও কৈদারকে কলকাতায় নিয়ে আসে। কলকাতায় তাদেরকে আধুনিক কল-করখানা, ট্রেন, চিড়িয়াখানা, সিনেমা ছাড়াও অনেককিছুর সঙ্গে পরিচয় করে দেয়। কিন্তু তাদের আসল উদ্দেশ্য ধরা পড়ে শরৎসুন্দরীকে ব্যায়োস্কোপ দেখানোর হলনা করে নিয়ে গিয়ে অবৈধ কাজে লিপ্ত করার ষড়যন্ত্রে। শহর কলকাতায় এসে নানাধরনের অবৈধ কাজ-কর্ম এবং আধুনিক জীবনযাত্রা দেখে শরতের মনের ভুল ভাঙে। কলকাতায় আসার পূর্বে শরৎ ভেবেছিল

“..... কলকাতার লোকে শিক্ষিত, তাদের ধরনধারণ খুব উন্নত হবে, তাদের দেখে গড়শিবপুরের মত পাড়াগাঁয়ের লোকেরা শিখবে। এখন

দেখা যাচ্ছে তার উল্টো।” ৭

গড়শিবপুর রাজকন্যা শরৎ স্ব-ইচ্ছায় পরিচালিত হয়। সে নিজে যা ভালো মনে করে তাই সম্পাদন করে। তবে বিশেষভাবে লক্ষণীয় তার এই চেতনা ধর্মীয় গোঁড়ামির জালে আবদ্ধ। স্নান - আহ্নিক না করলে পিতা কেদারকে যেমন খেতে বারণ করত তেমনি নিজেও কোনদিন অশুচি আচরণ করেনি। রাজবাড়ির ঐতিহ্যানুসারে সন্ধ্যাবেলায় বারহীদেবীর মন্দিরে প্রদীপ দেখানো ছিল শরতের প্রধান কাজ। কলকাতায় এসে কেদার চায়ের দোকানে চা খেতে ইচ্ছে প্রকাশ করলেও মেয়ের বর্ণবাদী জাত-পাত ভিত্তিক মানসিকতার কাছে হার মেনে আর চা খেতে পারেননি। কেদারের মনে জাতপাতের গোঁড়ামি না থাকলেও শরৎ এসব খুব মনে চলে। সে তার বাবাকে উদ্দেশ্য করে বলে -

“.....সন্দে-আহ্নিক তো করো না কোনোকালে, আবার ছত্যাশ জাতের

জল না খেলে চলবে না তোমার বাবা ?” ৮

এমনকী প্রভাস ও অরুণ মিথ্যা ছলনায় ভুলিয়ে শরৎসুন্দরীকে বারাজনাদের ঘরে দুদিন রাখার পরও সে তাদের জল পর্যন্ত স্পর্শ করেনি। এখানে শরৎ ধর্মীয় গোঁড়ামির পরিচয় দিলেও সে ব্যক্তিগত নারী হিসেবে নিজেকে তুলে ধরতে পেরেছে।

আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় নারী কোনদিন-ই পুরুষের সমকক্ষ মর্যাদা পায়নি। নানাধরনের সামাজিক নিয়ম ও আচার-আচরণ যার সমস্ত দায়বহন করতে হয় নারীকে। এই উপন্যাসের পটভূমিতে দেখা যায়, শরৎ দাম্পত্যজীবনের আনন্দ উপভোগ করার আগেই তার স্বামীর মৃত্যু ঘটে। তবুও শরৎ বৈধব্যদশার সমস্তধরনের আচার-আচরণ মনোযোগ সহকারে পালন করে। প্রভাসের দেওয়া হীরার আংটি শরৎ নির্দিষ্ট জলের মধ্যে ফেলে দেয় এবং প্রসাধন সামগ্রী

রাজলক্ষ্মীকে দান করে দেয়। শরতের মানসিকতায় রয়েছে চারিত্রিক শুদ্ধতা, ব্যবহারের মুক্ততা, সংকল্পের দৃঢ়তা। কিন্তু আধুনিক শহর কলকাতায় উপস্থিত হয়ে শরতের মত ঐতিহ্যপ্রেমী নারীর মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে। স্বামীপ্রেম বঞ্চিতা নারীর বিড়ম্বিত জীবন পরিসরের নীরব দুঃখদহন চোখের জলের মধ্যে কেমন করুণ ভাষা পেয়েছিল, তার প্রমাণ রয়েছে শরৎসুন্দরীর নিজস্ব একটি মন্তব্যের মধ্যে -

“সেখানকার সব কিছু যখন শেষ হয়ে গিয়েছে, তখন ভাল জ্ঞানই হয়নি শরতের। এক উৎসব-রজনীর চাঁপাফুলের সুগন্ধ আজও যেন নাকে লেগে আছে।” \*

সংসারের প্রতি অনীহায় শরৎ মাঝে মাঝে রাজবংশের কোনও এক ঠাকুরমার মত সম্মান রক্ষার্থে কালোপায়রার দীঘিতে আত্মহত্যা করতে চায়। তবে মাঝে-মাঝে ভেঙে পড়লেও সঠিক সময়ে শরৎ দৃঢ় মানসিকতার পরিচয় দিয়েছে উপন্যাসের প্রতিবেদনের মধ্যে।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে স্থিতিস্থাপকতার জন্যে নারীর মূল্য সমাজে স্বীকৃতি পায়নি। স্বীকৃতি না পেলেও নারীসমাজ বধির ছিল না। তারা বরং সমাজ ও পারিপার্শ্বিকতার চাপে নিজের মনের কামনা-বাসনা অবরুদ্ধ করে রেখেছিল। তাই শরৎ এতো সুন্দরী হওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র বিধবা হওয়ার জন্য নিজের সৌন্দর্য সমাজের সামনে তুলে ধরতে পারেনি। তার মনে পড়ে -

“সেও এক সময়ে সুন্দরী কিশোরী ছিল, ওই কমলার মত বয়সে, সে জানে, নিজেকে ভাল দেখানোর কত খুঁটিনাটি আগ্রহ অকারণে মেয়েদের মনে জাগে। তারও জাগত।” \*\*

ঠিক তেমনি রাজলক্ষ্মী বিয়ে করে সংসারী হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেও তার মা-বাবার কোনও গরজই নেই তাকে বিয়ে দেবার জন্য। রাজলক্ষ্মী নিজের মনোবাসনা শরতের সামনে এভাবে তুলে ধরে —

“.....আমার এদিকে আঠোরো পেরুলো, লোকের কাছে বলে

বেড়ান পনেরোতে নাকি পা দিইছি। এমন রাগ ধরে।” ১১

উনিশ শতক কিংবা তার পরবর্তী সময়ে ইংরেজি শিক্ষা-সংস্কৃতির কল্যাণে বাঙালি জাতি যে বুদ্ধি ও বুদ্ধিবৃত্তিকে লালন করতে শিখেছিল, তারই অনুপ্রেরণায় বাঙালির জীবনবীক্ষার পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে ওঠে। সমাজ ও সমাজবিবৃত গোষ্ঠী মানুষের আনন্দ ও আনন্দচেতনার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে বাঙালি সমাজ একদিকে যেমন সমাজ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তাকে অনুভব করে ঠিক তেমনি অন্যদিকে অনুসন্ধিৎসু হয়ে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ব্যক্তিমানুষের পৃথক সত্তার রহস্য প্রকাশ করতে উৎসুক হয়ে ওঠে। এই চেতনা থেকেই বাঙালি জাতির মধ্যে নতুন জীবনবোধ সঞ্চারিত হয়। তাই শরৎসুন্দরীর ভাগ্যদোষেই হোক আর প্রভাসের মিথ্যা ছলনার ভুলেই হোক, যখন তার ব্যক্তিজীবন প্রশ্নবোধের সামনে দাঁড়ায়, তখন নিজ বুদ্ধিমত্তায় সে সেখান থেকে মুক্ত হয়। শেষে জনৈক সন্ন্যাসিনীর সহযোগিতায় মিনুর মা'র সান্নিধ্য পেয়ে তার জীবনবোধে পরিবর্তন ঘটে।

ঝি-এর কাজ নিয়ে শরৎসুন্দরী মিনুদের কাকিমার সঙ্গে কাশীতে আসে এবং সেখানে আসার পর গ্রুবেশ্বরের গলিতে একটি পরিবারের সঙ্গে শরতের পরিচয় হয়। এই পরিবারের ছোট ছেলোটিকে দেখে শরতের মনে হয় —

“.....এ খোকা তার কত দিনের আপনার, একে দেখে, একে

কোলে করে বসে ওর নারীজীবন যেন সার্থক হ'ল।” ১২

এখানে বাল-বিধবা নারী শরৎসুন্দরী প্রথম যেন নারীত্বের স্বাদ পায়। যে নারী একদিন জাত-পাত বর্ণভিত্তিক মানসিকতায় বিশ্বাসী ছিল সেই শরৎ বিভিন্ন ধর্মস্থান, শহর ভ্রমণ করার পর তার রক্ষণশীল মানসিকতার কমবেশি পরিবর্তন ঘটে। শরৎ ছোট খোকাকে যেমন খেলনা কিনে দেয় তেমনি জনৈক বাঙালি পাগলিকে খাবার ও কাপড় কিনে দেয়। কুচবিহারের কালীবাড়িতে বা কোনও এক বড় মন্দিরে পিতা কেমারের নামে বড় ছত্র খুলে জাত-পাত নির্বিশেষে দরিদ্র লোককে পেটভরে খাওয়াতে চায়। যে নারী একদিন ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য বর্ণের মানুষের ঘরে জলস্পর্শ করেনি সেই শরৎ ভাবে —

“বাবার ছত্র থেকে কোনো লোক ফিরবে না, অনাহারে কেউ ফিরে যাবে না। সে নিজে দেখবে শুনবে - সকলকে খাওয়াবে। সে দু-হাতে অন্নদান করবে। সকলকেই-ব্রাহ্মণ-শূদ্র নেই, তুণ্ডমুণ্ড নেই, বাঙাল ঘটি নেই -সকলেই হবে তার পরম সম্মানিত অতিথি।” ১৩

কিনো বিভূতিভূষণ যখন আমাদেরকে জানান —

“শরৎ জগৎটাকে যে রকম ভাবত, আসলে এটা সে রকম নয়। এখন তার চোখ ফুটেছে, জীবনে এত মর্মান্তিক দুঃখের মধ্যে দিয়েই, তবে যে উদার দৃষ্টি লাভ হয়েছে তার — এক-একদিন গঙ্গার ঘাটে চুপ করে বসে থাকতে থাকতে শরতের মনে ওঠে এসব কথা।” ১৪

অর্ধশত শরৎ গড়শিবপুর, পিতা কেমার এবং তাদের রাজবংশের নানা দেব-দেবীর পূজো-অর্চনা একপাশে রেখে অজানা দূরদেশে বি-এর কাজ নেয়। আবাল্য পরিচিত গড়শিবপুরের জীবনের



সঙ্গে চিরদিনের মত ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। তখন তার মনে হয় —

“.....বাবাকে ছেড়ে গড়শিবপুর জন্নের মত ছেড়ে যেতে হবে,  
জন্মা-জন্মান্তরের গভীর চেতনা দিয়ে যে গড়শিবপুর তার মন আঁকড়ে  
ধরেছিল, তা সে কি কোনদিন ভাবতো ?”<sup>১৫</sup>

শরণ ধীরে ধীরে প্রথানুগ সংস্কারের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে আধুনিকতার দিকে পা বাড়াতে  
আরম্ভ করে।

উনিশ শতকের পর থেকে মানুষের মনে বিশেষতঃ প্রতীচ্যের সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রভাবে  
ধর্মীয় গোঁড়ামির পরিবর্তন ঘটে। এ সময়ে রামমোহন রায় ‘আত্মীয় সভা’ (১৮১৫) প্রতিষ্ঠিত  
করে, সেখানে ধর্মীয় কুসংস্কার ও ঐতিহ্যগত আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে আলোচনা করতেন।

১৮১৯ খ্রিঃ ১৮ই মে ‘The calcutta Journal’ থেকে জানা যায় —

“..... and generally admitted the necessity of an infant  
widow passing her life in a state of celibacy - the practice  
of polygamy and of suffering widows to burn with the  
corpse of their husbands, were condemned, - as well as  
all the superstitious ceremonies in use amongst  
idolaters.”<sup>১৬</sup>

এরই প্রভাব পড়ে উপন্যাসের নায়ক কেদার রাজার উপর। তাই কেদার রাজা বিধবা মেয়ে  
শরণকে মাথার চুল কাটতে দেয়না, বতদুর সম্ভব সংস্কার থেকে দূরে রাখতে চায়, নিজে  
জাতপাতের উর্ধ্বে চলাফেরা করে। কেদারের মুচি, শূদ্র, উঁচু-নীচু এসবের ভেদাভেদ নেই। মেয়ে

শরৎকে হারানোর পর কেদারের মনোভাবকে লেখক এভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরেন —

“আজ শরৎ নেই সঙ্গে যে তাঁকে দোকানের চা খেতে বাধা দেবে, যে তাঁকে ইহকালের অনাচার থেকে সন্তুপর্ণে বাঁচিয়ে রেখে তাঁর পরকালের মুক্তির পথ খোলসা করবার জন্যে সচেতন ছিল চিরদিন - আজ সে নির্মমভাবে সমস্ত অনাচারের স্বাধীনতা দিয়ে তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছে - সুতরাং অনাচার তিনি করবেনই। যা হয় হবে, পরকাল তিনি মানেন না।” ১৭

কেদার রাজা পূর্বপুরুষের রীতি-নীতিকে বিসর্জন দিয়ে নতুন রীতি-নীতি গ্রহণ করে আধুনিক জীবনযাত্রার দিকে এগিয়ে যান।

এসময়ে নতুন ভাবধারা, নতুন ধরনের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবন এবং ব্রিটিশ শাসন-এসব মিলেমিশে ভারতীয় সমাজ পরিসরে আলোড়নের সৃষ্টি করে। এই আলোড়ন প্রথমে সাদা ফেলে শহর অঞ্চলে, পরে গ্রাম অঞ্চলে এর ছায়া পড়ে। আধুনিক যন্ত্রশিল্প, নতুন পরিবহন ব্যবস্থা, শহর অঞ্চলের ক্রমবিকাশ, কলকারখানা, অফিস-হাসপাতাল, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা কর্মক্ষেত্রে অস্ত্রবাসী, পরিসরহীন নারীর নিয়োগ - এ সবকিছু সামাজিক পরিবর্তনের সূচনা করে। সামাজিক রক্ষণশীলতা ও জাতিভেদ প্রথা কিছুটা হলেও কমে আসে। ভূমিভিত্তিক এবং গ্রামীণ সম্পর্কের কাঠামো পুরোপুরি এদিক-ওদিক হয়ে যাবার ফলে গ্রামাঞ্চলে বর্ণভেদের স্থিতিশীলতা ধ্বংস হয়। ধ্বংস হলেও পুরোপুরি সামাজিক অমঙ্গল এতে দূর হয়নি। তবে ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদের প্রসারের ফলে সামাজিক মর্যাদা অর্থসম্পদের উপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠে এবং অর্থ উপার্জন হয় সবচেয়ে বাঞ্ছিত সামাজিক পেশা। তাই সর্বহারা কেদার রাজা

গড়শিবপুরে থাকার সময়ে অর্ধাহারে-অনাহারে থেকেও চাকুরি গ্রহণ করেনি। কিন্তু আধুনিক শহর কলকাতা ভ্রমণ করার পর তার মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে। তিনি রাজবংশের ঐতিহ্যকে বিনির্মাণ করে হিংনাড়ার ঘোষদের আড়তে চাকুরি গ্রহণ করেন। তাঁর চাকুরি গ্রহণ করার পেছনে অন্যাকারণও ছিল। তাসত্ত্বেও আমাদের বলতে হয়, বেদাররাজা পূর্বপুরুষের ঐতিহ্যকে বিনির্মাণ করে আধুনিকতার পথে এগিয়ে যান।

বেদাররাজা মেয়েকে হারিয়ে হিংনাড়ায় পরিচয়হীন ভাবে থাকলেও পূর্ব অতিথি বন্ধুসম গোপেশ্বর চ্যাটার্জির বিশেষ প্রচেষ্টায় বেদাররাজা তার মেয়ে শরৎকে ফিরে পান। শরৎসুন্দরী দৃঢ়চেতা, ঊনবিংশ শতাব্দীর নারী সমাজের প্রতিনিধি। অনেক উত্থান-পতনের মধ্যেও তার মানসিকতায় কোনও ভাঙন ধরেনি। দীর্ঘদিন পর তারা গড়শিবপুরে ফিরে এসে নতুনভাবে জীবনযাপন শুরু করে। নতুনভাবে ঘরবাড়ি পরিষ্কার করে, শরৎ দেবতাদের মন্দিরে গিয়ে সন্ধ্যাপ্রদীপ দিতে আরম্ভ করে, গিরিন ও প্রভাসের কুপ্রস্তাবে সে প্রতিবাদী নারীর ভূমিকা নেয়। শরৎসুন্দরীকে লেখক বিভূতিভূষণ এক ব্যক্তিত্বময়ী নারী হিসেবে উপন্যাসের পরিসরে অঙ্কিত করেছেন। তার এই ব্যক্তিত্বের কাছে গিরিন, প্রভাস কিংবা অরুণের মত আধুনিকতার ধাক্কাধারী লম্পট যুবকেরা হার মানতে হয়। এমনকী অদৃশ্যশক্তির হাতে গড়শিবপুরের জঙ্গলের মধ্যে গিরিনের মৃত্যুও এক প্রতীকী তাৎপর্য বহন করে উপন্যাসের প্রতিবেদনের মধ্যে। গিরিনের মৃত্যুর ফলে বালবিধবা নারী শরৎ মহাবিপদ থেকে মুক্তি পায়। এই মুক্তি লম্পট কিছু যুবকের তথা পুরুষতন্ত্রে বিশ্বাসী ও অবৈধ কাজকর্মে লিপ্ত কিছু মানুষের কাছ থেকে মুক্তি। যেখানে নারী ঐতিহ্যগতভাবে ছিল পরনির্ভরশীল; সেখানে আধুনিক যুগে নারী সম্পূর্ণ ভাবে পরনির্ভর নয়, নিজে নিজের স্থান ঠিক করে নেয়। উপন্যাসের বিভিন্ন কুশীলব নিজ ব্যক্তিত্বকে

স্বাধীনভাবে তুলে ধরে কিংবা পুরানো ঐতিহ্যকে বিনির্মাণ করে নতুন মানসিকতার পরিচয় দেওয়ার মধ্যেই ফুটে ওঠে 'কেদাররাজা' উপন্যাসের আধুনিকতার পরিসর।

## উল্লেখপঞ্জি: —

- ১। বিভূতিভূষণ, বন্দ্যোপাধ্যায় - বিভূতিরচনাবলী (জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ) - ৮ম খণ্ড,  
১৪০৪, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃ: ৩।
- ২। ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় (অনুবাদক) - স্বাধীনতা সংগ্রাম, ২০০০, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট,  
পৃ: ১৪।
- ৩। বিভূতিভূষণ, বন্দ্যোপাধ্যায় - পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ: ৪।
- ৪। তদেব - পৃ: ২৯।
- ৫। তদেব - পৃ: ১৬৫।
- ৬। তদেব - পৃ: ১০।
- ৭। তদেব - পৃ: ৭৪।
- ৮। তদেব - পৃ: ৬৭।
- ৯। তদেব - পৃ: ১৫৯।
- ১০। তদেব - পৃ: ১০০।
- ১১। তদেব - পৃ: ১৫০।
- ১২। তদেব - পৃ: ১২৬।
- ১৩। তদেব - পৃ: ১৩৬ - ৩৭।
- ১৪। তদেব - পৃ: ১৩৩।
- ১৫। তদেব - পৃ: ১১৬।

১৬। বদরুল্লাহ হাসান —

উনিশ শতক : নবজাগরণ ও বাঙলা উপন্যাস,  
১৯৯০, জগৎমাতা পাবলিশার্স, — পৃঃ ১৭।

১৭। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় -

পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৯৭।

## ‘ইছামতী’

সময় চলমান। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে গড়ে ওঠে শিল্প - সাহিত্য - সংস্কৃতি। সময় কখনও নির্দিষ্ট গতির মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। এই গতিতে অতিক্রমের প্রচেষ্টার মধ্যেই ফুটে ওঠে নতুন জগৎ তথা নতুন পরিসর। তবে নতুন জগৎ কখনও পুরোপুরি পুরাতনকে পরিত্যাগ করে সৃষ্টি হতে পারে না। বস্তুত গ্রহণ ও বর্জনের মধ্যেই লালিত রয়েছে আমাদের ঐতিহ্য। তাই ঐতিহ্য কখনও এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না, সে চলমান গতি সম্পন্ন। অতীত এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে কিন্তু ঐতিহ্য চিরকাল গ্রহণ ও বর্জনের মধ্যদিয়ে এগিয়ে যায়। আর এখানেই অতীত ও ঐতিহ্যের মধ্যে পার্থক্য।

বাংলাদেশে ঐতিহ্যের বিনির্মাণ শুরু হয় ব্রিটিশদের আগমনের পর থেকে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি ভারতবর্ষে আসার পর আমাদের পুরনো সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে ছেদ পড়ে। ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী এসেছিল ভারতীয় ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করার মানসিকতায়। এই মননবীক্ষাকে টিকিয়ে রাখার জন্য তারা যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করে; সেগুলি আমাদের নিয়ে। এই মননবীক্ষাকে টিকিয়ে রাখার জন্য তারা যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করে; সেগুলি আমাদের ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় এক আশীর্বাদ স্বরূপ। কারণ তাদের শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রভাবে আমাদের মনে নানাধরনের চিন্তা চেতনা জেগে ওঠে। এর ফলে সবাই একবাক্যে স্বীকার করে নেয়, ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থা ও ধর্মের সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে। তখন থেকে শুরু হয়, আমাদের ঐতিহ্যলালিত সমাজের পুনর্গঠন।

এই সময়ে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের অনেকেই প্রতীচ্যের শিক্ষার শিক্ষিত হয়ে সাহিত্য - সমাজ-সংস্কৃতির মধ্যে নতুন ভাব-প্রেরণার সৃষ্টি করতে প্রচেষ্টা করেন। এই ভাব প্রেরণাকেই

আধুনিক চেতনা বলে মেনে নেওয়া যায়। তবে এই নতুন ভাব প্রেরণাকে অনেক কিংবা সাহিত্যিক সম্পূর্ণভাবে আত্মস্তু করতে না পারায় এঁদের মধ্যে দেখা দেয় আত্মদ্বন্দ্বের মধ্যদিয়েই সাহিত্যে উপস্থিত হয় আধুনিকতা। এর ফলে চিরাচরিত প্রাচীন বিনির্মিত হতে থাকে। ঘটতে থাকে সামাজিকের মানসিক পরিবর্তন।

‘ইছামতী’ উপন্যাসের পটভূমিকায় রয়েছে একটি নদীর কথা। এই নদী কে আরম্ভ এবং কোথায় শেষ হয়েছে – তা যশোর অঞ্চলের গ্রাম্য কোনও মানুষেই খবর তারা খবর না রাখলেও নদীর দুইধারের দৃশ্য দীর্ঘদিন থেকে উপভোগ করে আসছে পরিবেশের কথা লেখক এভাবে বর্ণনা করেছেন –

“গ্রামের ঘাটে কোথাও দু’দশখানা ডিঙি নৌকো বাঁধা রয়েছে। .....  
এক-আধ জায়গায় গাঙের উঁচু পাড়ের কিনারায় মাঠের মধ্যে কোনো গ্রামের প্রাইমারী ইন্সকুল ; লম্বা ধরনের চালাঘর, দরমার কিংবা কঞ্চির ব্রেড়ার ঝাঁপ দিয়ে ঘেরা ; আসবাবপত্রের মধ্যে দেখা যাবে ভাঙা ঝড়বড়ে একখানা চেয়ার দড়ি দিয়ে খুঁটির সঙ্গে বাঁধা, আর খানকতক বেঞ্চি।” ১

এর মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে ওঠে ইছামতী নদীতীরে বসবাসকারী মানুষ ও গ্রামের চে গ্রামের প্রথাগত পুরানো আচার-আচরণ, পরিবেশ – এসব কিছু ঐতিহ্য হিসেবে প্রচলিত। কিন্তু ঐতিহ্যের বিনির্মাণ ঘটে বন্যার মধ্যদিয়ে। ১২৭০ সালের বৃহৎ বনভূপীকৃত পুরানো সব আবর্জনা দূরদেশে নিয়ে যায়। এই আবর্জনা হল, আমাদের ঐ সামাজিকের নান্দ্রা সংস্কার। বন্যা আবর্জনাগুলিকে সরিয়ে নিলেও সেখানে জমাট বাঁধে



প্রলেপ। সূচিত হয় নব সম্ভাবনা। যেখানে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ভিত্তি  
সুদৃঢ় হয়। ধীরে ধীরে ভারতবর্ষের শাসনভার তাদের হাতে চলে যায়। ভারতবাসীর উ  
আসে শোষণ ও শাসনের করাল আঘাত। এই বিশেষ দিকটি লেখকের মনে যে প্রভা  
করেছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় এই উপন্যাসে। উপন্যাসের একটি চরিত্রের  
লেখক আমাদেরকে জানান -

“দাঁড়াও, শিপটন সাহেব চলে যাক আগে।” ২

এই শিপটন সাহেবকে ইচ্ছামতী নদী তীরবর্তী বসবাসরত প্রত্যেক মানুষ যেমন ত  
তেনি ঘৃণাও করে। কিন্তু প্রত্যেকেই তার আধিপত্য স্বীকার করে নেয়।

অনেকেই আবার নীলকুঠির বড়সাহেবের আধিপত্য স্বীকার করে তার বিশ্বস্ত হ  
লক্ষণীয় রাজারামের মত ব্যক্তিও এভাবেই নীলকুঠির গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন।  
ইংরেজদের চালচলন, আচার-আচরণ, আধুনিক জীবনযাত্রা দেখে অভিভূত হন। বড়  
কোনও এক বন্ধু তার ফটো তুলতে ইচ্ছা প্রকাশ করলে তিনি আনন্দিত হন। তার কা  
তোলার ক্যামেরা এক নতুন যন্ত্র। প্রাক-ব্রিটিশ বাংলার সমাজে কোনও ভারতীয়  
যন্ত্রের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। রাজারাম ঔপনিবেশিক শাসকবর্গের অধীনস্থ রাজ  
তবে লক্ষণীয় তিনি ঔপনিবেশিক আধুনিকতার সঙ্গে পরিচিত হলেও পুরোপুরি এ  
সংস্কার থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেননি। তাই নীলকুঠির সাহেবের সঙ্গে সমস্তদি  
পর নিকেলে এসে স্নান করে ঘরে প্রবেশ করতেন। লেখকের ভাষায় বলা যায় -

“সাহেব-টাবেব ওরা স্নেচ্ছ, অখাদ্য কুখাদ্য খায়। না নাইলে ঘরে  
স্নেচ্ছতেই পারবেন না।” ৩

ইউরোপীয় সমাজ তথা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন আমাদের বঙ্গভূমিতে কালক্রমে ইওয়ার মধ্যদিয়েই শুরু হয় বাঙালি জাতির আধুনিক জীবনযাত্রা। ইউরোপীয়দের আগমনে-ই সঞ্চারিত হয় আমাদের ঐতিহ্যলব্ধ সমাজের ভাঙন - গড়ন। এই ভাঙন - গড়নের মধ্যদিয়ে অতীত ভারতবর্ষের ইতিহাসকে পুনর্নির্মিত করা হয়। অনেক ইংরেজ সাহেব ভারতের গৌরব কথাকে নতুনভাবে উপস্থাপিত করেন ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ শিপটন সাহেবের মুখ দিয়ে আমাদেরকে জানান —

“এঁর নাম কোল্‌স্‌ওয়াদি গ্র্যান্ট, দেশভ্রমণ করতে ভারতবর্ষে এসেছেন।  
খুব ভালো ছবি আঁকেন এবং বইও লেখেন। সম্প্রতি বাংলার পল্লীগাম  
সম্বন্ধে বই লিখছেন।”<sup>৪</sup>

যে গৌরবকথা আমাদের কাছে বিস্মৃত ছিল, তা-ই এসব সাহেবেরা আমাদের সামনে তুলে ধরলেন। গ্র্যান্টসাহেব অতীত ভারতের গ্রামীণ সৌন্দর্যের চিত্ররূপ ইছামতী নদী তীরবর্তী গ্রামের মধ্যে দেখতে পান।

এই গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তি তথা নীলকুঠির দেওয়ান রাজারামবাবুর তিনবোনের একইসঙ্গে বিয়ে হয় সম্যাসী ভবানীচরণের সঙ্গে। তিনি সম্যাসী হলেও দেশ-বিদেশের নানা খবর রাখেন। যদিও তিনি বহুবিবাহ করেন, তবুও গণ্ডিবদ্ধ সংস্কারলব্ধ সমাজের প্রথারীতিতে তিনি পূত্রোপরি বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি ছিলেন কিছুটা মুক্ত, উদারবাদী ব্যক্তি। সেইসময়ে বাংলাদেশে যে নবজাগরণের ঢেউ লেগেছিল, সেই ঢেউ তাকেও স্পর্শ করে। নবজাগরণ বাংলাদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সংস্কারসাধন করে তুলে। বিশেষতঃ সেইসময়ে রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্টায় ও ইংরেজ সরকারের সহযোগিতায়

বাংলাদেশের তথা সমগ্র ভারতবর্ষের সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে। এখানে ড. বদরুল হাসানের একটি মন্তব্য উল্লেখনীয় -

“উনিশ শতকে ইংরেজি শিক্ষার কল্যাণে বাঙালী যে যুক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিকে লালন করতে শিখেছিল, তারই অনুপ্রেরণায় বাঙালীর জীবনদৃষ্টির মধ্যে পরিবর্তন অনিবার্য হ’ল।” ৫

এই জীবন দৃষ্টি পরিবর্তনের ফলে একদিকে সূচিত হয় বিধবা বিবাহ, নারীশিক্ষা। অন্যদিকে বহুবিবাহ কিংবা বাল্যবিবাহ রোধের মত সমাজ সংস্কারমূলক কাজ সম্পন্ন হয়। বাল্যবিবাহ বন্ধ হওয়ার জন্য তিলু - নীলু - বিলুর অনেক পরিণত বয়সে ভবানীবাবুর সঙ্গে বিয়ে হয়। তবে কৌলিন্য প্রথার সংস্কারপূর্ণ ঐতিহ্যগত গণ্ডিকে তারা অতিক্রম করতে পারেননি। তবে কৌলিন্য প্রথার জালে তারা আবদ্ধ থেকেও সংসার জীবনে কোনও কোনও ক্ষেত্রে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন।

প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে নারী ছিল অন্তঃপুরবাসিনী। স্বামীছাড়া অন্যকোনও পুরুষের মুখদর্শন করা ছিল সমাজ বিরুদ্ধ কাজ। পুরুষরাও স্ত্রীদেরকে বাইরের সমাজ, আলো - বাতাস থেকে দূরে সরিয়ে রাখত। কিন্তু ভবানীবাবু ঐতিহ্যের গণ্ডিকে অতিক্রম করে ইউরোপীয় সাহেবকে দিয়ে সুন্দরী স্ত্রী তিলুর ফটো আঁকাতে চান। তিলুও স্বামীর আদেশ মানতে রাজি হয়। এখানে তিলুর আধুনিক মানসিকতার চেয়ে বড় কাজ করেছে স্বামীর আদেশ। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর স্বাধীন কোনও মতামত নেই। তাই পুরুষের মুখের কথাই তোতাপাখির মত নারী বলে যায়। তবে এখানে নারীর আশা-আকাঙ্ক্ষার কিছুটা প্রতিফলন ঘটেছে। তিলু স্বচক্ষে ঔপনিবেশিক শাসক ও প্রতীচ্য সংস্কৃতির বাহক ব্যক্তিকে দেখার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে ওঠে।

সমাজের ভয়ে তিলু একথা ভবানীবাবুকে প্রথমদিকে বলতে পারেনি। সে তার স্বামীকে বলে -

“আপনি সন্মিসি হয়ে দেশবিদেশ বেড়িয়েচেন বলে সমাজের কোনো

খবর তো রাখেন না !” ৬

ভবানীবাবু তাদেরকে বিয়ে করার আগে সংসার ত্যাগী পুরুষ ছিলেন। সমাজ-সংসারের কোনও নিয়ম-কানূনের মধ্যে তিনি আবদ্ধ ছিলেন না। ঈশ্বর সন্ধানী এই যোগী পুরুষের মন ছিল সামাজিক সংস্কার মুক্ত ও ঐতিহ্যের গণ্ডিরেখার অনেক উর্ধ্বে। তিনি ছিলেন আধুনিক মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তি। খুব স্বাভাবিক ভাবে তাই স্ত্রীদের পরিচালিত করতে চেয়েছেন নিজস্ব ভাবনায়। অথচ প্রথাগত সমাজ-পরিবেশকে অগ্রাহ্য করতে পারে না স্ত্রী তিলু।

তিনবোনের মধ্যে বড়বোন তিলুর একটি পুত্র সন্তান রয়েছে। একদিন পুত্র ও স্ত্রীকে নিয়ে ভবানীবাবু শ্রুগুরবাড়ি থেকে নিমন্ত্রণ খেয়ে চন্দ্রবাবুর চণ্ডীমণ্ডপের সামনের রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে তিলু স্বামীকে ফিস্ ফিস্ করে বলে -

“আপনি জানেন না এ গাঁয়ের ব্যাপার। ঐ নিয়ে কাল হয়তো রটনা

রটবে। বলবে, অমুকের বৌ সদর রাস্তা দিয়ে তার স্বামীর সঙ্গে হেঁটে

যাচ্ছিল গট্ গট্ করে।” ৭

ঐতিহ্যগত রীতি অনুযায়ী উনিশ শতকের প্রথমার্ধেও স্বামীর সঙ্গে খোলা রাস্তায় একসঙ্গে চলাফেরা কিংবা কথা বলাও ছিল রীতি বিরুদ্ধ কাজ। তবে উনিশ শতকে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠী বুঝতে পারে নারী শুধু পুরুষের হাতের ত্রীড়নক নয়। তাদের ভাষায়

—  
“.....এতাদৃশ স্ত্রীলোকদিগকে কেবল অর্থের নিমিত্ত ব্যবহার করিলে



জগদীশ্বরের সৃষ্টির বিরুদ্ধ কৰ্ম করা হয়।” ৮

আর এই আধুনিক ভাব পরিলক্ষিত হয় ভবানীবাবুর মানসিকতায়। তাই স্ত্রী তিলুর কথা না শুনে, তাকে নিয়ে চণ্ডীমণ্ডপের সামনের রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে বলেন -

“তোমার আমার দিন চলে যাবে। ঐ খোকন যদি বাঁচে, ওর বৌকে নিয়ে ও পাশাপাশি হেঁটে বেড়াবে এ গাঁয়ের পথে - কেউ কেছু মনে করবে না।” ৯

প্রতীচ্যের শিক্ষায় শিক্ষিত আধুনিক রুচিশীল ব্যক্তিরাই চিরাচরিত প্রথার উচ্ছেদ সাধনে যত্নবান হয়েছেন। এখানে ভবানীবাবুর মানসিকতায় প্রথাবদ্ধ সংস্কার উচ্ছেদের একটা প্রচেষ্টা দেখা যায়। আর এখানেই স্পষ্ট প্রকাশ, ভবানীবাবু তথা ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণের মানসিকতা ঐতিহ্যের গণ্ডিকে অতিক্রম করে আধুনিক চিন্তা-চেতনার দিকে অভিযাত্রা করেছে।

হাজার হাজার বছরের পুরানো ঐতিহ্যের স্রোতকে বহন করে নিয়ে আসা ইছামতী নদীর জলধারার গতি আর আগের মত নেই। এই নদীটির বাঁওড় বের হয়েছে যেখানে, সেই জায়গায় নালু পালের মুদির দোকান। ইংরেজ ঔপনিবেশিক শক্তি ভারতবর্ষে প্রবেশ করার পূর্বে বাঙালি সমাজ ব্যবসা-বাণিজ্যে মনোনিবেশ করেনি। ঔপনিবেশিক সমাজের ব্যক্তিবর্গ তথা ইংরেজদের কঠোর পরিশ্রম ও একাগ্রচিত্ত দেখে বাঙালির মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে। একাগ্রচিত্তে ব্যবসা পরিচালনার ফলে নালুপালের ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। সে একসময় পসরা সাজিয়ে মাথায় করে হেঁটে হেঁটে পান-সুপারি বিক্রি করত। বর্তমানে সে ভিটার মধ্যে দোকান ঘর সাজিয়ে ব্যবসা চালায়। বোন ময়নার সঙ্গে নালুর বাগড়া বাঁধলে, ময়না বলে -

“গাল দিও না দাদা বলে দিচ্ছি। তোমার খাই না পরি?” ১০

উত্তরে নালু তাকে দ্বিতীয় বরের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার কথা বলে। প্রকৃতপক্ষে যেখানে শোষণ ও শাসন সেখানেই প্রতিবাদ। তাই ময়না প্রতিবাদী হয়ে বলে, সেই বরের সঙ্গে বিয়ে দিলে দা দিয়ে তার নাক কেটে ফেলবে। মেয়েদেরকে বুড়ো বর কিংবা দ্বিতীয় বরের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার রীতি উনিশ শতকেও সমাজে ব্যাপক ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ শক্তি আমাদের দেশে আসার পর পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবে বাঙালি জাতি মধ্যযুগের স্থবিরতা থেকে বেরিয়ে আসে এবং আধুনিক চেতনায় দীক্ষিত হয়। পুরানো সংস্কার, আচার-আচরণ, রীতি-নীতির পুনর্মূল্যায়ন করার জন্য সমগ্র জাতি ব্যস্ত হয়ে ওঠে। তাই ময়নার মত অন্তর্বাসী মেয়েও দ্বিতীয় বরকে বিয়ের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে। ময়নার এই চিরায়ত প্রথাকে অস্বীকার করা আধুনিকতার-ই পরিচায়ক।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে ইংরেজদের আগমনের মধ্যদিয়ে আধুনিকতার সূচনা হয়। ইংরেজ সম্প্রদায় ব্যবসা-বাণিজ্যের পীঠস্থান হিসেবে কলকাতাকে নির্বাচিত করে। তাই স্বভাবতই কলকাতাকে কেন্দ্র করেই শুরু হয় সামাজিক সংস্কারমূলক আন্দোলন। অন্যদিকে নতুন নতুন শিল্প স্থাপনের ফলে অর্থনৈতিক পরিকাঠামোরও পরিবর্তন হয়। ভবানীবাবুর ছেলের অন্নপ্রাশনে কলকাতা থেকে আগত রাজারামবাবুর এক আত্মীয়ের কথা বয়নে আমরা জানতে পাই —

“কলকাতায় একরকম তেল উঠেচে, সাহেবরা জ্বালায়, তাকে মেটে

তেল বলে।” ১১

কিন্তু এই তেলে আমাদের চিরাচরিত মাটির প্রদীপ জ্বলে না। এ হল সম্পূর্ণ নতুন ধরনের তেল যা আধুনিক চেতনার মতই নতুন। আধুনিক চেতনাতে উদ্ভূত হয়েই বাঙালির জাতিভেদ প্রথা, আচার-নিষ্ঠা, চাল-চলন — সবকিছুরই পরিবর্তন আরম্ভ হয়। তাই দুর্ধর্ষ ডাকাত হল্য পেকের

মানসিকতারও পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায়। সে জাত-পাত মানে না। তার কাছে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় এসব জাতিভেদ কিংবা বর্ণভেদের গোঁড়ামি নেই। ভবানীর ছেলেকে সোনার হার উপহার হিসেবে দিতে গিয়ে বলে —

“ব্রাহ্মণকে আমি মানিনে বাবাঠাকুর। সব দুষ্ট। খোকাঠাকুর নিষ্পাপ  
নারায়ণ। ওর গলায় হার পরিয়ে আমার পরকালের কাজ হোল।  
আশির্বাদ করুন।”<sup>২২</sup>

ঐতিহ্যানুসারে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় উঁচু আসনে অবস্থিত। ব্রাহ্মণরাই সমাজের হর্তা-কর্তা-বিধাতা। কিন্তু হলাপেকের মত ডাকাতও আজ ঐতিহ্যগত সংস্কার অনুসরণ করে না। সে প্রথাগত সংস্কারকে পরিত্যাগ করে ঔপনিবেশিক সমাজের অবভাস হিসেবে পরিচিত আধুনিকতাকে গ্রহণ করে। এমনকি ভবানীবাবুও একদিন স্ত্রী তিলুকে বলেছিলেন ‘কাজলের সময়কালে সমাজে আর নারী-পুরুষের ভেদাভেদ থাকবে না’। আধুনিক জগতে প্রত্যেক মানবসত্তাই সমান। এজন্যেই এইসময়ে নারী তার লুপ্তসত্তাকে খুঁজে পায়, শাস্ত্রের গণ্ডিরেখার বাইরে আসতে শুরু করে।

তিলুদের গ্রামের দুই মোড়ল ফণী চক্রবর্তী ও চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অশিক্ষিত হলেও তারা গয়া-কাশী প্রভৃতি ধর্মস্থান ভ্রমণ করতে আগ্রহী। কিন্তু রাস্তাঘাটের পরিচয় তাদের জানা নেই। শহর কলকাতার সঙ্গে তাদের কোনও যোগাযোগ নেই। রাজারামের কোনও এক ভাইপোর মুখ থেকে কলকাতা সহ নানা জায়গার কথা শুনে তারা আশ্চর্য হয়। ভবানীবাবু শিক্ষিত সন্ন্যাসী। বেদ, উপনিষদ ছাড়াও তিনি নানাধরনের বই পাঠ করেছেন। তিনি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত অথচ আধুনিক মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর এই মানসিকতার মূলে পাশ্চাত্য শিক্ষার

অপ্রত্যক্ষ প্রভাব স্বীকার করতেই হয়। কেননা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবেই বাঙালির জীবনবীক্ষার পরিবর্তন ঘটে। বিশিষ্ট ঐতিহাসিকের ভাষায় —

“ইংরেজি শিক্ষার প্রভাব গভীরভাবে সর্বপ্রথম অনুভূত হয় সমাজ,  
ধর্ম ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে।” ১৩

তবে সমাজ, ধর্ম, সংস্কৃতিতে এই প্রভাব পড়লেও অনেকেই অবশ্য রক্ষণশীল মনোভাবকে পরিত্যাগ করতে পারেননি। আবার অনেকে গ্রহণ করলেও নিজেদের মেয়েদেরকে পড়াশুনা করতে দিতেন না। এ সম্পর্কে গৌরমোহনবাবু তাঁর ‘স্ত্রী শিক্ষা বিধায়ক’ গ্রন্থে লেখেন —

“এদেশের লোকেরা বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানের উপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায়  
দেন না বরং তাঁহাদের মধ্যে যদি কেহ বিদ্যা শিখিতে আরম্ভ করে তবে  
তাঁহাকে মিথ্যা জনরব সিদ্ধ নানা অশাস্ত্রীয় প্রতিবন্ধক দেখাইয়া ও  
ব্যবহার দুষ্ট বলিয়া মানা করান।” ১৪

একথা সর্বজনবিদিত যে বেথুন সাহেব ও অন্যান্য প্রগতিবাদী ব্যক্তিদের উদ্যোগে উনিশ  
শতকে স্ত্রী-শিক্ষার সূত্রপাত ঘটে।

এই উপন্যাসে আধুনিক মানসিকতাসম্পন্ন পুরুষ ভবানীবাবু স্ত্রী তিলুকে সংস্কৃত ভাষা-  
ব্যাকরণ পড়াতেন। অন্য দুই স্ত্রী যথাক্রমে বিলু ও নীলু তাদের দিদির পড়াশুনার কথা শুনে  
আশ্চর্য হয় বটে, তবে তারাও পড়াশুনার ব্যাপারে আগ্রহী হয়। তাদের আগ্রহের মনোভাব দেখে  
ভবানীবাবু বলেন —

“আজকাল কলকাতায় মেয়েদের পড়বার জন্যে বেথুন বলে এক  
সাহেব ইষ্কুল করে দিয়েছে। কত মেয়ে সেখানে পড়ছে।” ১৫



নীলু পড়াশুনার ব্যাপারে আগ্রহী হলেও তার মন দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। সে ‘উপনিষদের বাণী’ ‘সর্ব শূভকরী’ কাগজ-এগুলিকে ভারতীয় ঐতিহ্য বিরোধী কিংবা খ্রিস্টানী মত বলে ভাবে। পরে অবশ্য তার মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে। আসলে, সেসময়ের মানুষ নানাধরনের দুটানায় পড়েছিলেন। তাই রাজারামবাবু নীলকুঠির দেওয়ানগিরি করলেও নিজের সংস্কারকে পরিত্যাগ করতে পারেননি। তিনি নীলকুঠির ইংরেজ সাহেবদের সঙ্গে সারাদিন থেকেও বাড়ি ফেরে স্নান করে, সন্ধ্যা-আহ্নিক করার পর ভাত খেতে বসেন। এমনকি মদ মাংস পর্যন্ত কোনদিন স্পর্শ করেননি। লেখকের ভাষায় বলা যায় —

“.....গঙ্গাজল মাথায় না দিয়ে তিনি ঘরের মধ্যে ঢোকেন না পর্যন্ত।” ১৬

সেই সময়ে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ প্রতীচ্যের সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হলেও বর্ণভেদ, জাতিভেদ প্রথাকে সম্পূর্ণভাবে মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারেননি। নিজেদের মধ্যে তাই দেখা দেয় স্ববিরোধিতা। এই স্ববিরোধিতার জন্য তারা রামমোহন, ডিরোজিও কিংবা বিদ্যাসাগরের মত প্রগতিবাদীদের বিরোধিতা করে ইতিহাসের গতিরোধের প্রচেষ্টা করেন। তাদের আশঙ্কা ছিল প্রতীচ্যের সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রভাবে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার মূল কাঠামোর পরিবর্তন ঘটবে। ফলস্বরূপ, তাদের হাত থেকে সমাজ শাসনের দায়িত্ব চলে যাবে অপেক্ষাকৃত নবীনদের হাতে। তবে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার দ্বন্দ্ব শেষ পর্যন্ত আধুনিক শিক্ষার প্রচার ও প্রসার ঘটতে শুরু হয়।

এই আধুনিক শিক্ষার প্রসার ও প্রচারের ফলে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ভাঙন শুরু হয়।

ইয়ংমেন্সন গোষ্ঠীর ধর্মীয় ও সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলন বস্তুত বর্ণবিদ্বেষ, পৌত্তলিকতা

বহুবিবাহ, পুরোহিততন্ত্রএসব কিছুই বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল। এসবকিছুর পেছনেই ছিল উদার বিশ্ববীক্ষা ও মানবতাবাদের স্বীকৃতি। ফলস্বরূপ, মধ্যবিত্ত শ্রেণী সাংগঠনিক ক্ষমতা যেমন অর্জন করে তেমনি উচ্চবর্ণ প্রভাবমুক্ত এক গণতান্ত্রিক সমাজের চাহিদা ধীরে ধীরে সাধারণ মানুষের মনে সঞ্চারিত হয়। এই উপন্যাসেও লক্ষণীয় প্রসঙ্গ চক্রবর্তীর মত রক্ষণশীল ব্রাহ্মণেরও মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে। সে একদিন যাকে অন্ত্যজ এবং বড় সাহেবের রক্ষিতা হিসেবে মনে করত, সেই বাগ্দি মেয়ে গয়াকে এখন ভালবাসে। এমনকি রামকানাই কবিরাজের মত রক্ষণশীল ব্যক্তিও গয়ামেমের দেওয়া দান নামমাত্র পয়সার বিনিময়ে গ্রহণ করে। গয়া একদিন রামকানাইয়ের ঘরে উপস্থিত হলে তিনি বলেন —

“.....এসো মা, বোসো বোসো, দাঁড়িয়ে কেন ?” ১৭

ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর সংস্কার আন্দোলনের প্রভাবে রামকানাই কিংবা ফণী চক্রবর্তীর মত উচ্চবর্ণের ব্যক্তির জাত-পাত ভিত্তিক পরিবর্তিত মানসিকতা ঐতিহ্য ভিত্তিক সমাজ কাঠামোর পরিবর্তনে সাহায্য করে।

এমনকি ঔপনিবেশিক শক্তির প্রতিনিধি শিপটন সাহেবের সহযোগিতায় নতুন দেওয়ান হরকালী শূর নীলকুঠিতে দুর্গাপূজার আয়োজন করে। দুর্গাপূজার সময় নীলকুঠির গোবিন্দ অধিকারীর দল যাত্রা অভিনয় করে। যাত্রাপালায় নীলু, তিলু যাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করলেও সমাজের ভয়ে যেতে পারেননি। ভবানীবাবু তাদেরকে যেতে না দিয়ে রক্ষণশীল মনোভাবের পরিচয় দিলেও ভেতরে ভেতরে তিনি তাদের যাওয়ার পক্ষে ছিলেন। উনিশ শতকে একজন নারীর খোলা মাঠে বসে যাত্রা-গান দেখার মানসিকতা বা ইচ্ছাপ্রকাশ প্রচ্ছন্ন আধুনিক ভাবনারই পরিচায়ক। যে পুরুষতান্ত্রিক শৃঙ্খল নারীকে আঁটেপুটে বেঁধে রেখেছে, সেই বাঁধা-নিষেধ উপেক্ষা

করে উনিশ শতকে নারী তার নিজস্ব পরিসর অন্বেষণ শুরু করে। সমালোচকের ভাষায় বলা যায় —

“Woman is the silence of which precedes discourse : she is the other, which stands outside and threatens to, disrupt the conscious order of speech.” <sup>১৮</sup>

উনিশ শতকের পূর্বপর্যন্ত ‘নারী স্বাধীন চিন্তা করার সুযোগ পায়নি ; এতদিন তার কল্পনার সৌন্দর্য লুকিয়ে ছিল’।

ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সমাজের প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ভারতীয় কৃষকদেরকে নানাভাবে শোষণ ও শাসন করে। কৃষকদেরকে জোর করে কৃষিকাজ বন্ধ করে দেয় ব্রিটিশ শক্তি এবং তাদেরকে নীলচাষ করতে বাধ্য করে। নীলকুঠির সাহেবেরা জোর করে গরিব কৃষকদের জমি দখল করে নিত। জমি দখলের চিত্র লেখক এভাবে তুলে ধরেছেন —

“দুই ঘোড়ায় দুই সাহেব, পিছনে আর এক সাদা বড় ঘোড়ায় দেওয়ান রাজারাম রায়, আর একটাবাদামী রংয়ের ঘোড়ায় প্রসন্ন চক্ৰান্তি আমীন এক লম্বা সারিতে চলেছে - ওদের পিছনে কুঠির লাঠিয়ালদের সর্দার রসিক মল্লিক। লোকে বুঝলে আজ একটা ভয়ঙ্কর দাঙ্গাহাঙ্গামার ব্যাপার না হয়ে আর যায় না” <sup>১৯</sup>

তবে একথাও সত্য অনেক সময় কৃষকরা ঔপনিবেশিক শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। কখনও কখনও শাসকগোষ্ঠীর মনে ভয়েরও সঞ্চার করেছে। এরই পরিচয় মেলে উপন্যাসে কৃষকবিদ্রোহী সত্তাকে ভয় পেয়ে ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট কোলম্যানের কথায় —

“নেটিভরা মানুষ হয়ে উঠলো” ২০

এতদিন কালোচামড়ার মানুষ বলে ভারতীয়দের ঘৃণা করা হত। তারা কোনদিন আইন-আদালতের আশ্রয় নেয়নি। অথচ তারা এখন যে কোনও বিষয়ে আইনের আশ্রয় নেয়। ভারতবাসী প্রতীচ্যের শিক্ষার মাধ্যমে বিশ্বের ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞাত হয়। এদিকে ব্রিটিশ শক্তি কৃষির পরিবর্তে জোর দিয়েছিল চা, পাট, কয়লা, নীল, রেলপথ ছাড়াও অন্যান্য শিল্পের উপর। তাদের উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বে নতুন পণ্যের বাজার সৃষ্টি করা। এরফলে বৃহত্তম ভারতীয় সমাজের কোনও লাভ হয়নি ; লাভ হয়েছে ঔপনিবেশিক সমাজের। তাসত্ত্বেও জনৈক ঐতিহাসিক বলেছেন —

“ঐতিহ্যগত অর্থনীতি থেকে ভারত আধুনিক অর্থনীতির দিকে এইসময়

পা বাড়িয়েছিল। ফলে সূচিত হয়েছিল আধুনিকতা।” ২১

এই আধুনিকতার ধ্বজাধারী নীলকুঠির সাহেবরা বেশিদিন নীলচাষকে ঠিকিয়ে রাখতে পারেনি। জাপানের কৃত্রিম নীল বিশ্ববাজারকে করায়ত্ত করার ফলে সাহেবদের মধ্যে অনেকেই নীলকুঠির ছেড়ে ইংলণ্ডে আশ্রয় নেয়। কিন্তু গয়ার অনুরোধে শিপটন সাহেব বাংলাদেশে থেকে যান। গয়া সাহেবের সঙ্গী হিসেবে তার কাছেই থেকে যায়। যে নালুপাল পূর্বে সাহেবকে বাঘের মত ভয় করত ; সেই নালুপাল এখন নীলকুঠির মালিক। নালুর বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে লেখক জানিয়েছেন —

“আটচালা ঘর বেঁধেচে গত বৎসর। ..... আর চরম বড় মানুষি

অবিশ্যি দুর্গোৎসব করা। তাও গত বৎসর নালুপাল করেছে।” ২২

নালুপাল ব্রাহ্মণকে খুবই শ্রদ্ধা-ভক্তি করেন। তার কাছে ব্রাহ্মণ সেবাই ভগবদ্ সেবার সমপর্যায়।



সে ব্রাহ্মণদেরকে নিমন্ত্রণ করে আহ্বান করতে দেয়। যে ব্যক্তি বর্ণবাদে বিশ্বাসী সেই নালুপাল কলকাতায় বেড়াতে যায় স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে। অন্দর মহল থেকে বের হওয়াই হল নারী প্রগতির আর একধাপ। কলকাতায় গড়ে ওঠা নব্য - আধুনিকতার স্পর্শে নালুপালের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে। সেখানে নানাধরনের আধুনিক সামগ্রী ও আধুনিক জীবনযাত্রা দেখে নালু আনন্দিত হয়ে ওঠে।

ব্রিটিশদের আগমনে বাংলার অর্থনীতির যেমন পরিবর্তন ঘটে ; তেমনি পরিবর্তন ঘটে মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার। জীবনযাত্রার এই পরিবর্তনের ফলেই নালুপাল কড়ির বিনিময়ে তামার পয়সা দিয়ে জিনিষপত্র বিক্রী করে কিংবা ক্রয় করে। নালুপাল নিজের ব্যবসা সম্পর্কে বলে —

“একবেলায় প্রায় আড়াই টাকা বিক্রি। এ বিশ্বাস করা শক্ত। সোনার দোকানটুকু। মা সিন্ধেশ্বরীর কৃপায় এখন এই রকম যদি চলে রোজ রোজ তবেই।” ২৩

আগেই বলা হয়েছে, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে বাংলার সমাজ সংস্কৃতিতে এক পরিবর্তনের ঢেউ লাগে। এরই ফলস্বরূপ দেখা যায় - নালুপালের আমন্ত্রণে ব্রাহ্মণ সমাজ জাতপাতের দ্বন্দ্বের তার বাড়িতে ভোজনে রাজি হয়নি। কিন্তু পরবর্তী সময়ে এই ব্রাহ্মণ সমাজ রামহরি চক্রবর্তীর সুপারিশে লালমোহন পালের বাড়িতে দুর্গাপূজার সময়ে নিমন্ত্রণ খেতে আসে। আসল কথা, উনিশ শতক থেকে ব্রাহ্মণ সমাজের ক্ষমতা ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে আরম্ভ করে। এখানে রামহরি চক্রবর্তীর কথা বরন থেকে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় -

“পালমশায়, আপনি ধনী লোক, আমরা সবে জানি। কিন্তু আপনার

বাড়িতে পাতা পাড়িয়ে ব্রাহ্মণ খাওয়ানো, এ কখনো এদেশে হয়নি।

তবে তা আমরা দুজনে করে দেবো, কি বল হে সাতকড়ি ?” ২৪

দীর্ঘদিনের অতিবাহিত ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে জাত-পাত বর্ণহীন সমাজ গঠনের কথা আমাদের সামনে ভেসে ওঠে।

রামহরি চক্রবর্তী প্রথাগত সংস্কারকে ভেঙে ব্রাহ্মণ সমাজকে লালমোহনের বাড়িতে উপস্থিত করাতে পারলেও নিজে সেই সংস্কার থেকে বের হতে পারেননি। ভবানীবাবু তার স্ত্রীকে নিয়ে নিমন্ত্রণ খেয়ে ফেরার সময় রামহরিকে খোকার অমম্প্রাশণে সস্ত্রীক উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ জানালে তিনি বলেন —

“না মা, সে সেকেলে লোক। আপনাদের মত আজকালের উপযুক্ত

নয়। সে পুরুষমানুষের সামনে বেরুবেই না।” ২৫

তার এই মানসিক দ্বন্দ্ব আসলে তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার-ই দ্বন্দ্ব।

এই দ্বন্দ্বের মধ্যেও ‘ইছামতী’ উপন্যাসের এক অপাঙক্তেয় চরিত্র নিস্তারিণীর মধ্যে আধুনিকতার প্রভাব পরিলক্ষিত। সে গ্রামের প্রত্যেক মানুষের নিন্দা ও কুৎসার পাত্রী। কারণ, সে গণ্ডিবদ্ধ সমাজের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত। সে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ঐতিহ্যকে বিনির্মাণ করেছে বলেই ভবানীবাবু বলেন —

“এ সব ভবিষ্যতের মেয়ে, অনাগত ভবিষ্যৎ দিনের আগমনী এদের

অলঙ্কুরাগরক্ত চরণধ্বনিতে বেজে উঠেছে, কেউ কেউ শুনতে পায়।

.....নিস্তারিণীর মত শক্তিমতী কন্যা, বধু করে জন্মাবে বাংলার ঘরে

ঘরে ?” ২৬

গ্রামহরি ও ভবানী বাঁড়ুয়োর মত ব্যক্তির ভবিষ্যৎ দিনের ছবিকে ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাঁদের চেয়ে আরও বেশি উপলব্ধি করে ভবানীবাবুর ছেলে রাজরাজেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। পড়াশুনোর বিষয়ে সে তার বাবাকে বলে —

“ইংরিজি পড়তি আমারও ইচ্ছে — তাই তুমি ঠিক করো বাবা।” ২৭

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সমাজের ভাব-শিখরা কলকাতায় যে নতুন সমাজ গঠনে ব্রতী হয়ে সমাজ সংস্কারমূলক কাজে হাত দেন, তার প্রভাব গ্রাম সমাজেও ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করে। তাই ভবানীবাবুর পুত্র পরম্পরাগত ভাষা সংস্কৃতিকে গ্রহণ না করে ইংরেজি ভাষা শেখার আগ্রহ প্রকাশ করে। কারণ, ইংরেজি ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি আমাদের পুরনো সমাজের কাঠামোকে ভেঙে এক নতুন জগৎ সৃষ্টির দিকে অভিযাত্রা করে। তাই উপন্যাসের সমাপ্তি ঘটে ঔপনিবেশিক শাসকের স্তম্ভ তথা নীলকুঠির বড় সাহেবের গোরস্থানে দুইবর্ণের নয়-নারী প্রসন্ন ও গয়ামেমের মিলনের মাধ্যমে। এই মেলবন্ধন এক নতুন যুগের বার্তাবাহক। বলা যায়, উপন্যাসের পরিসর ঐতিহ্য থেকে আধুনিকতার দিকে অভিযাত্রার পরিচায়ক।

## উল্লেখপঞ্জিঃ —

- ১। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিভূতিরচনাবলী - জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ - নবম  
খণ্ড, ১৪০৪, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স - পৃঃ ৩
- ২। তদেব — পৃঃ ৪
- ৩। তদেব — পৃঃ ১১
- ৪। তদেব — পৃঃ ১০
- ৫। ড বদরুল হাসান - উনিশ শতক : নবজাগরণ ও বাঙলা উপন্যাস, ১৯৯০, জগৎমাতা  
পাবলিশার্স, পৃঃ ৯৮
- ৬। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১৮
- ৭। তদেব — পৃঃ ৩৩
- ৮। ড বদরুল হাসান - পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১৭
- ৯। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৩৩
- ১০। তদেব — পৃঃ ৩৭
- ১১। তদেব — পৃঃ ৪২
- ১২। তদেব — পৃঃ ৪৩
- ১৩। নিখিল সুর - ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পটভূমি, ১৯৯৮,  
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, পৃঃ ৭
- ১৪। স্বপন বসু (সম্পাদক)- উনিশ শতকে স্ত্রীশিক্ষা, ১৪১২, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ,



পৃঃ ২৫

- ১৫। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : পূর্বোক্ত গ্রন্থ , পৃঃ ৭৭-৭৮
- ১৬। তদেব — পৃঃ ৮১
- ১৭। তদেব — পৃঃ ১২৮
- ১৮। তপোধীর ভট্টাচার্য - 'প্রতীচ্যের সাহিত্য তত্ত্ব' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, ১৯৯৭,  
অ.সা.প., পৃঃ ১৩৫
- ১৯। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : পূর্বোক্ত গ্রন্থ , পৃঃ ১০৩
- ২০। তদেব — পৃঃ ১০২
- ২১। নিখিল সুর - পূর্বোক্ত গ্রন্থ , পৃঃ ১১
- ২২। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : পূর্বোক্ত গ্রন্থ , পৃঃ ৮৯
- ২৩। তদেব — পৃঃ ৩৬
- ২৪। তদেব — পৃঃ ১৯৯
- ২৫। তদেব — পৃঃ ২০১
- ২৬। তদেব — পৃঃ ১৭০
- ২৭। তদেব — পৃঃ ২০৪

## চতুর্থ অধ্যায়

### কাঙ্ক্ষিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত জীবনের দ্বন্দ্ব

কাঙ্ক্ষিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত জীবনের দ্বন্দ্বভিত্তিক উপন্যাস – এই শ্রেণীর উপন্যাসগুলো হল ‘বিপিনের সংসার’, ‘দুইবাড়ি’, ‘অথৈজল’। সানুপুঙ্খ আলোচনার উদ্দেশ্যে প্রত্যেকটি উপন্যাসকে স্বতন্ত্রভাবে তুলে ধরা হল।

সাহিত্যের আধুনিক প্রকরণ উপন্যাস। উপন্যাসের রচনারস্ত্র আধুনিক ব্যক্তি ও সমাজকে কেন্দ্র করে। উপন্যাসের মৌল লক্ষণ ব্যক্তিসত্তা ও সমাজ সত্তার সংঘাত। Ralph Fox তাঁর ‘The Novel and the people’ গ্রন্থে লিখেছেন –

“The novel deals with the individual, it is the epic of the struggle of the individual of the society where the balance between man and the society was lost where man was at war with his fellows or with nature. Such a society is capitalist society.”<sup>১</sup>

তবে উনিশ শতকের পূর্বে বাংলাদেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থায় ধনতান্ত্রিক বুর্জোয়া সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বস্তুত সাম্রাজ্যবাদের উপনিবেশে সেই সমাজ গড়ে তোলা সম্ভবও ছিলনা। তা সত্ত্বেও সামন্ততান্ত্রিক সমাজ এবং মধ্যযুগীয় ধ্যানধারণার পাশাপাশি কলকাতায় নতুন এক ধনিক শ্রেণী গড়ে ওঠে, একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁদের আর্থিক বিন্যাস অবশ্য জমিদার শ্রেণীর মত ছিল না। এই শ্রেণীর সংখ্যা দিনের পর দিন বাড়তে থাকে। যারা

প্রকৃতিতে অলস অথচ খরচের আকাঙ্ক্ষা প্রবল, এই শ্রেণীর প্রতিনিধি বিপিন পেটের তাগিদে এবং নামী ব্যক্তি হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় জমিদার অনাদিবাবুর নায়েবগিরি কাজে যোগ দেয়। সেই সময়ে আমাদের দেশের শাসনভার ছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের হাতে।

ব্রিটিশ রাজশক্তির প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ হস্তক্ষেপে আমাদের পুরনো মূল্যবোধ, রীতি-নীতি, চাল-চলন এমনকী অর্থনীতির বনিয়াদে পরিবর্তন ঘটে। এ সম্পর্কে ড. স্বপন বসুর একটি মন্তব্য উল্লেখনীয় —

“নতুন রাজশক্তি শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর বাংলার গ্রামীণ অর্থনীতি বিপর্যস্ত হল।”<sup>২</sup>

মূলত গ্রামীণ সমাজের পারিবারিক কাঠামোয়ও ভাঙন ধরে। এই ভাঙনের পরিচয় পাওয়া যায় জমিদার অনাদিবাবুর পরিবারে। জমজমাট জমিদারীতে আর পূর্বের মত খাজনা আদায় হয় না। এর ফলে অনাদিবাবু তাঁর মেয়ে মানীকে বড় ঘরে বিয়ে দিতে পারেননি। অন্যদিকে মানীর সঙ্গে বিপিনের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। কিন্তু সামাজিক অসাম্যের জন্য উভয়ের সে সম্পর্ক পরিণতি পায়নি। আসলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে অন্তর্বাসী নারীর নিজস্ব কোনও কণ্ঠস্বর নেই। তাই পিতার পছন্দসই পাত্রকেই বিনা প্রশ্নে মেনে নেয় মানী। নারীর মন, আশা-আকাঙ্ক্ষা সবসময়ই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ভাবনায় পরিচালিত। নিজের ইচ্ছায় কোনও কাজ নারী করতে পারে না। আবার লক্ষণীয় মানী নিজের ইচ্ছাকে ব্যক্ত পর্যন্ত করেনি। অন্যদিকে মনোরমা অনেক আশা-ভরসা নিয়ে স্বামী বিপিনের ঘর সংসার করতে এসে দেখে —

“..... বাহির হইতে যত নামডাকই থাকুক, এখানকার ভিতরের অবস্থা

অন্তঃসারশূন্য।”<sup>৩</sup>

এই ‘অন্তঃসারশূন্যতা’ সমকালীন বিত্তশালী সমাজের তথা পরিবারের এক বাস্তব চিত্র। প্রত্যেক নারীর এক বিশেষ আকাঙ্ক্ষা হল সচ্ছল শ্বশুর বাড়িতে সুখে শান্তিতে বসবাস করা। কিন্তু অনাকাঙ্ক্ষিত ভাবে মনোরমার জীবনে নেমে আসে দুঃখ দারিদ্র্য। ফলে মনোরমার আশা আকাঙ্ক্ষা ভেঙ্গে যায়। সে আধুনিক নারীর মতই স্বামীর বর্তমান অবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। এই প্রশ্ন শুধু মনোরমার নয়; সমগ্র নারীসত্তার। এখানে হেলেন সিন্সোর একটি মন্তব্য উল্লেখনীয় —

"The Voice in each woman, moreover, is not only her own, but springs from the deepest layers of her psyche : her own speech becomes the echo of the primeval song she once heard, the voice the incarnation of the first voice of love which all women preserve alive." <sup>৪</sup>

নারীর একটি স্বরের মধ্যে অনেক স্বরের যেমন উচ্চারণ শুনা যায়, তেমনি বর্তমানের মধ্যে ফুটে ওঠে প্রবহমান অতীত। তাই মনোরমার মনে প্রশ্ন জাগলেও সে শেষপর্যন্ত দেশীয় নারীর ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করে পুরো পরিবারের সেবায় মগ্ন থাকে।

ভারতীয় নারীর ঐতিহ্যকে মেনে নিয়ে মনোরমা স্বামীকূলের সেবা করে। কিন্তু সেই স্বামী বিপিন আসক্ত হয়ে পড়ে পরকীয়া প্রেমে। পরকীয়া প্রেমিকা মানীই ছিল বিপিনের কাছে সমস্ত ‘কামনা-বাসনার উর্ধ্ব স্বপ্নময়ী ধ্যানপ্রতিমার মতো’। পরস্ত্রী মানীও ছিল বিপিনের প্রতি আকৃষ্ট। এই উপন্যাসের প্রতিবেদনে মানী ছাড়াও কামিনী, বীণা, শান্তি এবং মতি সবাই পরকীয়া প্রেমে মগ্নিজাত। এসব নারীরা মনের টানেই হোক আর জৈবিক ক্ষুধায়ই হোক তাদের

প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলিত হতে চেয়েছে। কিন্তু প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থা তাদের প্রেমকে স্বীকৃতি  
দেয়নি। এই সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে ড. বদরুল হাসান বলেন —

“ধর্ম ও ধর্মশাসিত সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের স্থান গৌণ বলেই চিহ্নিত  
হয়ে আসছিল। তার ফলে নরনারীর জীবনভাবনার স্বপ্ন, ভালবাসা ও  
ভাললাগার কোন মূল্য সমাজে স্বীকৃতি পায়নি।” ৫

ফলে, পটল-বীণা, বিপিন-মানী কিংবা মতি-বিশ্বেশ্বরের প্রেম সমাজের রক্তচক্ষুর কাছে আত্মসমর্পণ  
করতে বাধ্য হয়েছে। লেখক বিভূতিভূষণ আধুনিক মন নিয়ে নর-নারীর মধ্যে অবৈধ সম্পর্ক  
তৈরি করে দিলেও শেষপর্যন্ত তাঁকেও সমাজের পরম্পরাগত ঐতিহ্যকে মেনে নিতে হয়।  
উপন্যাসের নায়ক বিপিন এই ঐতিহ্যের ধারাকে মেনে নিয়েও বালবিধবা বোনের প্রতি  
নরম মনোভাব নিয়ে ভাবে —

“ছেলেমানুষ বীণাকে সে কি দোষ দিবে?” ৬

কিংবা

“মানীর জন্য এত মন কেমন করে কেন?” ৭

আসলে প্রতীচ্যের নবজাগরণের প্রভাবে বাঙালির রক্ষণশীল মনোভাবের কম-বেশি পরিবর্তন  
ঘটে। আধুনিক ইংরেজি শিক্ষা আমাদের ঐতিহ্যগত শাস্ত্রের অর্থের পরিসরকে বিনির্মাণ করতে  
শেখায়। মানী ছিল বিপিনের কাছে আধুনিক জীবন পরিসরের সূত্রধার। তার সঙ্গে বিপিনের  
দীর্ঘদিন কোনও যোগাযোগ না থাকলেও ছোট একটি পত্র দুজনের মনকে একত্রিত করে দেয়।  
লেখকের ভাষায় —

“আজ এই চিঠিখানার ভিতর দিয়া এতকাল পরে বহুদূরের মানীর

সহিত আবার দেখা হইল। ..... মামী তাহার জন্য ভাবে, আর কি চাই  
সংসারে?" ৮

বাস্তব জগতে তাদের মিলনের কোনও সম্ভাবনা দেখতে না পেয়ে লেখক পত্রের অবতারণা করেছেন। এই মিলন শুধু গড়ে উঠতে পারে বাস্তবের বিনির্মাণ এবং প্রতিকল্প এক পরিসরের কল্পনায়। সমসাময়িক সামাজিক পরিবেশে তা অকল্পনীয়। এই সমাজের নিয়ম-নীতিকে উপেক্ষা করে রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ সমাজের ছেলে বিশ্বেশ্বর বাগ্‌দী মেয়ে মতিকে ভালবেসে বিয়ে করে। যা তাদের ঈপ্সিত কিন্তু সমাজে কাঙ্ক্ষিত নয়, তাই লক্ষণীয় পরবর্তী সময়ে মতির জীবনে নেমে আসে অশেষ দুঃখ। এই দুঃখ মতির স্বনির্মিত নয়, বলা যায় নিয়তি নির্ধারক পুরুষতান্ত্রিক সমাজের তৈরি। সে এই দুঃখকে নীরবে সহ্য করে নিজস্ব টং-এ দিনাতিপাত করেছে। ভালবাসার আকাঙ্ক্ষা তাদের সমাজ দ্বন্দ্বের সম্মুখীন করে। এখানে সমালোচক ম্যাগির একটি মন্তব্য আমরা তুলে ধরতে পারি –

"We are different readers, and therefore different critics,  
from men because our gendered reading is both  
essentially different and one produced by our agreeing to  
read 'difference' as a crucial paradigm of cultural  
construction. The extent of difference is therefore  
infinite."<sup>৯</sup>

মতির আকাঙ্ক্ষিত প্রেম সার্থক হয়ে ওঠার পরেই লেখক তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেন।  
কারণ, ভিন্নজাতের দুজনের মিলন সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। তবে লেখক পরম্পরাগত

ঐতিহ্যকে উপেক্ষা করে কিছুদিনের জন্য তাদের মিলন ঘটিয়ে দেন। উপন্যাসের প্রতিবেদনে মতির মৃত্যু মানেই ঐতিহ্যবিরোধী নারীর কঠোর চিরকালের জন্য স্তব্ধ করে দেওয়া। এই স্তব্ধতার মধ্যেই কিংবা মতির মৃত্যু বিশ্বেশ্বরের জীবনে ছিল একেবারেই অনাকাঙ্ক্ষিত।

অন্যদিকে মানীর মত শান্তিও পরকীয়া প্রেমে আসক্ত। পরকীয়া প্রেমিক বিপিন তার প্রেমে গভীরভাবে আবদ্ধ হয়েই মূলত সামাজিক প্রতিকূলতার কথা ভেবে সে পালিয়ে যায়। শান্তির কাছ থেকে পালিয়ে যাওয়ার মধ্যেই বিপিনের পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার ছবি স্পষ্ট। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীকে নিয়ে রঙ্গ-তামাশা কিংবা ভোগ করা যায় কিন্তু উপযুক্ত সম্মান দেওয়া যায় না। বিপিনের বিদায় দৃশ্যকে লেখক এভাবে এঁকেছেন —

“..... শান্তি গাছের গুঁড়ির কাছে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে তাহার দিকে  
চাহিয়া আছে, ..... এই ছবিই বিপিনের স্মৃতিপটের বড় উজ্জ্বল, বড়  
স্পষ্ট, বড় করুণ ছবি।” ২০

শান্তির ‘একদৃষ্টে’ চাওয়াটাই হল আকাঙ্ক্ষার প্রতীক এবং ‘গাছের গুঁড়ির কাছে দাঁড়ানো’ এর অর্থ হল, নির্দিষ্ট কোনও এক জায়গার মধ্যে অবস্থান করা। অর্থাৎ সামাজিক ঐতিহ্যের গণ্ডিবদ্ধ লক্ষণরেখার মধ্যেই নারীর আশা-আকাঙ্ক্ষা আবদ্ধ। আর এই আবদ্ধতার জন্যেই সে তার প্রবহমান আকাঙ্ক্ষাকে জীবনে পরিপূর্ণ করতে পারেনি। বিপিনের চলে যাওয়া শান্তির কাছে ছিল অনাকাঙ্ক্ষিত।

নারীর আশা-আকাঙ্ক্ষাকেও শাস্ত্রের শাসনে নিয়ন্ত্রণ করে হত। তবে অনেক সময় তার ব্যতিক্রমও চোখে পড়ত। মূলত এইসব ব্যতিক্রমী নারীরা ছিল হয় বিধবা না হয় বিবাহিতা। অবিবাহিত নারী খুব কমই শাস্ত্রের গণ্ডিকে অতিক্রম করার চেষ্টা করেছে। ‘বিধবা বিবাহ’

আইন সমাজে প্রচলিত হওয়ার পরই নারী তার জীবনে নতুন স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করে। যোপাখালির কাছারিতে বিনোদবাবু-কামিনী যাদবের সম্পর্ক, বীণা-পটলের লুকিয়ে লুকিয়ে কথা বলা, বিপিনের সঙ্গে মানীর কিংবা শান্তির গোপন প্রেম – উনিশ শতকের সমাজ-বাস্তবতার নতুন ফসল। বিপিনের সঙ্গে টকি দেখতে গিয়ে শান্তির মনে প্রশ্ন জাগে –

“..... আচ্ছা বলুন তো, আপনার সঙ্গে বসে এমনভাবে টকি দেখবো

একথা কখনো ভেবেছিলেন?”<sup>১১</sup>

পরকীয়া প্রেমিক-প্রেমিকা খোলামাঠে একসঙ্গে বসে গল্প করা, হাঁটা তৎকালীন সময়ে অবশ্য অভাবনীয় ঘটনা। শান্তির সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে স্টেশনে বিপিনের সঙ্গে তার পূর্ব প্রেমিকা মানীর দেখা হয়। মানীই ছিল বিপিনের ডাক্তারি বিদ্যা শেখার মূল চাবিকাঠি। তাকে সামনে পেয়ে বিপিন আনন্দে আত্মহারা। কিন্তু পূর্বমনিব অনাদিবাবুর মৃত্যুর খবর শুনে বিপিন দুঃখে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়ে। এখানে সমালোচক টোডোরোভের একটি মন্তব্য আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য

“..... human existence its originally social and cannot be reduced to its biological dimension being deprived of those characteristics that make it human.”<sup>১২</sup>

সমাজসত্তাই মানুষের প্রধান উপাদান। বিপিন সমাজসত্তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তাই অনাদিবাবুর পারলৌকিক ক্রিয়া-কর্মে উপস্থিত থাকে। কোনও জৈবিক আকাঙ্ক্ষায় নয়, মানী ও বিপিনের মধ্যে গড়ে ওঠে পারস্পরিক নিবিড় সম্পর্ক। তবে এই সম্পর্ক গড়ে উঠলেও উভয়ের মধ্যে খুব শীঘ্রগীরই চিরবিচ্ছেদ ঘটে। এই বিচ্ছেদ লেখকের স্বনির্মিত। পরকীয়া



প্রেমিক-প্রেমিকার অবৈধ মিলন সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয় বলেই লেখক এই বিচ্ছেদের পরিসর এঁকেছেন। তাই মানীর মুখ দিয়ে লেখক বলেন —

“আর জন্মো ! এ জন্মো যাদের ওপর যা কর্তব্য আছে, করে যাই  
বিপিনদা।” ১৩

এখানে লেখকের সংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতা স্পষ্ট। প্রগতিশীল মানসিকতার পরিবর্তে লেখক হিন্দুত্ববাদী ঐতিহ্যকে গ্রহণ করেছেন। আর মনীও এখানে তোতাপাখির মত পুরুষতন্ত্রের শেখানো বুলি পাঠকসমাজের সামনে তুলে ধরে। আসলে নারী তার নিজের ঘরেই বন্দী। এই বন্দীত্বের শৃঙ্খল ভেঙে বের হয়ে আসার শক্তি মনী তথা নারীসমাজের নেই। প্রতীচ্যের শিক্ষা-সংস্কৃতি আমাদের মনকে কিছুটা হলেও আধুনিক মানসিকতা সম্পন্ন করে তুলেছে। কিন্তু পুরোপুরি ঐতিহ্যের গণ্ডিকে অতিক্রম করতে পারেনি। এই ঐতিহ্যের পরিসরে আত্মসমর্পণ করার ফলেই উপন্যাসের কোনও কুশীলবের মনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণতা লাভ করতে পারেনি। অনেক সময় তাদের জীবনে ঘটেছে অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা। এভাবে ধরা পড়ে ‘বিপিনের সংসার’ উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর কাঙ্ক্ষিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত জীবনের দ্বন্দ্ব।

## উল্লেখপঞ্জি —

- ১। Ralph Fax -- The Novel and the people, 1954, Moscow Ed. P. 82.
- ২। স্বপন বসু - বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস, ২০০৩, পুস্তক বিপনি, পৃঃ ১০৬।
- ৩। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় - বিভূতি রচনাবলী — জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, (৭ম খণ্ড) ১৪০৪, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃঃ ১৪৭।
- ৪। তপোধীর ভট্টাচার্য - 'প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, ১৯৯৭, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, পৃঃ ১৪২।
- ৫। বদরুল হাসান - উনিশ শতক : নবজাগরণ ও বাঙলা উপন্যাস, ১৯৯০, জগৎমাতা পাবলিশার্স, পৃঃ ৯২।
- ৬। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় - পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২১২।
- ৭। তদেব - পৃঃ ২৩৪।
- ৮। তদেব - পৃঃ ২৩৭।
- ৯। তপোধীর ভট্টাচার্য - পূর্বোক্ত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, পৃঃ ১৪১।
- ১০। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় - পূর্বোক্ত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, পৃঃ ২৭৭।
- ১১। তদেব - পৃঃ ১৩৭। ২৬৪
- ১২। তপোধীর ভট্টাচার্য - 'বাখতিন : তত্ত্ব ও প্রয়োগ' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, ১৯৯৬, পুস্তক বিপনি, পৃঃ ১১১।
- ১৩। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় - পূর্বোক্ত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, পৃঃ ২৩৪। ২৭৪

## দুইবাড়ি

বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ জীব মানুষ। এ জগতে মানুষের আকাঙ্ক্ষার কোনও শেষ নেই। জগতের সবকিছুই মানুষ হাতের মুঠোয় ধরে রাখতে চায়। ভারতীয় সমাজে এই ধরে রাখার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে ওঠে প্রতীচ্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে। ঔপনিবেশিক শক্তি আমাদের আকাঙ্ক্ষাকে যেমন সীমাহীন করে তুলে তেমনি শাসন ও শোষণের মাধ্যমে আমাদের পল্লীসমাজের স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতিকে ধ্বংস করে। ফলে সমাজেও দেখা দেয় একধরনের বিপর্যয় ও সংঘাত। এ সম্পর্কে সমালোচক গোপাল হালদার লিখেছেন —

“বাঙালী সমাজে ও ভারতীয় সমাজে তাই ইংরেজ রাজত্বে গতানুগতিক সামন্ততন্ত্রের ব্যবস্থা ভেঙে যেতে লাগল, কিন্তু ধনিকতন্ত্রী জীবনযাত্রাও গড়ে উঠতে পারল না। বরং সেই শূন্যতার মাঝখানে ইংরেজ শাসকরা দাঁড় করিয়ে রাখল একটা ‘আধা-সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ব্যবস্থা’ — দেশী রাজা - জমিদার - মহাজন প্রভৃতি ইংরেজ শাসনের তাঁবেদার, দায়িত্বহীন আমলাতন্ত্র ও ব্রিটিশ ধনিক-ব্যবস্থার ক্রমবর্ধিত শোষণ, .....। ইংরেজ শাসন চেপে বসলে যা, ঘটবার কথা তা, সমাজ-বিপ্লব নয়, তার নাম সমাজ-বিপর্যয়।”

এই সমাজ বিপর্যয়ে ও সামাজিক সংঘাতের আঘাতে বাঙালির জীবন পরিসরে দেখা দেয় ‘দিন বদলের পালা’। এই ‘দিন বদল’ অবশ্য সমাজে স্বাভাবিক নিয়মে আসেনি, এসেছে সমাজের বাইরে থেকে। বলা যায় ধনিক শোষণের তাড়নার কিংবা বিদেশীয় ধনিক শাসনবস্ত্রের চাপে।

কলা বাহুল্য অস্ত্রবাসী সমাজের জীবন যাত্রার বিকাশের ফলে এই পরিবর্তন ঘটেনি।

বিদেশীয় ধনিক সমাজের কিংবা শাসনযন্ত্রের চাপে রামতারণ চৌধুরীর মত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের আর্থিক অবস্থানের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনের ঢেউ-এ রামতারণবাবুর মত জমিদার ব্যক্তিরও আর্থিক অভাব-অনটন দেখা দেয়। অভাব-অনটন এতটাই প্রকট হয় যে ছেলে নিধুকে টাকা ধার করার জন্যে প্রতিবেশি হরি বাগদীর কাছে পাঠান। নিধু ঔপনিবেশিক শিক্ষায় শিক্ষিত। সে মোস্তারি পরীক্ষা দিয়ে শাসন, শোষণ করার নীতিগুলি ভালভাবে জেনে নিয়েছে। এখানে ড. তপোধীর ভট্টাচার্যের একটি মন্তব্য উল্লেখনীয় —

“উপনিবেশবাদের কাছে জ্ঞানও পীড়নের হাতিয়ার। পৌর সমাজ ও রাজনৈতিক সমাজে প্রতাপ বাদের হাতে বেক্সীভূত, তাদের স্বার্থের পোষকতা করার জন্যই জ্ঞান ব্যবহৃত হয়ে থাকে।”<sup>২</sup>

ঊধু নিধু নয়, এরূপ ভদ্রলোকেরা গ্রামের অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত মানুষদেরকে চিরকাল-ই শোষণ করে আসছে এবং এটি ছিল তাদের কাছে ঐতিহ্যগত ব্যাপার। লেখকের ভাষায় বলা যায় -

“গ্রামের ভদ্রলোক বাসিন্দা যাঁরা, তাঁরা চিরকাল এইভাবে গ্রামের নিম্নশ্রেণীর নিকট হইতে কখনো চোখ রাঙাইয়া কখনো মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া ধারে জিনিসপত্র খরিদ করিয়া চালাইয়া আসিতেছেন - ইহা এ গ্রামের সনাতন প্রথা।”<sup>৩</sup>

সেখানেই প্রতাপ কিংবা পীড়ন সেখানেই বিদ্রোহ আর সংঘর্ষ। তাই ছনু-র মত অস্ত্রবাসীবর্গ চিরকালই শোষিত হলেও সময়বিশেষে প্রতিরোধ কিংবা বিদ্রোহ করার মানসিকতাও দেখা

যায়। এখানে সমালোচক হোল্লিও ভাবার একটি মন্তব্য উল্লেখনীয় —

"..... requires an alternative set of questions, techniques and strategies in order to construct it." <sup>৪</sup>

বিকল্প শক্তির জোরে ঐতিহ্যকে বিনির্মাণ করে ছনু কাছারির নায়েবের কাছে রামতারণবাবুর বিরুদ্ধে নালিশ জানায়। নায়েব কর্তৃক রামতারণবাবু তিরস্কৃত হয়ে ভাবেন —

“কালে কালে সবই সম্ভব হইয়া উঠিল” <sup>৫</sup>

সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবন পরিসর, আকাঙ্ক্ষা সবকিছুরই পরিবর্তন ঘটে। বিনির্মিত জীবন পরিসরে অস্তুবাসী সমাজ ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে আধুনিক জীবন প্রবাহের দিকে এগিয়ে যায়। এই জীবনপ্রবাহে অস্তুবাসীবর্গ অনেক হোচট খেয়েও সমাজ-সাহিত্যে নিজস্ব জায়গা তৈরি করে নেয়। গায়ত্রী স্পিভোক চক্রবর্তীর ভাষায় বলা যায় —

"Marginality ..... is infact the name of a certain constantly changing set of representations that is the condition and effect of it." <sup>৬</sup>

নিজের শ্রেণীভুক্ত নায়েবের কাছে এভাবে তিরস্কৃত হবেন, ছনুর কাছে অপদস্থ হবেন, রামতারণবাবু কখনও ভাবতে পারেননি। তার জীবনে এসব ঘটনা ছিল একেবারেই অনাকাঙ্ক্ষিত।

এরূপ অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা রামতারণবাবুর জীবনে ঘটে। তা সত্ত্বেও তিনি দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে নিখুঁত মোক্তারি ব্যবসা করার জন্য বাল্যবন্ধু যদু মোক্তারের কাছে পাঠান। কিন্তু কোর্টে মক্কেল শোষণের ঘটনা দেখে নিখুর মোক্তারি ব্যবসা করতে ইচ্ছে হয় না। ইংরেজরা যেভাবে ভারতবাসীর উপর শোষণ-শাসন চালিয়ে যেত ঠিক সেইভাবে উকিল-মোক্তাররা

মকেলদেরকে শোষণ করে যেত। এই আইন ব্যবসায়ীরা ছিল ঔপনিবেশিক শাসক সম্প্রদায়ের ভাবশিষ্য। সন্দেহপূর মন্তব্যের মৌলবি ছিলেন রামতারণবাবু ও যদুবাবুর প্রায় সহপাঠী। সেই সময়ে মুসলমান সমাজ ইংরেজ বিরোধী মনোভাব গ্রহণ করার ফলে সরকারি কোনও উচ্চপদে তারা আসীন হতে পারেনি। শাসকগোষ্ঠীও মুসলমানদের প্রতি বিমাতৃসুলভ ব্যবহার করত। মুসলমানদের প্রতি বিমাতৃসুলভ আচরণ দেখে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকা লেখে —

"They have neither sought out Mahomedan talent, nor given encouragement enough to create it in abundance."

তবে, এজন্য দায়ী তৎকালীন কিছু মুসলমান নেতা ও মৌলানা সম্প্রদায়। মৌলানা ইনায়েৎ আলী খান বাংলার প্রকাশ্যে ব্রিটিশ ও শিখদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধের আহ্বান জানান। তারা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন —

"When the English Government is overthrown and the Mahomedan Government [is established] in its place, there would be no taxes to pay and the Mahomedan religion would be exalted."

তাই, মুসলমান সমাজ ব্রিটিশদের ভাষা-সংস্কৃতিকে গ্রহণ না করে নিজেদের ঐতিহ্যগত শিক্ষা-সংস্কৃতিকে আঁকড়িয়ে ধরে। সমালোচক গোপাল হালদারের ভাষায় বলা যায় —

“ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার ফলে বাঙালী হিন্দু যখন আধুনিক শিক্ষা দীক্ষা সংগ্রহ করেছে (১৮১৭ থেকে) ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার বিরোধিতায়, বাঙালী মুসলমান তখন সামন্ত যুগের গোঁড়ামিকে আরও সবলে

আঁকড়ে ধরছে।”<sup>৯</sup>

যদুবাবুর মত হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা যখন ইংরেজি ভাষা শিখে নানাভাবে টাকা-পয়সা উপার্জন করছে তখন মৌলবি সাহেবের মত ব্যক্তির গ্রামের মাদ্রাসা-মক্তবে ঐতিহ্যগত শিক্ষাদান করে কোনরকমে দিনযাপন করছেন। মৌলবিসাহেব নিজের দুঃখের কথা নিধুকে বলেন —

“ওঃ, অনেক পয়সা কামাই করে। সবই নসীব, বুঝলে ? ..... দ্যাখ

আমি কি করচি — আর যদু কি করচে !”<sup>১০</sup>

এই ভাগ্য বিপর্যয় মৌলবি সাহেবের নিজস্ব তৈরি নয়; সমাজের তৈরি। ঐ সময়ে মাইনর পাশ করা মৌলবি সাহেবের জীবনে এ ধরনের দুঃখ ছিল অনাকাঙ্ক্ষিত।

হিন্দু সমাজেও শিক্ষিত মানুষের মন থেকে ঐতিহ্যের রীতি-নীতি সম্পূর্ণভাবে মুছে যায়নি। ইংরেজি শিক্ষিত, সরকারি চাকুরিতে নিযুক্ত জজ লালবিহারীবাবু ঐতিহ্যানুসারে দুর্গাপূজা দেওয়ার জন্য নিজগ্রামে আসেন। গ্রামে এসে মহাধুমধামে তিনি দুর্গাপূজা সমাপন করেন। সেই সময়ে হিন্দুরা সরকারি উচ্চপদে বসার সুযোগ পেলেও বেকারত্বের সংখ্যাও কম ছিল না। যে কয়েকজন উপার্জনের সুযোগ পেয়েছিল তারাও মন মত উপার্জন করতে পারেনি। তাই নিধু কোটে মোক্তারি ব্যবসা করতে গিয়ে ভাবে —

“..... এর চেয়ে স্কুল-মাস্টারি করা অনেক ভালো ছিল।”<sup>১১</sup>

কিন্তু নিধুবাবু এটাও ভালভাবে জানেন, স্কুল মাস্টারির চেয়ে মোক্তারি করাই ভাল। এখানে আসলে উনিশ শতকের পরবর্তী সময়ে বাঙালি জনসাধারণের মনের দোলাচলবৃত্তি-ই প্রকাশ পেয়েছে। তাই জজসাহেব নিধুর উপার্জনের বিষয়ে কথা তুলতেই সে বলে —

“..... আজ্ঞে, এৰ্ব্ব রকম হচ্ছে। সবে তো বসেচি —” ১২

অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মোক্তারি ব্যবসায় নামে উপন্যাসের নায়ক নিধুবাবু। কিন্তু প্রত্যাশা অনুযায়ী উপার্জন না হওয়ার নিধুর মন ভেঙে পড়ে। সে লালবিহারীবাবুর মেয়ে মঞ্জুকে ভালবাসলেও সবার সম্মুখে সে কথা প্রকাশ করার সাহস পায়নি। সে ভাবে —

“তাহাকে ভালো পীগিলেই বা কি, উহারা তো তাহার সহিত মেয়ের

বিবাহ দিতে যাইতেছে না!” ১৩

তা সত্ত্বেও মঞ্জুর চাল-চলন, কথা-বার্তা, গান-বাজনা তাকে আকর্ষণ করে।

মঞ্জু শহরের মেয়ে। আধুনিক শিক্ষা, সংস্কৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে সে পরিচিত। গ্রামের রক্ষণশীল আচার-আচরণ থেকে সহস্রযোজন দূরে তার বসবাস। সিমুলে স্কুলে পড়া মঞ্জুকে দেখে নিধু ভাবে —

“..... পাড়াগাঁয়ে মেয়েরা হাইস্কুলে পড়া দূরের কথা, অনেকে বাংলা

লেখাপড়াই ভালো জানে না। নিধুর মনে হইল সে এমন একটি

জিনিস দেখিতেছে, যাহা সে কখনো পূর্বে দেখে নাই।” ১৪

মেয়ের কণ্ঠে গান-বাজনা নিধুর কাছে নতুন অভিজ্ঞতা স্বরূপ। কারণ সামন্ততান্ত্রিক ঐতিহ্যগত সমাজে ‘এসব দৃশ্য কল্পনার অতীত’। মঞ্জু আধুনিক নারী। সে ঐতিহ্যকে বিনির্মাণ করে গ্রাম বাংলায় আধুনিক চাল-চলনের প্রচলনের পথ মুক্ত করে দেয়। তার মনে কোনও লজ্জা, সংকোচ নেই এবং তার ব্যবহার বেশ সহজ-সরল। সে নির্দিষ্ট নিধুর সঙ্গে মেলামেশা করে। গণ্ডিবন্ধ সমাজ ব্যবস্থার বাইরে মঞ্জুর অবস্থান। সমাজের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ না থাকলেও মঞ্জু নিজ ব্যক্তিত্বকে বিসর্জন দেয়নি। এখানে বিশিষ্ট তান্ত্রিক ম্যাগির একটি মন্তব্য উল্লেখনীয় —



"We debrief ourselves and step out of the contaminated space suits women by established patriarchal aesthetics."<sup>১৫</sup>

নাটক নির্বাচন থেকে আরম্ভ করে সমাজের ভাল-মন্দ বিচার করার ক্ষমতাও তার ছিল। নিধুর ব্যবহারে মঞ্জু খুশি হয়ে ভাবে —

“চাল-দেওয়া-ছোকরা সে তাহার মামার বাড়ীর আশে-পাশে অনেক দেখিল, কিন্তু নিধুদার মধ্যে বাজে চাল এতটুকু নাই .....।”<sup>১৬</sup>

খাবার নিয়ে অপেক্ষমান অভুক্ত মঞ্জুকে বসে থাকতে দেখে নিধু ভাবে —

“কই, কোনো মেয়ে তো এ পর্যন্ত তাহার না খাওয়ার জন্য নিজেকে অভুক্ত রাখে নাই ! .... নিজের সৌভাগ্যকে সে যেন বিশ্বাস করিতে পারে না।”<sup>১৭</sup>

মঞ্জুর প্রেমে মশগুল নিধু আদালতে যাওয়ার কথাই ভুলে যায়। মঞ্জুও নিধুকে কুড়ুলগাছিতে কয়েকদিন থাকার অনুরোধ করে। মঞ্জুর মুখে এধরনের কথা শুনে নিধু ভাবে —

“সে থাকিলে নাকি মঞ্জুর ভালো লাগে — মঞ্জুর মুখে এ কথা সে কোনোদিন শুনিলে, ইহা বহুদূর নীল সমুদ্রের পারে স্বপ্নদ্বীপের মতো অবিশ্বাস্য ও অবাস্তব !”<sup>১৮</sup>

সে বুঝে, ধনী ঘরের দুলালী, মঞ্জুর মত আধুনিক নারী, জজসাহেবের মেয়ের বিয়ে কখনও গরিব মোজারের সঙ্গে হতে পারে না। তাই মঞ্জুর আকাঙ্ক্ষাকে উপেক্ষা করে নিধু মহকুমা সদরে চলে যায়। এদিকে তরুণ হাকিম সুনীলবাবুর সঙ্গে মঞ্জুর বিয়ের আলাপ-আলোচনা চলার

ফলে মঞ্জু নিজে দুঃখিত হয়। লেখকের ভাষায় —

“..... ভরসাহারা ক্ষুদ্র বালিকার মতো মঞ্জু বসিয়া চোখের জল ফেলিতেছে

— ছবিটা চিরকাল নিধুর মনে গাঁথিয়া গিয়াছিল।” ১৯

নারীর বেদনা নারীর অন্তরেই থাকে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর নিজস্ব কোনও মতামত নেই। নারী জীবনের বিভিন্ন পর্বে বিভিন্ন ভাবে পুরুষের অধীনে জীবন অতিবাহিত করে। নারী শিক্ষিত হলেও এই সমাজে তার জগৎ, ভাষা, চেতনা একবাচনিক।

তবে সামাজিক লক্ষণরেখাকে অতিক্রম করে মঞ্জু ও হৈম নাটকে নিধুর সঙ্গে অভিনয় করে। হৈম ছিল নিধুর বাল্য বন্ধু। সে নিধুকে ভালবাসে। কিন্তু তার অন্য এক পুরুষের সঙ্গে বিয়ে হয়। বিয়ের পরও সে তার বাল্যবন্ধুকে নির্দিষ্টায় বলে —

“আমার কথা মনে হয় নিধুদা ?” ২০

কিন্তু নিধু এই ভালবাসার কোনও মূল্য দেয়নি। কারণ পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর একতরফা ভালবাসা কিংবা ভাললাগার কোনও মূল্য নেই।

কোনও এক রাতে নিধু স্বপ্ন দেখে —

“কোথায় যেন সে একটা পথ বাহিয়া চলিয়াছে — তাহার সামনে একটা বড় পুকুর ..... পুকুরের পাড়ের ছোট একটা কুঁড়েঘর হইতে লাস্যময়ী মঞ্জু বাহির হইয়া আসিল, অথচ দুজনেই দুজনকে জানে ও চিনিতে পারিয়াছে। মঞ্জু যেন দুলেবাড়ীর মেয়ে, ব্রাহ্মণের মেয়ে নয়, দুজনে অবাধে অসঙ্কোচে পুকুরপাড়ে বসিয়া জলে টিল ফেলিতেছে ও অনর্গল বকিয়া বাইতেছে — মঞ্জু জজের মেয়ে নয়, তাহার সঙ্গে

মেশায় কোনো বাধা নাই যেন।” ২১

আসলে, বাস্তব জীবনে তাদের মিলনের কোনও সুযোগ না থাকায় ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ পরাজগতের আশ্রয় নেন। বাস্তব জগতে যা সম্ভব নয় ; তা পরাজগতে তথা স্বপ্নের মধ্যদিয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করে। এই স্বপ্নের কথা মনে করে নিধু ভাবে —

“..... এই বাড়ী, এই ঘর চোখে দেখিয়াও উহারা সে বাড়ির ছেলের সঙ্গে অমন সুন্দরী, শিক্ষিতা মেয়ের বিবাহ দিবে - এ কি কখনো সে ভাবিয়াছিল ?” ২২

যা কোনদিন সম্ভব নয়, অথচ নিধুর চিরকাঙ্ক্ষিত সে তা-ই স্বপ্নে দেখেছে। সে মঞ্জু সম্পর্কে মন্তব্য করে —

“আগেও তো কেহ ছিল না এ বাড়ীতে, কখনো কেহ থাকিত না, এখনো কেহ নাই, ইহাতে নতুন কী আছে ? ..... মধ্যে যে আসিয়াছিল, সে তো দুদিনের স্বপ্ন।” ২৩

যখন-ই মানুষ তার আকাঙ্ক্ষিত বস্তুকে হাতের নাগালের মধ্যে পায় না, তখন-ই সেই বস্তুকে স্বপ্নের বিষয় বলে ভাবে। এই স্বপ্নের মধ্যদিয়েই আকাঙ্ক্ষিত বিষয়কে বাস্তবায়ন করা হয়। নিধুর স্বপ্নের জগতকে বুঝতে হলে সমালোচক ব্রায়ান ম্যাকহেলের একটি মন্তব্য এখানে উল্লেখনীয় —

"The fantastic ..... involves a face-to-face confrontation between the possible (the real) and the impossible, the normal and the paranormal. Another world penetrates or

encroaches upon our world, or representative of our world  
penetrates an outpost of the other world, the world next  
door." ২৪

এজন্যেই ঔপন্যাসিক তাদেরকে স্বপ্নের জগতে মিলন ঘটিয়ে দেন।

কিন্তু স্বপ্নের জগতে বেশিসময় মশগুল থাকা যায় না ; একসময় স্বপ্নশূন্য বাস্তব জগতে ফিরে আসতে হয়। তাই উপন্যাসের অন্তিম লগ্নে আমরা দেখি, নিধু আর মঞ্জু কোনও বিদায় গ্রহণের সুযোগ পায় না। কর্মক্ষেত্র থেকে ফেরার পথে মঞ্জু সম্বন্ধে নিধু ভাবে —

“দুদিনের জন্য আসিয়াছিল - আবার বহু, বহু দূরে চলিয়া যাইবে।” ২৫

যা ভাবা হয়, অনেক সময় তা-ই বাস্তবে পরিণত হয়। সেদিনই ফেরার পথে জ্বরে অচেতন্য হইয়া নিধুবাবু সাঁকোর উপরে পড়ে। অজ্ঞান, অচেতন্য নিধুবাবু মূলত টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত হয়। দীর্ঘদিন পর সুস্থ হয়ে ওঠে দেখতে পার মঞ্জুদের বাড়ি তালাবন্ধ। তখন তার মনের ভাবকে লেখক এভাবে তুলে ধরেন —

“অনেকদিন পরে নিধুর রোগ-ক্ষীণ স্মৃতিপটে একখানি আনন্দময়ী

বালিকামূর্তিও অস্পষ্ট ভাসিয়া উঠিল।” ২৬

যায়ের মুখে নিধু শুনে, মঞ্জু ও হৈম নিজ নিজ গন্তব্যস্থলে যাওয়ার পূর্বে তার অনেক সেবা যত্ন করেছে। বিশেষতঃ মঞ্জু কত যে চোখের জল ফেলেছে, ঔষধ-পত্রের সমস্ত ব্যবস্থা-ই জজ সাহেবকে বলে সে করে দিয়েছে।

নিধু যাকে মনে মনে ভালবেসেছিল, যাকে সমস্ত মন-প্রাণ উজাড় করে ভালবাসা দিয়েছিল, সে ছিল তার পরম কাঙ্ক্ষিত। অথচ তার জীবন থেকে সে হারিয়ে গিয়েছে। আর

কোনদিন মঞ্জুর সঙ্গে নিধুর দেখা-সাক্ষাৎ ঘটবে না। তার কাঙ্ক্ষিত প্রেমিকা মঞ্জুর চলে যাওয়া নিধুর কাছে অপ্রত্যাশিত, অনাকাঙ্ক্ষিত। সে ভাবতেই পারেনি, মঞ্জু চিরদিনের জন্য তার জীবন পরিসর থেকে হারিয়ে যাবে। এভাবে সূচিত হয়েছে বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর কাঙ্ক্ষিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত জীবনের দ্বন্দ্ব।

## উল্লেখপঞ্জিঃ—

- ১। গোপাল হালদার : 'বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা', দ্বিতীয় খণ্ড-১৩৬৫, এ.  
মুখার্জী অ্যান্ড কোং, প্রাঃলিঃ, কলকাতা-১২।
- ২। সমীর রায়চৌধুরী (সম্পা) : 'পোস্ট কলোনিয়ালিজম : উত্তর ঔপনিবেশিকতা' গ্রন্থ  
থেকে উদ্ধৃত, ১৯৯৬, হাওয়া উনপঞ্চাশ প্রকাশনী,  
পৃঃ ৯১।
- ৩। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিভূতি রচনাবলী -জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, (৫ম খণ্ড)  
১৪০৪, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃঃ ১৫৮।
- ৪। সমীর রায় চৌধুরী : পূর্বোক্ত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, পৃঃ ৯৪।
- ৫। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : পূর্বোক্ত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, পৃঃ ১৫৯।
- ৬। তপোধীর ভট্টাচার্য : 'প্রতীচ্যের সাহিত্য তত্ত্ব' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, অমৃতলোক  
সাহিত্য পরিষদ পৃঃ ৯৪।
- ৭। স্বপন বসু : 'বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস', গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, তৃতীয়  
সং, ২০০৩, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯, পৃঃ ২০৮।
- ৮। নিখিল সুর : 'ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পটভূমি' গ্রন্থ  
থেকে উদ্ধৃত, ১৯৮৯, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ,  
কলকাতা-১৩, পৃঃ ৭০।
- ৯। গোপাল হালদার : পূর্বোক্ত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, পৃঃ ২৮।

- ১০। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : পূর্বোক্ত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, পৃঃ ১৬৪।
- ১১। অরুণ সেন : 'বিভূতিভূষণ : আধুনিক জিজ্ঞাসা' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত,  
২০০৩, সাহিত্য অকাদেমি, জীবনতারা, কল-৫৩পৃঃ ১০২।
- ১২। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : পূর্বোক্ত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, পৃঃ ১৬৬।
- ১৩। তদেব : পৃঃ ১৬৯।
- ১৪। তদেব : পৃঃ ১৭০।
- ১৫। তপোধীর ভট্টাচার্য : পূর্বোক্ত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, পৃঃ ১৪১।
- ১৬। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : পূর্বোক্ত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, পৃঃ ১৯৩।
- ১৭। তদেব : পৃঃ ২০৩।
- ১৮। তদেব : পৃঃ ১৯৪।
- ১৯। তদেব : পৃঃ ২২৬।
- ২০। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : পূর্বোক্ত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, পৃঃ ২৩০।
- ২১। তদেব : পৃঃ ২২২।
- ২২। তদেব : পৃঃ ২২৩।
- ২৩। তদেব : পৃঃ ২৩৯।
- ২৪। তপোধীর ভট্টাচার্য : বাখতিন : তত্ত্ব ও প্রয়োগ, ১৯৯৬, পুস্তক বিপনি,  
পৃঃ ১০০।
- ২৫। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : পূর্বোক্ত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, পৃঃ ২৩৭।
- ২৬। তদেব : পৃঃ ২৩৮।

## অথৈজল

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজের রীতি-নীতি, নিয়ম-কানুন, চাল-চলন মেনে চলাই মানব সমাজের কাজ। বিভূতিভূষণের ‘অথৈজল’ উপন্যাসের নায়ক শশাঙ্ক সমাজের একজন আদর্শ প্রতিনিধি। সে সমাজসেবী, নীতি-সচেতন, আধুনিক চিকিৎসক। তার স্ত্রী সুরবালা ভারতীয় ঐতিহ্যের নারীসত্তার প্রতীক। শশাঙ্ক শুধু গ্রামের ডাক্তার নয় ; গ্রামের সবধরনের সুবিধা-অসুবিধায় সামনে দাঁড়ায়। ইংরেজ শাসকদের মত সবকিছুতেই তার নজরদারী। বালবিধবা মেয়ে শান্তির সঙ্গে রামপ্রসাদের অবৈধ সম্পর্কের বিষয় নিয়ে গ্রাম্য বিচারসভায় ঔপনিবেশিক শাসকের মতই সে বিচারকের ভূমিকা পালন করে। এই সভায় শাসক সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে ছিলেন থানার দারোগাবাবু। দারোগাবাবু বিচারসভায় রামপ্রসাদ সম্পর্কে বলেন –

“তুমি দেখছি অমানুষ। ভদ্রলোকের গ্রামের মধ্যে যা কান্ড তুমি  
করছো, ব্রাহ্মণের ছেলে না হলে তোমাকে চাব্কে দিতাম ! বদমাশ  
কোথাকার !”

ঐতিহ্যগত প্রথানুসারে চতুর্বর্ণের শ্রেষ্ঠবর্ণ ব্রাহ্মণকে হত্যা কিংবা অত্যাচার করা মহাপাপ। ফলে বিচারসভায় রামপ্রসাদকে অপমানিত করে ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু পার্থিব জগতে জৈবিক কামনা চিরকাঙ্ক্ষিত। এই জৈবিক কামনার টানেই হোক আর মনের তাগিদেই হোক রামপ্রসাদ ঘর-সংসার ছেড়ে বালবিধবা মেয়ে শান্তিকে নিয়ে অচেনা-অজানা জায়গায় পালিয়ে যায়। বদ্ধ সমাজ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কিংবা কাঙ্ক্ষিত পৃথিবীতে জীবনের আকাঙ্ক্ষাকে পূরণের জন্য তার এই পলায়ন।



উনিশ শতকের নবজাগরণের প্রভাবে নর-নারীর মনে নতুন প্রেম চেতনা জেগে ওঠে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত নর-নারীর জীবনবোধের অন্যতম বাধা ছিল বাল্যবিবাহ। এছাড়াও নাবালকের সঙ্গে নাবালিকার বিয়ে অথবা নাবালিকার সঙ্গে বুড়ো মৃত্যুপথযাত্রী কোনও পুরুষের বিয়ে জীবনের সহজ বিকাশকে ত্বরান্বিত হতে দেয়নি। এছাড়াও সমাজব্যবস্থায় বিধবা বিয়ের কোনও রীতি প্রচলিত না থাকার জন্যে বিধবা নারীর আবার বিয়ের কোনও সম্ভাবনা ছিল না। ফলে নর-নারীর প্রেমের সুষ্ঠু বিকাশের পথ ছিল অবরুদ্ধ। তাই লক্ষণীয় শান্তির মত নারী যখন অনুভব করছে জীবনপ্রবৃত্তির তাড়না তখন সমাজ তাকে বিধবা বলে চিহ্নিত করেছে। ফলে শরীর ও মনের তাড়নায়, রোমান্টিক জীবনের আকাঙ্ক্ষায় যখনই বিধবা নারী কোনও পুরুষকে ভালবেসেছে, তখন সমাজ তাকে ব্যভিচারী বলে চিহ্নিত করেছে কিংবা সমাজ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। ফলস্বরূপ সেই বিধবা নারীকে হয়তো কাঙ্ক্ষিত পুরুষের সঙ্গে পালিয়ে যেতে হয়েছে কিংবা তার স্থান হয়েছে গণিকালয়ে। আর না হয় আত্মহত্যা করতে বাধ্য করানো হয়েছে।

সাধারণতঃ পুরুষতান্ত্রিক বদ্ধসমাজে অস্ত্রবাসী নারীর কোনও পরিসর নেই। তাই বালবিধবা শান্তি সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও সমাজবিরুদ্ধ প্রেমের জন্য তাকে গ্রামছাড়া হতে হয়। নারীর মন, বস্তুত তার আশা, আকাঙ্ক্ষা, চেতনা সবকিছুই পুরুষতন্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পুরুষের ইচ্ছানুসারে নারী পরিচালিত হয়। এই উপন্যাসে লক্ষণীয় একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হলেন হরিদাস ঘোষ। তার স্ত্রীর সঙ্গে গ্রামের এক যুবকের অবৈধ সম্পর্কের জেরে শেষপর্যন্ত তার স্ত্রী আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়। এই আত্মহত্যার জন্য দায়ী পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা। আর এটি শুধু আত্মহত্যা নয় ; একটি অস্ত্রবাসী নারীর আশা-আকাঙ্ক্ষার

অবদমন। অথচ এই অন্তর্বাসী নারীর জীবনে আত্মহত্যা করা ছিল সম্পূর্ণ অনাকাঙ্ক্ষিত। কেন না, প্রেম, ভালবাসা, জৈবিক ক্ষুধা, মানুষের কাছে চিরাকাঙ্ক্ষিত।

সমাজের অর্থাৎ পুরুষের আকাঙ্ক্ষাকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে নারীর ওপর। নারীর জগৎ, ভাষা, চেতনা সবকিছুই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাই স্ত্রী সুরবালার গাড়ি কেনার প্রস্তাব শশাঙ্ক মেনে নিয়েও শেষপর্যন্ত নানা অজুহাতে তা বাতিল করে দেয়। মঙ্গলগঞ্জের হাটে অনুষ্ঠিত পান্নার খেমটা নাচ দেখে শশাঙ্কবাবু তার প্রেমের জালে আবদ্ধ হন। সতী-সাধবী স্ত্রী সুরবালাকে বলেন —

“না, ওদের বারোয়ারি লেগেচে। আমি না থাকলে চলবে না।”<sup>২</sup>

সহজ-সরল সুরবালা সহজেই স্বামীর কথায় বিশ্বাস করে এবং তাকে মঙ্গলগঞ্জে যেতে আর বারণ করে না। স্ত্রীকে মিথ্যা কথা বলার জন্যে শশাঙ্ক নিজেই ভীষণ অনুতপ্ত। মানুষের জীবনপরিসর এক সরলরেখায় চলমান নয়। নদীর স্রোতের মত এঁকে বেঁকে এগিয়ে যায়। এখানে বিশিষ্ট তাত্ত্বিক মিশেল ফুকোর একটি মন্তব্য উল্লেখনীয় —

"The critical ontology of ourselves has to be considered not, certainly, as a theory, a doctrine, nor even as a permanent body of knowledge that is accumulating; it has to be conceived as an attitude, an ethos, a philosophical life in which the critique of what we are is at one and the same time the historical analysis of the limits that are imposed on us and an experiment with the

possibility of going beyond them." ৩

মানুষ তাই নিজস্ব সীমারেখা ভেঙে নানা পথ বেয়ে নিজের গন্তব্য রেখায় পৌঁছে। এরমধ্যে বিন্যস্ত থাকে ‘জীবন যাপনের মৌল দৃষ্টিকোণ, বিশেষ মূল্যবোধ এবং দর্শনের দ্যোতনা’। শশাঙ্ক পাশ করা ডাক্তার হয়েও গ্রামবাসীর উপকারার্থে গ্রামেই ডিসপেনসারির ব্যবস্থা করে। বলা যায়, গ্রামবাসীর সেবা করাই ছিল শশাঙ্কের জীবনদর্শন।

কিন্তু শশাঙ্কের জীবনদর্শনে ছেদ পড়ে পান্নার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর থেকে। ঘরে সতী-সাক্ষী স্ত্রীকে রেখে শশাঙ্ক এই খেমটাওয়ালী পান্নাকে নিয়ে কলকাতায় পালিয়ে যায়। বন্ধ গ্রাম্য সমাজে অবৈধ প্রেমের অনুমোদন না থাকায় তারা শহর কলকাতায় আশ্রয় নেয়। শহর কলকাতা ছিল ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর মূল কেন্দ্রস্থল। ঔপনিবেশিক শিক্ষা-সংস্কৃতি নাগরিক জীবনকে আধুনিক করে তুলে। কলকাতার মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় আধুনিক শিক্ষালাভের সুযোগ পায় ১৮১৭ খ্রিঃ হিন্দু স্কুল প্রতিষ্ঠার পর থেকে। আধুনিক শিক্ষালাভ তথা ইংরেজি বিদ্যা-শিক্ষা অর্জন করেই মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রথম অভিজাতদের সমকক্ষ বলে গণ্য হয়। এই ইংরেজি বিদ্যাশিক্ষার মূল উদ্দেশ্যই ছিল মানুষের বন্ধনমুক্তি। হিন্দুস্কুলের অবদান সম্পর্কে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর 'Literature of Bengal' গ্রন্থে লিখেছেন —

"..... They imbibed in that college a warm appreciation of western literature and western civilisation, and brooked with impatience the unreasoning restrictions which modern Hindu customs had imposed on them. .... The reforms effected by Iswar Chandra Vidyasagar were possible only

after Hindu society had been permeated with advanced ideas through a healthy English education." <sup>৪</sup>

তবে এই সময়ে বাঙালিমানস নতুন উপলব্ধি বা শিক্ষা-দীক্ষা-জ্ঞানকে গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধও করেছে। অনেকেই আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও রক্ষণশীল সমাজের গণ্ডি থেকে মুক্ত হতে পারেননি। এজন্যেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি শশাঙ্ক আধুনিক জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচিত হলেও তার মানসিকতা ঐতিহ্যগত ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কারাচ্ছন্ন। সে মঙ্গলগঞ্জে নেপাল প্রামাণিকের ঘরে খেতে বসে বলে —

“বড় ভক্তিমতী স্ত্রীলোক, ব্রাহ্মণের ওপর অমন ভক্তি আজকার কালে

বড় একটা দেখা যায় না।” <sup>৫</sup>

এই সংস্কার শুধু উঁচুবর্ণের মানুষের মধ্যে লালিত নয় ; লালিত রয়েছে নিম্নবর্ণের অস্ত্রবাসী নারীসমাজের মধ্যেও। অস্ত্রবাসী সমাজে এই সংস্কার ব্রাহ্মণ্যবাদীদের দ্বারা চাপানো বলেই নেপালের বড়বৌ বলে —

“..... ব্রাহ্মণের পাতে নুন দিয়ে তরকারি রেঁধে দেবো সে ভাগ্যি করিনি।

এ জন্যে আর তা হয়ে উঠবে না। নরকে পচে মরবো শেষে ?” <sup>৬</sup>

এই বক্তব্যটি আসলে তার নিজস্ব নয় ; সমগ্র অস্ত্রবাসী নিম্নবর্ণের নারীসম্ভার বক্তব্য। বলা যায় জাতি বর্ণ বিভেদের মাধ্যমে নিম্নবর্ণের ঘরে উচ্চবর্ণের জল অচল। তাদের হাঁড়িতে এমন কি তাদের হাতের রান্না স্পর্শ করাও সমাজ অনুমোদিত নয়। অথচ মানবিক ভাবনায় উজ্জীবিত সাধারণ মানুষের মনে এই ভেদাভেদ কাঙ্ক্ষিত নয় - সে আভাষ এখানে স্পষ্ট।

পান্নার প্রেমের জোয়ারে নিমজ্জিত শশাঙ্ক ভাবে -



“মেয়েমানুষের আকর্ষণে এমন হয় তা কোনোদিন আমার ধারণা  
নেই। ..... জীবনের এ এক অদ্ভুত ধরনের অভিজ্ঞতা।” ৭

নারীজাতিকে সে দুটো শ্রেণীতে ভাগ করে - একটি হল ‘মা’ আর অন্যটি ‘প্রেমিকা’। এই  
‘প্রেমিকা’ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত পান্না। পান্নার রূপে মুগ্ধ হয়ে বলে -

“মেয়েদের মধ্যে শ্রেণীভেদ আছে, সব মেয়ে সব পুরুষকে আকর্ষণ  
করতে পারে না।” ৮

পান্নার সান্নিধ্যে এসে শশাঙ্ক একথা মর্মে মর্মে বুঝে। তার স্ত্রী সুরবালা ছিল গুণবতী ও দেবীর  
মত মহিমাম্বিত। তাই কৃত্রিম প্রেমের নাগপাশে স্বামীকে আবদ্ধ করতে পারেনি। এ শ্রেণীর  
নারী সম্পর্কে শশাঙ্কের বক্তব্য -

“দেবীদের দোষ, মানুষকে এরা আকৃষ্ট করতে পারে না। শুধু দেবী  
নিয়ে কি ধুয়ে খাবো? আমার গোটা প্রথম যৌবন সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে  
গিয়েছে দেবীদের সংসর্গে। দূর থেকে ওদের নমস্কার করি।” ৯

যৌবনে প্রত্যেক পুরুষের কামনা যুবতী নারীর সঙ্গে রঙ্গ-তামাশা করে আনন্দ উপভোগ করা।  
স্ত্রী সুরবালার সঙ্গে সুখে দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করলেও শশাঙ্কের যৌবনের আকাঙ্ক্ষা  
পূর্ণতা লাভ করেনি। পূর্ণযৌবনে যে ব্যক্তি কোনদিন নারীসঙ্গের কামনা করেনি সেই ব্যক্তি  
মধ্যবয়সে এসে পান্নার রোমান্টিক প্রেমের আকাঙ্ক্ষায় উতলা। সে ভাবে -

“আমার সমস্ত মনপ্রাণ ওর উপস্থিতি কামনা করেনি কি?” ১০

পান্নার শ্রেণীভুক্ত নারীসত্তা রহস্যময়ী। এই রহস্যময়ী নারীসত্তার ঘোমটার আড়ালে উজ্জীবিত  
এক নিভৃত আবেগ ও গোপন অনুভূতি। কারণ, সামাজিক ও রাজনৈতিক গণ্ডিকে অস্বীকার

করে নারী নিজের জৈবিক অবস্থানের বহুবিচিত্র ও জটিল অভিজ্ঞতাগুলি প্রকাশ করতে পারে না। এমনকী সমাজে তাদের সব সত্য উচ্চারণের অধিকার নেই। এজন্যই শান্তি, হরিদাস ঘোষের স্ত্রীর মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা এই সমাজ বুঝতে চেষ্টা করেনি। শেষপর্যন্ত, তাদের জীবনে কাঙ্ক্ষিত প্রেমের পরিবর্তে নেমে আসে অনাকাঙ্ক্ষিত শান্তি।

অন্য এক বাল-বিধবা ব্রাহ্মণ নারী ঝড়ু মল্লিকের মত সর্বত্যাগী, ভাবুক গায়কের সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে ঘর সংসার গড়ে তুলে। বাস্তব সমাজের রক্ষণশীল নিয়ম-নীতিকে উপেক্ষা করে দাম্পত্য সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব নয় বলেই তাদেরকে বন্ধ সমাজ থেকে পালিয়ে অনেক দূরে চলে যেতে হয়। সে সময়ে সমাজে সত্যি অর্থে বিধবা নারীর পুনর্বিবাহের কোনও সম্ভাবনা ছিল না। সে ক্ষেত্রে প্রেমচেতনার কোনও নতুন সম্ভাব্য পরিসরের সৃষ্টি হলে বিধবাকে গোপনীয়তারই আশ্রয় নিতে হত। তবে পরবর্তী সময়ে বিধবা বিয়ের প্রথা সমাজে চালু হলে দু-একজন নারী রক্ষণশীল গণ্ডির বাইরে গিয়ে তাদের কাঙ্ক্ষিত পুরুষকে বিয়ে করেন। এই উপন্যাসেও আমরা দেখি, ব্রাহ্মণ বিধবা নারীকে বিয়ে করে ঝড়ুবাবু সুখে দাম্পত্য জীবন কাটান। সেও নিম্নবর্ণের পুরুষকে বিয়ে করে চিরকালীন ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে নিজের অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু লেখক বিভূতিভূষণ বর্ণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে উপন্যাসের মধ্যে ঝড়ুবাবুর স্ত্রীর মৃত্যু ঘটান। এই মৃত্যু ছিল লেখকের স্বনির্মিত। তবে তিনি আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে কিছুদিনের জন্য হলেও দুজনের দাম্পত্য জীবন পরিসরের সৃষ্টি করে দেন। ঝড়ুবাবুর স্ত্রীর মৃত্যুর মধ্যদিয়ে প্রগতিবাদী তথা আধুনিক মানসিকতা সম্পন্ন এক নারীর অস্তিত্বকে বিলীন করা হয়। বলা যায়, তাদের আকাঙ্ক্ষার অর্থাৎ জীবনের এক অনাকাঙ্ক্ষিত রূপায়ণ ঘটানো হয়।

মানুষের সমাজ সত্তাই মূল। সামাজিক রীতি-নীতির বাইরে গিয়ে কোনও মানুষ-ই

নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে পারে না। তাই বিশিষ্ট সমালোচক টোডোরোভ বলেছেন —

"..... human existence is originally social, and cannot be reduced to its biological dimension without being deprived of those characteristics that make it human." ১১

ঔপনিবেশিক শাসক সমাজের সহযোগিতায় ও রামমোহন-বিদ্যাসাগরের মত ব্যক্তিদের প্রচেষ্টায় উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সমাজে বিধবা বিয়ের আইন পাশ হয়। বিধবা বিবাহ চালু হলেও রক্ষণশীল সমাজ-বাস্তবতায় বাঙালি হিন্দু বিধবা নারীর ক্ষেত্রে তা মর্যাদার ছিল না। এজন্য-ই ঝড়ুবাবুর স্ত্রীকে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হয়। ফলে ঝড়ুবাবুর দাম্পত্য জীবনে নেমে আসে এক গভীর শূন্যতা। অন্যদিকে এই বদ্ধ সমাজের রক্তচক্ষুর আড়ালে থেকেও কিছুদিন পর শশাঙ্ক নিজ বাড়িতে ফিরে আসে। এখানে ড. বদরুল হাসানের একটি মন্তব্য উল্লেখনীয় —

“উনিশ শতকেই নরনারীর সম্পর্কের স্বাভাবিক স্বীকৃতি, এককে অবলম্বন করে অন্যের স্বার্থক হওয়ার বাসনা, এককে নিয়ে অন্যের স্বপ্ন দেখার কল্পনা, পাশ্চাত্য জীবনবোধের সংস্পর্শে এসে বাঙালীসমাজ তত্ত্বগতভাবে স্বীকার করে নিয়েছিল, কিন্তু জীবনে ও সাহিত্যে তার

প্রয়োগ ও প্রভাব বহুদিন পর্যন্ত স্বীকৃতি লাভ করেনি।” ১২

সমাজে স্বীকৃতি না থাকার জন্য শশাঙ্ক প্রেমের বন্ধনকে উপেক্ষা করে। তবে এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে তার সংস্কারবাদী চিন্তা-ভাবনা। সামাজিক দিক দিয়ে ভিন্নজাতের দুজন নর-নারীর মিলন অবৈধ ও ঐতিহ্যবিরোধী। ঐতিহ্যকে মেনে নিয়ে শশাঙ্ক ভাবে —

“আমার সমস্ত শরীর যেন সঙ্কুচিত হয়ে উঠলো, এত কালের সংস্কার  
যাবে কোথায় ?” ১৩

এমনকী সতী-সাধবী স্ত্রী সুরবালা লম্পট স্বামীর মিষ্টি কথায় সব দুঃখ ভুলে তার সেবার রত  
হয়।

উনিশ শতকের নবজাগরণের ঢেউ সামাজিক স্তম্ভকে বিনির্মাণ করে। সমসাময়িক  
সময়ে গ্রাম-বাংলায় কৃষি, শিল্পের বিনির্মাণে সৃষ্ট নগর সভ্যতাকে অবলম্বন করে মানুষের মধ্যে  
দৈনন্দিন জীবনের আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের বাসনা জেগে ওঠে। ব্যবসা, বাণিজ্য, চাকুরির সুযোগ  
ও সম্ভাবনা নিয়ে মানুষ কর্মমুখর হয়ে ওঠে। সমালোচক ড. বদরুল হাসানের মতে —

“বস্তুজগতের সমস্ত প্রেরণা ও প্রাচুর্যকে আত্মস্থ করে, বিদ্যার সঙ্গে

বিশ্বের, জ্ঞানের সঙ্গে কর্মের সহাবস্থান শুরু হয়েছিল।” ১৪

‘বিদ্যার সঙ্গে বিশ্বের, জ্ঞানের সঙ্গে কর্মের’ সার্থক রূপায়ণ ঘটে শশাঙ্কবাবুর জীবনের মধ্যভাগ  
পর্যন্ত। রূপ-লাবণ্যময়ী নারী পাল্লার সান্নিধ্যে এসে তিনি ঘর সংসার, কাজ-কর্ম, সবকিছু ভুলে  
যান। লেখকের ভাষায় বলা যায় —

“..... ওকে পেয়ে দুনিয়া ভুল হয়ে গিয়েছে আমার। পূর্ব আশ্রমের

কথা কিছুই মনে নেই। সুরবালা-টুরবালা কোথায় তলিয়ে গিয়েছে।” ১৫

কর্মমুখী থাকাই হচ্ছে আধুনিকতার লক্ষণ। কিন্তু শশাঙ্কবাবু সুদূর কলকাতার পাল্লার সঙ্গে  
কর্মহীন হন। কর্মহীন অবস্থায় সময় কাটানো শশাঙ্কবাবুর ঈপ্সিত ছিল না। পারিপার্শ্বিক  
অবস্থার জন্যেই তিনি কর্মবিমুখ। কর্মমুখিতার মধ্যে থাকা যার জীবনে প্রধান বিষয় ছিল, সেই  
শশাঙ্কবাবুর জীবনে নেমে আসে কর্মবিমুখ নামক অনাকাঙ্ক্ষিত পরিসর।



কলকাতায় এসে শশাঙ্ক কর্মহীন, উপার্জনহীন এবং পান্না নির্ভর হয়ে উঠেন। পান্নাই যেন তার কাছে ‘স্বপ্নময়ী ধ্যানপ্রতিমার’ মত। এই নারীর সান্নিধ্যে এসে আজ সে ভবঘুরে। তার এই ভাবুকতার বিষয় নিয়ে ঝড়ুবাবু বলেন —

“তুমি ভাবের খাতিরে ত্যাগ করে এসেচ সর্বস্ব ; তুমি সাধারণ লোক  
নও, জন্তু মানুষের চেয়ে অনেক বড়। ... পায়ের ধুলো দাও ভায়া -  
ভাব আছে তোমার মধ্যে —” ১৬

এই ভবঘুরে ব্যক্তিটি একদিন স্বনামধন্য ডাক্তার ছিলেন। শশাঙ্কবাবু ডাক্তারি পেশার মাধ্যমে অনেক টাকা-পয়সা উপার্জন করতেন। বৃত্তি বা পেশার ধর্ম সম্পর্কে সমালোচক পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন —

“বৃত্তি বা পেশা ঔপনিবেশিক আধুনিকতার অর্থ উপার্জনের মাধ্যম,  
শেষপর্যন্ত এক অশুভ অভিজ্ঞানের, সত্তা বিসর্জনের মাধ্যম হয়।” ১৭

শশাঙ্কের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে এই মন্তব্যের সাদৃশ্য রয়েছে। ডাক্তারি পেশার সে দৈনিক চল্লিশ থেকে আশি টাকা উপার্জন করলেও আজ সে পথের ভিখারী। তা সত্ত্বেও শশাঙ্কবাবুর মনে কোনও খেদ নেই ; পান্নাকে পেয়ে তিনি সর্বসুখী। তিনি নিজে বলেন —

“আজ আমি পথের ফকির, পসারওয়ালা ‘ডাক্তার’ হয়ে খেঁমটাওয়ালীর  
সারেসী নিয়ে বেড়াচ্ছি - কিন্তু আমার মনে কোন কষ্ট নেই, কোন খেদ  
নেই।” ১৮

তা থেকে স্পষ্ট, সুরবালার সঙ্গে দাম্পত্যভাব তেমন মধুর ছিল না। প্রেম মানুষকে উদার, উদাস ও সর্বত্যাগী করে। তাই পান্নার সহজ-সরল কথাবার্তা, চলাফেরা, আচার-আচরণে মুগ্ধ

হয়ে শশাঙ্ক ভাবে —

“পান্না শুধু সুন্দরী নারী নয়, অদ্ভুত ধরণের রহস্যময়ী, দয়াময়ী,  
প্রেমময়ী। নারীর মধ্যে এমন আমি ক’টিই বা দেখেছি।” ১৯

এই ‘রহস্যময়ী, দয়াময়ী, প্রেমময়ী’ তিন সত্তাই শশাঙ্ককে আকর্ষণ করে।

শশাঙ্ক ছাড়াও অনেক পুরুষের জৈবিক কামনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল এই পান্না। কিন্তু সে আধুনিক নারী ; কোনও পুরুষের দাসত্ব স্বীকার করেনি। কারণ, সে আর্থিক দিক দিয়ে স্বনির্ভর। তার মানসিকতা সামাজিক গণ্ডিবদ্ধ জীবনের উর্ধ্বে। তাই সে মুক্তকণ্ঠে শশাঙ্ককে বলে —

“আমি কি সাতপাকের বৌ তোমার ?” ২০

উনিশ শতক ছিল ব্যক্তিসত্তার স্ফুরণের যুগ। সামগ্রিকভাবে না হলেও সীমাবদ্ধ পরিসরে এই মুক্ত নারীদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে। এই তথাকথিত মুক্ত নারীদেরকে সমাজ বারাদ্ধনার সমপর্যায় রূপে অভিহিত করেছে। বারাদ্ধনার সংজ্ঞা আইনে এভাবে দেওয়া হয়েছে

“‘A female who offers her body for promiscuous sexual intercourse for hire, whether in money or in kind’ -- see 2 (e) suppression of Immoral Traffic in women and girls Act.” ২১

আইনানুসারে পান্নার সহযোগী নীলিকেই বারাদ্ধনা বলা যায়। পান্না নীলি থেকে একটু অন্য স্বভাবের খেমটাওয়ালী গায়িকা। সে যৌবনের ডালি দিয়ে প্রেমিক শশাঙ্ককে বশে রাখে। তবে প্রয়োজনবোধে শশাঙ্ককে ছেড়ে যেতে তার মনে কোনও দ্বিধাবোধ কিংবা সংকোচও দেখা

দেয়নি। পান্নার কাছে বিয়ে শুধু একটা সামাজিক ছাড়পত্র মাত্র। তাই সে হৃদয়ের দান - প্রতিদানের মাধ্যমে দাম্পত্য জীবনের সার্থকতাকে স্বীকার করতে চায়।

পান্না মুক্ত জগতের নারী হওয়ার ফলে শশাঙ্ককে বিদায় জানিয়ে পুলিশের লোকের সঙ্গে চলে আসে। কিন্তু শশাঙ্ক ভাবে -

“উঃ, পান্না সত্যি চলে গেল ? স্বেচ্ছায় চলে গেল ?” ২২

মোহিনী নারীর কামনার টানে ঘর-বাড়ি-স্ট্রী-সংসার সবকিছু ছেড়ে পালিয়ে এসেছিল কলকাতায় শারীরিক-মানসিক আনন্দের জন্য। কিন্তু সেই মোহিনী নারী পান্না নিজ ইচ্ছায় শশাঙ্ককে পরিত্যাগ করে চলে যায় পূর্ববর্তী আশ্রয়ে ঐতিহ্যগত ব্যবসা চালানোর জন্য। যে ব্যক্তি অবৈধ প্রেমকে সামাজিক ব্যাধি বলে গণ্য করত, সে-ই আজ এই রোগে আক্রান্ত। তার ইচ্ছে ছিল, মোহিনী নারী পান্নাকে নিয়ে পরবর্তী জীবন সুখে অতিবাহিত করে নেবে। কিন্তু গণ্ডিবদ্ধ সমাজব্যবস্থায় অবৈধ মিলনের কোনও স্থান নেই। ফলে, লেখক বিভূতিভূষণ পান্নাকে তার পূর্ববর্তীস্থানে পাঠিয়ে দিয়ে শিল্পের চেয়ে ঐতিহ্যের উপর গুরুত্ব দেন। ঐতিহ্যের উপর গুরুত্ব দেওয়ার ফলে, উপন্যাসের অন্তিম পর্বে শশাঙ্কের পূর্ব সংসারের বর্তমান অবস্থা জানার জন্য আগ্রহ প্রকাশ পায়। কিন্তু বিধির বিপাকে সুরবালাদের যা ঘটার তা-ই ঘটে গিয়েছে অনেক আগে। অনেক ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও পূর্বসংসারের কোনও সংবাদ সংগ্রহ করতে পারেনি। শশাঙ্কের কাঙ্ক্ষিত দাম্পত্য জীবন থেকে যেমনভাবে সুরালা হারিয়ে গিয়েছে, ঠিক তেমনি অন্যাকাঙ্ক্ষিতভাবে পান্নাও তার জীবন পরিসর থেকে হারিয়ে যায়। উপন্যাসের অন্তিম পর্যায়ে শশাঙ্ক যেন তাই ‘অথৈজল’-এ।

## উল্লেখপঞ্জি:—

- ১। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিভূতি রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, ষষ্ঠ খণ্ড, ১৪০৩, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃ: ১৭৪।
- ২। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ: ১৯১।
- ৩। তপোধীর ভট্টাচার্য : মিশেল ফুকো, তাঁর তত্ত্ববিশ্ব, ১৯৯৭, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, পৃ: ২৮।
- ৪। ভূদেব চৌধুরী : ‘বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা’ (দ্বিতীয় পর্ষায়) গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৬৪, বুকল্যাণ্ড প্রা: লি:, পৃ: ৭৪.
- ৫। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ: ১৯৫।
- ৬। তদেব - পৃ: ১৯৬।
- ৭। তদেব - পৃ: ২১০।
- ৮। তদেব - পৃ: ২১১।
- ৯। তদেব - পৃ: ২১৩।
- ১০। তদেব - পৃ: ২১২।
- ১১। তপোধীর ভট্টাচার্য : ‘বাখতিন : তত্ত্ব ও প্রয়োগ’ গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, ১৯৯৬, পুস্তক বিপনি, পৃ: ১১৯।
- ১২। ড. বদরুল হাসান : উনিশ শতক : নবজাগরণ ও বাংলা উপন্যাস, প্রথম

প্রকাশ, ১৯৯০, জগৎমাতা পাবলিসার্স, পৃঃ ৯৩-৯৪।

- ১৩। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২১৮।
- ১৪। ড. বদরুল হাসান : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, (মুখবন্ধ) পৃঃ i
- ১৫। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২৪৩।
- ১৬। তদেব- পৃঃ ২৪৮।
- ১৭। পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় : উপন্যাস রাজনৈতিক : বিভূতিভূষণ, ১৯৯২, র্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, পৃঃ ২৫।
- ১৮। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২৫০।
- ১৯। তদেব- পৃঃ ২৫৬।
- ২০। তদেব- পৃঃ ২৫৭।
- ২১। ড. বদরুল হাসান : পূর্বোক্ত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, পৃঃ ৮২।
- ২২। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২৬০।

## পঞ্চম অধ্যায়

### বিভূতিভূষণের উপন্যাসে দৃষ্টির রুদ্ধতা

বিভূতিভূষণ সর্বমোট যে কয়েকটি উপন্যাস রচনা করেছেন, এগুলির মধ্যে ‘দেবযানে’র ঐকমিক স্থান ‘দশম’। উপন্যাসটি রচনার প্রাক্কপর্বে বিভূতিভূষণ অনেক চিন্তা-ভাবনা করেছেন তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় বিভিন্ন পত্র ও দিনলিপির মধ্যে। ‘পথের পাঁচালী’ রচনার সময় থেকেই অলৌকিক বিষয় নিয়ে, বিশেষতঃ গ্রহ নক্ষত্রলোকের অজানা বিষয়কে কেন্দ্র করে একটি উপন্যাস রচনা করার জন্য মনস্থির করেন। ‘স্মৃতির রেখা’র স্থান না পাওয়া একটি দিনলিপিতে (২৪-১০-২৫, ভাগলপুর) তিনি লেখেন।

“নক্ষত্রের এই অসীম দূরত্ব ‘দেবতার ব্যথা’-র আঁকতে হবে। —

‘দেবতার ব্যথা’ এমনি epic হবে, যাতে এই গতি, পরিবর্তন, বিশ্বের মহিমা, বিরাটত্ব, সৌন্দর্য, রহস্য, মাধুর্য, অসীমত্ব, অনন্তত্ব, সব আঁকা হবে। সৌন্দর্যের সঙ্গে বিরাটত্বের যোগ হবে।”<sup>১</sup>

ভাগলপুরে অবস্থানকালে তিনি অন্য একটি দিনলিপিতে (২৪-৮-২৫ ইং) লেখেন —

“‘দেবতার ব্যথা’ একটা Romance-এর মতন হবে। ঘূর্ণ্যমান গ্রহরাজি, অনন্ত, গহন গভীর নাক্ষত্রিক শূন্য, বিশ্বের সমস্ত বড় দিকই ওতে থাকবে। ..... অনন্তকালের প্রবাহে রুদ্ধলীলাভঙ্গিতে বেয়ে চলেচে মহাকালের অনন্ত পথযাত্রায় .....”<sup>২</sup>

৬-৯-২৫ তারিখের দিনলিপিতে লেখেন —

“দুধারে সুন্দর পাহাড় ও অরণ্য। শালবন, উলুবন, বড় বড় বট, গাছের লতাদোলানো শাখার ছায়া - Snow-ball bush-এর মত কি সব ফুল। ..... Mira Ceti বা অন্য কোনো নক্ষত্রে ওইরকম পথ থাকবে, পৃথিবীতে অজানা ফুল ফলের বন, সাথী-তারায় রাঙা জ্যোৎস্নায়, তার দুধারে অজানা পাখি, অজানা তরুলতা, অজানা সৌন্দর্য, সম্মুখে অজানা জগৎ, কতদিন যুগ যুগ ধরে চলেও তার শেষ নাই - পুঞ্জ পুঞ্জ সৌন্দর্য তার দুধারে - অজানা পথ - ভুল পথ, যে পথ দিয়ে লোক কেউ হাঁটে না - শত নক্ষত্রের পারের সেই পথের সন্ধান এই মিললো।” \*

অলৌকিক, কল্পনাপ্রসূত উপকরণ দিয়ে বিভূতিভূষণ উপন্যাস রচনার রসদ সংগ্রহ করে নেন। ১৫ই মার্চ ১৯২৮ খ্রিঃ লেখক বটেশ্বরনাথের মেলা থেকে ফিরে আসার সময় মৃত্যুপারের কাহিনী নিয়ে উপন্যাস রচনার আরও রসদ সংগ্রহ করে নেন। এ সম্পর্কে তিনি লেখেন -

“..... এত ঘন অন্ধকার যে, দু’হাত তফাতের মানুষ দেখা যায় না - আমার বড় লন্ঠনটা জ্বলে নিয়ে তবু অনেকটা সুবিধে হ’ল। মুকুন্দ বললে, রাক্ষসের আলো জ্বলছে - এদেশে আলোয়াকে রাক্ষসের আলো বলে। কত ভূতের গল্প হ’ল।

‘দেবতার ব্যাধা’র এইরকম লিখতে হবে যে, কোনো উন্নততর গ্রহের জীবেরা অসীম শূন্য বেয়ে দূর গ্রহের উদ্দেশে যাত্রা ক’রে -

পথও হারিয়ে যায়। অসীম শূন্য বেয়ে, অসীম অন্ধকারে তাদের যাত্রা,  
দুর্জয় সাহসী pioneers!”<sup>৪</sup>

এসব থেকে বোঝা যায়, বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন অভিজ্ঞতাকে একত্রিত করে পরপারের অর্থাৎ  
মৃত্যুলোকের অবস্থান নিয়ে তিনি সাহিত্য রচনা করার সংকল্প করেন। এই সংকল্পের পরিকল্পনার  
‘দেবতার ব্যথা’ নামক রচনার উল্লেখ পাওয়া গেলেও প্রকৃত অর্থে ‘দেবযান’ উপন্যাসটিই হল  
‘দেবতার ব্যথা’ নামক রচনার রূপান্তরিত রূপ। এ সম্পর্কে তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি  
মন্তব্য এখানে উল্লেখযোগ্য -

“২৪শে অক্টোবর, ১৯২৫ সালের লেখা অংশে আমরা ‘দেবতার  
ব্যথা’ নামে একটি গ্রন্থের পরিকল্পনা পাচ্ছি। এ নামে বিভূতিভূষণের  
কোনো রচনা নেই। আসলে চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি ‘দেবযান’  
নামে তাঁর যে উপন্যাস প্রকাশিত হয়, সেটিকেই ‘দেবতার ব্যথা’ নাম  
দিয়ে দিনলিপি বহুস্থানে তিনি উল্লেখ করেছেন। প্রকাশের সময়  
কোনো কারণে নাম বদলে দেন।”<sup>৫</sup>

বিভূতিভূষণের সময়কালে ভারতবর্ষ ছিল ঔপনিবেশিক শাসনাবদ্ধ। এই ঔপনিবেশিক সময়েই  
আমাদের জাতীয় চেতনার উন্মেষ ও ঐতিহ্যের বিনির্মাণ ঘটে। সাহিত্যেও সমকাল স্পষ্ট হয়ে  
ওঠে। তাঁর সাহিত্যেও সমকালীন উপকরণের ছাপ স্পষ্ট। তবে সমকালীন উপকরণের সঙ্গে  
তাঁর রচনায় যুক্ত হয়েছে অনাধুনিক, অলৌকিক, অবাস্তব ও ঐতিহ্যবোধ। বিশেষতঃ যাকে  
আমরা উপন্যাসিকের দৃষ্টির রুদ্ধতা হিসেবে আখ্যায়িত করেছি।  
‘দেবযান’ বিভূতিভূষণের এক বিতর্কমূলক উপন্যাস। মৃত্যু পরবর্তী সময়ে মানুষের



আত্মার অবস্থান ও অস্তিত্বের বিষয়ই উপন্যাসটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। তিনি আধুনিক যুগের লেখক হয়েও ধর্মীয় রীতি-নীতির সীমাবদ্ধতার গণ্ডিকে অতিক্রম করতে পারেননি। তাই, তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে বার বার ফুটে উঠেছে অলৌকিকতার পরিসর। লেখকের প্রথম উপন্যাস ‘পথের পাঁচালী’র (১৯২৯) নায়ক অপু কল্পনার দিব্যদৃষ্টির মাধ্যমে দেখতে পায় —

“..... সেই স্বপ্নলোকের হবি তাহাকে অবাক করিয়া দিল। কতদূরে সে প্রস্রবণ-গিরির উন্নত শিখর, আকাশপথে সতত-সঞ্চরণমাণ মেঘমালায় যাহার প্রশান্ত, নীল সৌন্দর্য সর্বদা আবৃত থাকে ?” ৬

কিংবা

“..... ঠিক সেই সময়ে হঠাৎ এক-একদিন ওপারের সবুজ খড়ের জমির শেষে নীল আকাশটা যেখানে আসিয়া দূর গ্রামের সবুজ বনরেখার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, সেদিকে চাহিয়া দেখিতেই তাহার মনটা যেন কেমন হইয়া যাইত - সে সব প্রকাশ করিয়া বুঝাইয়া বলিতে জ্ঞানিত না। শুধু তাহার দিদি ঘাট হইতে উঠিলে সে বলিত - দিদি দিদি, দ্যাখ্ দ্যাখ্ ঐদিকে - পরে সে মাঠের শেষের দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিত - ঐ যে ? ঐ গাছটার পিছনে ? কেমন অনেক দূর, না ?” ৭

‘অপরাজিত’ (১৯৩২) উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই, নায়ক অপু জ্যোতির্বিজ্ঞানের একটি বই হাতে নিয়ে নানাধরনের চিন্তা-ভাবনা করে। এখানে মনে রাখা দরকার উপন্যাসিক বিজ্ঞানভিত্তিক জ্যোতির্বিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান ছাড়াও অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্র বিষয়ক পাঠকৃতির

নিষ্ঠাবান পাঠক ছিলেন। তাঁরই প্রতিকল্প সত্তা অপু বইয়ের একটি পাতায় ক্ষুদ্র একটি পোকাকে দেখে ভাবে -

“এই বিশাল জগৎ, নক্ষত্রপুঞ্জ, উল্কা, নীহারিকা, কোটি কোটি দৃশ্য-  
অদৃশ্য জগৎ লইয়া এই অনন্ত বিশ্ব -ও-ও তো এরই একজন  
অধিবাসী - এই যে চলিয়া বেড়াইতেছে পাতাটার উপরে, ও-ই ওর  
জীবনানন্দ - কতটুকু ওর জীবন, আনন্দ কতটুকু ?” ৮

তাঁর রচিত প্রত্যেকটি উপন্যাসের নায়কদের মধ্যে অলৌকিকতার ভাব কম-বেশি দেখা যায়।  
‘দৃষ্টিপ্রদীপ’ (১৯৩৫) উপন্যাসের নায়ক জিতুও পরাদৃষ্টি সম্পন্ন মানুষ। পরাদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি  
ইওয়ার জন্যই সে আশীশ পাহাড় মেঘরাজ্যের অন্তরাল দিয়ে বহে যাওয়া জ্যোতির্ময় পথ,  
প্রাকৃতিক দৃশ্য, এমনকী অতীতে ঘটে যাওয়া বা ভবিষ্যতে ঘটবে এমন সব ঘটনাও দেখতে  
পায়। জিতুর দিব্যদৃষ্টি তথা অলৌকিক ক্ষমতার কথা লেখক এভাবে তুলে ধরেন -

“হঠাৎ আমি অবাক হয়ে পথের ওপারে চেয়ে রইলুম - ওপারে সামু  
নাপিতের মুদিখানার দোকানটা আর নেই, পাশেই সে ফিতে-ঘুন্সির  
দোকানটাও নেই, ..... মাঠের ধারে বড় বড় বাঁশগাছের মত কি গাছের  
সারি, কিন্তু বাঁশগাছ নয়। দুপুরবেলা নয়, বোধ হয় যেন রাত্রি-  
জ্যোৎস্না রাত্রি - দূরে সাদা রঙের একটা অদ্ভুত গড়নের বাড়ি,  
মন্দিরও হ’তে পারে।” ৯

জিতু যেন ‘পথের পাঁচালী’র অপূর পরবর্তী সংস্করণ। অপূর সঙ্গে ‘দেবযানে’র পথিক  
দেবতারও মিল রয়েছে। অবশ্য মিলের মধ্যেও রয়েছে অনেক অমিল। ‘দেবযান’ উপন্যাসের

পথিক দেবতার সীমাহীন অজানা পথে ভ্রমণের কথা লেখক এভাবে বর্ণনা করেন -

“কত লক্ষ বৎসর পূর্বে তিনি বেরিয়েছেন বিশ্বভ্রমণে। কত গ্রহ,  
উপগ্রহ, নক্ষত্রজগৎ, কত ছায়াপথ, নীহারিকাপুঞ্জ, মানসগতিতে ভ্রমণ  
করেছেন। ..... তখন দেখেন বহু দূরে আর এক অজানা বিশ্বের সীমা  
মহাশূন্যের প্রান্তে আবছায়া দেখা যায়। ..... আবার দূরে দেখতে  
পেয়েছেন আর এক রহস্যময় অজ্ঞাত বিশ্বের ক্ষীণ সীমান্তবর্তী ক্ষীণালোক  
তারকামণ্ডলী।” ১০

বিভূতিভূষণ নিজের আরাধ্য দেবতা সম্পর্কে ‘আরণ্যক’ উপন্যাসের নায়কের মুখ দিয়ে  
বলেন -

“..... নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলাইয়া দিয়া থাকেন নিঃশেষে প্রিয়জনের  
প্রীতির জন্য - আবার বিরাট বৈজ্ঞানিকের শক্তি ও দৃষ্টি দিয়া গ্রহ-  
নক্ষত্র-নীহারিকার সৃষ্টি করেন।” ১১

ঈশ্বরের প্রতি বিশেষতঃ অলৌকিক শক্তির উপর লেখকের অগাধ বিশ্বাস রয়েছে। ‘ইছামতী’  
উপন্যাসের নায়ক ভবানী বাঁড়ুয়োর গুরুদ্বারা চৈতন্যভারতীর মুখ দিয়ে ঔপন্যাসিক ঈশ্বরচেতনার  
স্বরূপ উদ্ঘাটন করে বলেন -

“যিনিই সমষ্টিরূপে ঈশ্বর, তিনিই ব্যক্তিতে কার্যরূপে জীব। ..... অর্থাৎ  
ঈশ্বর কর্তা, জীব কার্য। কিন্তু স্বরূপে উভয়েই এক। কেবল উপাধিতে  
ভিন্ন। তুমিই তোমার ঈশ্বর, আবার ঈশ্বর কে?” ১২

ঈশ্বরানুভূতিতে আপ্ত ভবানীবাবু অলৌকিক শক্তির ক্ষমতা ও আবির্ভূত রূপ ঘন অন্ধকার

আকাশে প্রত্যক্ষ করে আপন মনে বলেন -

“হে শান্ত, পরমবাস্তু ও অবাস্তু মহাদেবতা, সমস্ত আকাশ যেমন  
অন্ধকারে ওতপ্রোত, তেমনি আপনাতোও।” ১৩

কিংবা রামকানাই কবিরাজকে ঈশ্বরের স্বরূপ সম্পর্কে ভবানীবাবু এভাবে বলেন -

“তিনিই বিরাট, তিনি এই সমুদয় বিশ্বের স্রষ্টা। তিনিই অন্ধর ব্রহ্ম,  
তিনিই প্রাণ, তিনিই বাক্য, তিনিই মন।” ১৪

শুধু উপন্যাসে নয় ; তাঁর অন্যান্য রচনারও অলৌকিক শক্তির কথা রয়েছে। ‘চাঁদের  
পাহাড়’ নামক কিশোর উপন্যাসটির প্রধান চরিত্র শঙ্করের মুখ দিয়ে লেখক বলেন -

“প্রণাম, হে বুদ্ধদেব, প্রণাম। আপনার তাণ্ডব দেখবার সুযোগ দিয়াছিলেন,  
এজন্যে প্রণাম গ্রহণ করুন, হে দেবতা। আপনার এ রূপের কাছে শত  
হীরকখনি তুচ্ছ হয়ে যায়। আমার সমস্ত কষ্ট সার্থক হল।” ১৫

২ নভেম্বর, ১৯২৫ খ্রিঃ এক দিনলিপিতে ‘মহাকালের গতি ও বিশ্বের বিশালতার সঙ্গে সাধারণ  
মানুষের জীবনযাত্রাকে মিলিয়ে বড় কিছু লিখবেন’ বলে বিভূতিভূষণ সংকল্প নেন। তাঁর এই  
সংকল্পের বিষয় নিয়ে মিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ‘পথের পাঁচালী ও  
অপরাজিত’ এর খসড়ার টিকা’র লেখেন -

“অপু এবং সত্যচরণের জীবন, ভবানী বাঁড়ুজ্যের দার্শনিক চেতনা,  
জিতুর অতিলৌকিক পরাদৃষ্টি বা লেখকের অমূল্য দিনলিপিগুলি সবই  
তো এই সংকল্পকেই প্রতিবিম্বিত করে।” ১৬

‘দেবদান’ উপন্যাসের প্রতিবেদনে উপন্যাসিকের মননদৃষ্টির রুদ্ধতার পরিসরকে স্পষ্ট করাই

এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয়। এবার সেদিকে দৃষ্টিপাত করা যাক।

উপন্যাসটি রচনার পরিকল্পনা করেন ১৯২৮ খ্রিঃ, তবে তা বাস্তবায়িত হয় ১৯৪০ খ্রিঃ। ১৯৪৪ খ্রিঃ ‘দেবযান’ বইয়ের আকারে প্রকাশিত হয়। তা থেকে সহজেই অনুধাবন করা যায়, উপন্যাসটির বয়নের মধ্যে দীর্ঘ কয়েক বৎসরের চিন্তা চেতনাকে রূপায়িত করেছেন। ‘দেবযানে’র মূল বিষয়বস্তুই ‘প্রেতলোকের কাহিনী’। মানুষের মৃত্যুর পর কোথায় তার অবস্থান হয়, কিভাবে পুনর্জন্ম ঘটে, কিভাবে স্বর্গলোকে অবস্থান করতে পারে - এ সব কাল্পনিক বিষয় নিয়ে বিভূতিভূষণ উপন্যাসটি রচনা করেছেন। উপন্যাসটি পড়ে অনেক পণ্ডিতপ্রবর ব্যক্তি যাঁরা আধুনিক মানসিকতায় পরিপুষ্ট, ঈশ্বর সম্বন্ধে উদাসীন, নরক-স্বর্গের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী - এসব ব্যক্তিবর্গ নানা প্রশ্ন তুলেছেন উপন্যাসটির গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে। বিভূতিভূষণ নিজে এসব সমালোচনার উত্তর দিতে গিয়ে বিশিষ্ট সাহিত্যিক সৌরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে (১৪-০১-৫০ ইং) একটি পত্রে জানান -

“আপনার পত্রে সব জানলাম। ‘দেবযান’ পড়ে প্রেতলোকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন - সত্যি বলচি সন্দেহ করবার কিছু নেই। ... বিদ্যাবুদ্ধির সাহায্যে কিছু হবে না - তিনি দয়া না করে পারবেন না - যদি আমাদের আকুলতা থাকে। ‘দেবযান’ আর একবার পড়বেন। এ আমার অভিজ্ঞতার ফল।” ১৭

সমস্ত জীবনের অভিজ্ঞতার ফসল ‘দেবযান’ উপন্যাসের মধ্যে লেখকের মননবীক্ষার স্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে।

বিভূতিভূষণ যখন ‘দেবযান’ লেখেন তখন আমাদের ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, সামাজিক,

অর্থনৈতিক অবস্থানে এক দমকা হাওয়ায় স্পর্শ লাগে। ১৯৪২ এর ভারতছাড়ো আন্দোলন এবং এই আন্দোলনের ফল পরোক্ষভাবে হলেও লেখকের মনকে স্পর্শ করে। তাই লক্ষ করা যায় সমকালীন নানা ঘটনা যেমন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, পঞ্চাশের মন্বন্তর, বাংলার ম্যালেরিয়ার প্রভাব ও উপনিবেশিক শাসন—এসব কথা তাঁর অন্যান্য উপন্যাসে যেমন স্থান পেয়েছে তেমনি দেবযানের মধ্যেও এর একটা আভাস মেলে মাত্র। বস্তুত লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি এখানে স্বতন্ত্র। এসব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ঔপন্যাসিক বিকল্প পরিসর তথা কাল্পনিক দেবলোকের কথা, পুনর্জন্মের কথা, নরক-স্বর্গের কথা উপস্থাপন করেছেন। দুর্ভিক্ষের কথা জানাতে গিয়ে ঔপন্যাসিক মৃত একটি মেয়ের আত্মার মাধ্যমে আমাদেরকে জানান —

“আমার এই দেশ। বহুদিন আগে ডল্‌গা নদীর ধারে একটি গ্রামে এক কৃষক পরিবারে আমি জন্ম নিয়েছিলাম - জার আইভানের রাজত্বকালে।  
..... এদের জন্যে যা থাকে, তাতে এদের কুলোয় না। তাই এই যোর দুর্ভিক্ষ।” ১৮

দুর্ভিক্ষ, দুঃখ-কষ্ট, হাসি-কান্নার সৃষ্টির পেছনে রয়েছে অলৌকিক শক্তির হাত। নিভৃতে, নিরালোকে কোনও এক অদৃশ্য শক্তির অঙ্গুলি হেলনে বাস্তব পৃথিবীতে কত ঘটনা ঘটে। লেখক আমাদেরকে জানান —

“বড় বড় দুর্ভিক্ষ, মড়ক, বন্যা, ভূমিকম্প প্রভৃতি যাতে দেশকে দেশ বা জাতিকে জাতি কষ্ট পায় -এ সবার মূলে অতি উচ্চ দেবতা - যাঁরা গ্রহদেব, প্ল্যানেটারি স্পিরিট - তাঁদের হাত রয়েছে।” ১৯

অদৃশ্য শক্তিই ঠিক করে দেয় কোন আত্মা কোথায় অবস্থান করবে। দুর্ভিক্ষ, রোগে-

শোকে আত্মা পৃথিবীতে নেমে আসে। নিঃস্বার্থভাবে মানুষের সেবা করলে স্বর্গলোকে উচ্চ আসনে স্থান পায়। ডাক্তার আমেণ্ডো'র মত উচ্চস্তরের আত্মা পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে গিয়ে পীড়িত মানুষের সেবা করেন। এই রুশ ডাক্তারের আত্মা সম্পর্কে লেখক বলেন —

“এত বড় নিঃস্বার্থ দয়ালু আত্মা এ বৃগে খুব কমই জন্মেছে। .....

যেখানে দুর্ভিক্ষ, যেখানে রোগ-শোক সেখানেই ছুটে আসছেন।” ২০

আত্মার মুক্তি খুব কঠিন কাজ, সহজে ঘটে না। জনৈক সম্মানসীল মুখ দিয়ে ঔপন্যাসিক বলেন

“আমি পৃথিবীতে তোমারই মত মানুষ ছিলাম। যৌবনে স্ত্রী-বিরোধ হোল, সংসার মিথ্যে মনে হোল। ..... আসামের এক জঙ্গলে পনের বছর যোগ অভ্যাস করবার পর একদিন গুরুর কৃপায় নির্বিকল্প সমাধি হোল।” ২১

‘পরলোকতত্ত্বে’র কাহিনীকে কেন্দ্র করে এই উপন্যাসটি রচনা হলেও উপন্যাসে অঙ্কিত চরিত্রগুলি গ্রাম্য পরিবেশকে উদার মনে গ্রহণ করেছে। উনিশ শতকের পরবর্তী সময়ে ঔপনিবেশিক শক্তির প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ হস্তক্ষেপে গ্রাম-বাংলার জনজীবন ধ্বংসাত্মক হওয়ার ফলে বাঁচার তাগিদে বেশিরভাগ মানুষই শহরাভিমুখী হয়। নগর কলকাতাই হয়ে ওঠে আধুনিক শিক্ষা-সংস্কৃতির পীঠস্থান। কলকাতাকে কেন্দ্র করে সমাজ ও সাহিত্যে আধুনিকতার যাত্রা শুরু হয়। কিন্তু ‘দেবযান’ উপন্যাসের একটি প্রধান চরিত্র পুষ্প নগর কলকাতাকে কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। পুষ্পের মুখ দিয়ে লেখক বলেন —

“কলকাতায় আসতে পারিনে, কষ্ট হয়। উঃ দেখেচ কেমন কালো কালো কুয়াশার মতো জিনিস! মানুষের অর্থলোভ, বিলাসিতা – নানারকম খারাপ চিন্তা – সকলের ওপর লোভ – এই সব একধরনের কালো কুয়াশা সৃষ্টি করেছে। ওর মধ্যে দিয়ে আসতে দম বন্ধ হয়ে যায় যেন – সব বড় শহরেই এরকম দেখেছি – এখানে মানুষ সব ভুলে শুধু ভোগ নিয়ে আছে।” ২২

আধুনিক যুগের মানুষ যখন আত্মকেন্দ্রিক, ব্যক্তিগত স্বাভাবিক ; সেই সময়ে পুষ্পের মত আত্মা এই আধুনিকতার পরিসর থেকে দূরে থাকতে চায়।

মৃত্যুলোকের পারে প্রত্যেক, আত্মাই কম-বেশি অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। এসব আত্মারা আধুনিক শহর-নগরের ক্লেশপূর্ণ পরিবেশ থেকে দূরে থাকতে চায়। জনৈক এক দেবী পুষ্পকে জানান –

“..... তোমাদের পৃথিবীর শহরগুলোতে তো আরও বেশি।  
টাকার নেশা, সুরার নেশা, রূপের নেশা - ওর আকাশ ধূসর বাষ্পে  
ছেয়ে রেখেচে - তাতে বিষ আছে, আমাদের পক্ষে সে ঠেলে বাওয়া  
কত কষ্ট !” ২৩

আরেক আত্মা জনৈক মহাপুরুষ বলেন –

“আমি পৃথিবীতে যাই, জনপদে বা তোমাদের বড়-বড় নগরে যাই না।  
দুর্নিবার লোভ, অর্থাসক্তি, ঐশ্বর্য-কামনা, নারী, সুরা, কাম, হিংসা-দ্বেষ  
বাতাসে ছড়ানো ঘন ধোঁয়ার মত।” ২৪



উপন্যাসের প্রধান চরিত্র যতীন উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও ধর্মীয় গণ্ডিবদ্ধ জীবনের বাইরে বের হতে পারেনি। দেশকে ঔপনিবেশিক শাসক সম্প্রদায়ের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের সময় যতীন -

“..... এম.এ. পর্যন্ত পড়ে গান্ধীজীর নন-কো-অপারেশনের সময় কল্গেজ ছেড়ে বাড়ী আসে।” ২৫

সংগ্রাম করে নিজের পাওনা আদায় কিংবা অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখার মানসিকতা যতীনের নেই।

যতীনের মানসিকতা প্রাক-আধুনিক যুগের বদ্ধ জলাশয়ে আবদ্ধ। তার বিশ্বাস, মৃত্যুর পর মানুষ নিজ কর্মফল অনুযায়ী পৃথিবীতে আসা-যাওয়া করে। যতীন জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী - যা লেখকের পরাদৃষ্টির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। দিব্যদৃষ্টির মাধ্যমে সে দেখতে পায় -

“..... দিব্য চমৎকার জ্যোৎস্না উঠলো। একেবারে পৃথিবীর পূর্ণিমার জ্যোৎস্না। তার শুব্র আলোর ঢেউ পড়লো গঙ্গাবক্ষে, পড়লো গিরে ওপারের শ্যামাসুন্দরী মন্দিরের সর্বাসে, ভীমের প্রাচীন বটের মাথার ডালের ফাঁকে ফাঁকে।” ২৬

এই অদ্ভুত পরিবেশ দেখে যতীন আশ্চর্য হয়ে সহযোগী পুষ্পকে প্রশ্ন করে -

“—আচ্ছা পুষ্প, যে কোনো ঋতু, যে কোনো সময়ে তৈরী করতে পারো?” ২৭

যতীনের আত্মা দ্বিবাচনিক সত্তার ভরপুর। স্ত্রী আশা কিংবা পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে যতীন থাকতে চায়। কিন্তু মৃত্যুর পর পৃথিবীতে বসবাস করা অলৌকিক ঘটনা ছাড়া আর কিছু নয়। বিভূতিভূষণ এ ধরনের অলৌকিক ঘটনায় বিশ্বাসী ছিলেন। অলৌকিক ঘটনায় বিশ্বাসী মানুষ

সম্পর্কে সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার তাঁর ‘জীবন জিজ্ঞাসা’ গ্রন্থে লিখেছেন -

“যাহারা লোক-লোকান্তরের স্বপ্ন দেখে, যাহারা মৃত্যুর পরেও অবিচ্ছেদে  
জীবন-যাপন করার কথায় বিশ্বাস করে, তাহারা শিশুর মত রূপকথার  
ভক্ত।” ২৮

আধুনিক যুগের একজন বুদ্ধিজীবীর কল্পস্বর্ণ রচনা করা মননদৃষ্টির রুদ্ধতার-ই পরিচায়ক।

বিভূতিভূষণ গৌড়া ধর্মীয় রীতি-নীতি, সংস্কার তথা বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে  
‘দেবযান’ উপন্যাসটি লেখেন। মৃত্যুলোকে বিশ্বাস, স্বর্গ-নরকের ব্যাখ্যা, জন্মান্তরবাদ, জাতিস্মরণবাদ,  
উক্তিজ্ঞানবাদ—এসব আলোচ্য উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। অন্যান্য লেখকদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র,  
রবীন্দ্রনাথ, ত্রৈলোক্যনাথ, পরশুরাম কিংবা শরদিন্দু প্রমুখ সাহিত্যিকদের রচনার অলৌকিক  
কিংবা অতিলৌকিক বিষয় বিভিন্ন ভাবে সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র সরাসরি অলৌকিকতাকে  
গ্রহণ করেননি ; রবীন্দ্রনাথ মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে বিষয়টিকে গ্রহণ করেছেন। ত্রৈলোক্যনাথ ও  
পরশুরাম বিদ্রুপাত্মক ভঙ্গিতে অলৌকিক বিষয় নিয়ে কৌতুক করেছেন। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের  
রচনার পুনর্জন্মের কথা থাকলেও সেখানে ব্যঙ্গের ছোঁয়া লেগেছে এবং বেশিরভাগ রোমান্স  
কল্পনামূলক রচনা। কিন্তু বিভূতিভূষণের রচনায় এসব অলৌকিক বিষয় তথা হিন্দু ধর্মের  
সংস্কারমূলক উপাদানগুলি বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে সংগঠিত। যতীনের মৃত্যুর পূর্বেই  
আশালতা দেবী স্বামীসঙ্গ ত্যাগ করে অন্য জায়গায় আশ্রয় নেয়। আশালতা দেবী চলে যাওয়ার  
পর যতীনের মনে পড়ে পূর্ব প্রেমিকা পুষ্পের কথা -

“এইরকম নির্জন রাতে বহুদিন আগেকার আর একজনের কথা মনে  
পড়ে। সে স্বপ্ন হয়ে গিয়েছে অনেকদিন। ভুলেও তাকে গিয়েছিল,

কিন্তু আশা চলে যাওয়ার পরে তার কথা ধীরে ধীরে জেগে উঠেছে।”২৯

মৃত্যুর পর যতীন প্রথম পুষ্পকে দেখতে পার। স্বর্গলোকে যাওয়ার পর প্রথম-ই মা-বাবার সঙ্গে তার দেখা হয়। স্বর্গে যতীনের মা-বাবা ছিলেন তারুণ্যে ভরপুর। কারণ স্বর্গলোকে বার্ষিক নেই, জীবন সেখানে তারুণ্যে ভরপুর। স্বর্গে উপস্থিত হওয়ার পর পুষ্পের সঙ্গে যতীনের স্বর্গ ভ্রমণ শুরু হয়। বিভিন্ন দেব-দেবীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটে। সে জানতে পারে, ‘ভুবলোক, মহালোক, ব্রহ্মলোক, জন্মান্তরবাদ’ প্রভৃতির কথা।

অবৈধ প্রেম-ভালবাসার কথা ‘দেবদান’ উপন্যাসে অঙ্কিত হলেও ঔপন্যাসিক এসব প্রেমের সামাজিক স্বীকৃতি দেননি। যতীন সামাজিক ভাবে আশালতাকে বিয়ে করেও তার কাছ থেকে কোনও সহমর্মিতা পায়নি। বরং স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা আশালতা দেবী প্রেমিক নেতানারায়ণের হাত ধরে কলিকাতায় এসে নতুন সংসার গড়ে তুলে। আশালতা দেবী মূলত লোকপন্থার ভয়ে নেতানারায়ণকে স্বামী হিসেবে মেনে নেয়। কিন্তু তার অন্তরের মধ্যে রয়ে যায় সামাজিক সংস্কার। এই সামাজিক সংস্কারের জন্যেই সে মনে-প্রাণে নিজের বিয়েকে মেনে নিতে পারেনি। উনিশ শতকে ‘বিধবা বিয়ে’ প্রথা প্রচলিত হলেও ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ সে পথে না গিয়ে রক্ষণশীল মনোভাবকে গ্রহণ করেন। তাই বিধবা আশালতা দেবীর অবৈধ বিয়েকে ঔপন্যাসিক মেনে নিতে না পেরে উপন্যাসের মধ্যেই তার মৃত্যু ঘটান। নেতানারায়ণের ঘরে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বসবাস করার সময়ই তাকে অনেক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। তার দুঃখ-দুর্দশা দেখে যতীন নিজের মনকে হির রাখতে পারে না। পৃথিবীর রূপজ কামনার টানে মর্ত্যলোকে এসে পুষ্পের সঙ্গে ঘর-সংসার করার ইচ্ছে প্রকাশ করে যতীন বলে -

“চল্ তুই আর আমি পৃথিবীতে যাই, ছোট নদীর ধারে কুঁড়েঘরে

সংসার পাতবো। সেই আমাদের স্বর্গ, সেই আমাদের সব।”<sup>৩০</sup>

কিন্তু কল্পলোকের আত্মা যতীনের আর বাস্তব পৃথিবীতে আসা সম্ভব নয়।

উনিশ শতকে ঔপনিবেশিক শাসক সম্প্রদায়ের সাহায্য সহযোগিতায় বিদ্যাসাগর ‘বিধবা বিয়ে’র আইন চালু করলেও বাংলার মানুষ, বিশেষতঃ রক্ষণশীল পুরুষসমাজ এই আইনকে মনে প্রাণে মেনে নিতে পারেনি। এমনকী, আজকের দিনেও সকল ব্যক্তিই খোলা মনে বিধবা বিয়েকে মেনে নিতে পারেন একথা বলা যায় না। সমাজের এসব বিষয়ই বাংলা উপন্যাসে মুখ্য স্থান দখল করে রেখেছে। বাংলা উপন্যাস জগতের প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র শিল্পের খাতিরে বিধবা বিয়ের ব্যবস্থা উপন্যাসের মধ্যে তুলে ধরলেও শেষপর্যন্ত এসব বিধবাদের প্রাপ্য বিধান ছিল একমাত্র মৃত্যু। বিশিষ্ট সমালোচক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বিধবা বিবাহ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের অবস্থানের স্বরূপ আমাদেরকে এভাবে জানান -

“বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলনের তিনি ছিলেন পরম বিরোধী।”<sup>৩১</sup>

তবে সমালোচকের এই মন্তব্যটি আধুনিক পাঠক সমাজের কাছে কতটুকু সমর্থনযোগ্য - তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। কারণ, সমাজ বাস্তবতার চাপেই ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র বিধবা বিয়ের প্রসঙ্গে ঐতিহ্যকেই গ্রহণ করেন। ফলস্বরূপ, কুন্দ কিংবা রোহিনীর মত স্বাধীনচেতা নারীর অকালমৃত্যু ঘটে উপন্যাসের পরিসরে। পরবর্তী পর্যায়ে সমাজ বাস্তবতার পরিবর্তন ঘটতে থাকে এবং ধীরে ধীরে বিধবা নারী তার নিজস্ব পরিসর খুঁজে পেতে আরম্ভ করে।

বিভূতিভূষণের মত অনেকেই আধুনিক যুগের আধুনিক ঔপন্যাসিক হয়েও সম্পূর্ণরূপে ঐতিহ্যের বেড়াজালকে অতিক্রম করতে পারেননি। অনেকসময় ব্যক্তিপুরুষ পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার বাইরে বের হতে পারলেও ব্যক্তি নারী সেই গণ্ডিরেখাকে অতিক্রম করতে

পারেনি। বিভূতিভূষণ জটনৈক এক বিধবা নারীর মানসিকতা সম্পর্কে আমাদেরকে জানান -

“সুন্দরী ছিল, বিধবা বিবাহ করবার জন্যে কত লোক ঝুঁকেছিল -

কার্শী দিকে ফিরেও চায় নি। দুঃখ কষ্ট কত পেয়ে আসচে, খেতে পায়

না - তবুও স্বামী ধ্যান, স্বামী জ্ঞান।” ৩২

ঐতিহ্যানুসারে স্বামীকে বেঁধেন করে থাকাই হল স্ত্রীর জীবনের প্রধান কাজ। স্ত্রী জাতির আলাদা কোনও স্থান বা পরিসর নেই। উপন্যাসের প্রতিবেদনে বিভূতিভূষণ নারী-পুরুষের পার্থক্যও রচনা করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে তিনি নারীকে সংসারের উচ্চাসনে স্থান না দিয়ে হয়ে প্রতিপন্ন করে উপন্যাসের প্রতিবেদনে অঙ্কিত করেছেন। সংসারের যাবতীয় রীতি-নীতি, ধর্ম-কর্ম পালন করাই হল নারীর কাজ; আর পুরুষ থাকবে এসবের উর্ধ্বে। লেখক জটনৈক দেবতার মুখ দিয়ে নারী-পুরুষের কাজের পরিসর সম্পর্কে বলেন -

“ভক্তির পথ সহজ পথ, নারীর পথ। জ্ঞানের পথ বীরের পথ,

পুরুষের পথ— সে কথা তোমাকে তো আগেই বলেছি।” ৩৩

নারীর কামনা-বাসনাকে দমিয়ে রাখাই পুরুষতান্ত্রিক সমাজের একটি প্রধান কাজ। কিন্তু আশালতা দেবী পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বদ্ধ জীবনের খোলস ছেড়ে বাইরে বের হয়ে আসেন। ‘মৃত্যুলোকের পারে’ রাস্তায় একদিন আশালতা ও পুষ্প অবৈধ বিয়ের প্রসঙ্গে কথা বলার সময় আশা বলে -

“অঙ্ক বয়েসে বিধবা হয়েছিলাম, কে খেতে পরতে দেয় সংসারে .....

না হাঁ, সত্যি কথা বোলবো।” ৩৪

আধুনিক যুগের একজন বিধবা নারী নিজ কামনা-বাসনার টানে মুক্ত মনে একজন পুরুষের

প্রতি প্রেম নিবেদন করতেই পারে। দ্বিধাহীনভাবে একজন নারী নিজ বাসনাকে প্রকাশ করাই আধুনিক যুগের আধুনিক মানসিকতার ফসল। কিন্তু ঐতিহ্যে বিশ্বাসী লেখক বিভূতিভূষণ পুষ্পের মুখ দিয়ে ধর্মীয় সংস্কারের কথা এভাবে বলেন -

“বিয়ের পরে অন্য কারো সঙ্গে ভাব করতে গেলে কেন ? এটা খুব অন্যায় হয়েছে তোমার বৌদিদি। হিন্দুর মেয়ে, দ্বিচারিণীর ধর্ম কে শেখালে তোমায় ?” ৩৫

‘হিন্দুর মেয়ে’ শব্দ দুটির মধ্যে রয়েছে ঔপন্যাসিকের ধর্মীয় রক্ষণশীল মানসিকতার পরিচায়ক - যা আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধী।

যতীনের মানসিকতায় ধর্মীয় গোঁড়ামি থাকলেও সে আধুনিক শিক্ষার শিক্ষিত। পূর্বজন্মের অর্জিত শিক্ষার অন্তিম নির্যাস যতীনের ব্যর্থ নয়। প্রেতাত্মা পুষ্পকে সঙ্গে নিয়ে যতীন বিভিন্ন দেবদেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তার মনের অন্ধকারাচ্ছন্ন ভাবটি ধীরে ধীরে এক জ্যোতির্ময় আলোকে প্রস্ফুটিত হয়। হাজার হাজার গ্রহ-নক্ষত্ররাজির সংমিশ্রণে শোভিত এই ব্রহ্মাণ্ড, এসব গ্রহ-নক্ষত্রের শক্তি সূর্যের আলোর মত। আবার সূর্যের চেয়েও এসব নক্ষত্র অনেকগুণ বড়। এসব কিছুর সঙ্গে তুলনা করলে আমাদের পৃথিবী ক্ষুদ্র একটি গ্রহ এবং এই গ্রহের অধিবাসী হলো আমরা মর্ত্যবাসী মানুষ। সমালোচক সম্ভাবকুমার দত্ত এ সম্পর্কে বলেছেন -

“তুলনায় পৃথিবী ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এক গ্রহ, সেই গ্রহের অধিবাসী পরমাণু তুল্য মানুষ তার ‘ছোটখাট ছোট ব্যথা ছোট ছোট দুঃখ কথা’ নিয়ে কেমন নিশ্চিন্ত জীবন-যাপনে অভ্যস্ত। যতীনের চোখের সামনে এক

মহাজাগতিক কল্পলোকের প্রকাশ।” ৩৬

যতীনের চোখে এসব মহাজাগতিক কল্পলোকের বিষয় হলেও এই কল্পলোকের পরিসরে সেও আবদ্ধ। তাই, তাকেও পুনর্জন্ম নিতে হয়। পুনর্জন্মের বিষয় নিয়ে পরলোকবাসী এক আত্মা বলেন –

“জন্মে জন্মে আত্মা বল লাভ করে, জন্ম-জন্মান্তরের চিতার আগুনে

পুড়ে সে ক্রমশ নির্মল, শুদ্ধ, জ্ঞানী হয়ে ওঠে।” ৩৭

যতীন বিভিন্ন আত্মার সংস্পর্শে এসে পুনর্জন্মের তত্ত্ব ভালভাবে আত্মস্থ করে। তাকে আবার জন্ম নিতে হয় ‘অভয়’ নাম নিয়ে। পৃথিবীর মায়া ও মোহ পরিত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন বলেই মানুষকে মৃত্যুর পরেও আবার জন্ম নিতে হয়— একথা যতীন বিশ্বাস করে। এই বিশ্বাস শুধু নারক যতীনের নয়, তা হল ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণেরও।

ঔপন্যাসিক পুনর্জন্মে বিশ্বাসী বলেই তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে জন্মান্তরের ঘটনা দৃশ্যমান।

এখানে সমালোচক সন্তোষ কুমার দত্তের আরেকটি মন্তব্য উল্লেখনীয় –

“‘অপরাজিত’ উপন্যাসে পুত্র কাজলের মধ্যে বালক অপূর যেমন

পুনর্জন্ম, তেমনি এই উপন্যাসে অভয়ের মধ্যে যতীনের নবজন্মলাভ।

পথের পাঁচালী, অপরাজিত ও আরণ্যক—এ জগতের কল্পনা অনুরঞ্জিত,

সেই শব্দস্পর্শগন্ধ বর্ণনায় বিচিত্র ও মারাময় জগতে অভয়রূপী

যতীনের প্রত্যাবর্তন ‘দেবযান’ উপন্যাসের অন্যতম দিক।” ৩৮

ঔপন্যাসিক নিজেও বলেছেন –

“এখানে যারা জন্ম নেয়, তারা অনেক জন্ম ঘুরে এসেছে। পৃথিবীতে

বহু জন্ম কেটেচে এদের। শেষ জন্ম এখানে কাটায়।” ৩৯

জীবজগৎ কত গ্রহ নক্ষত্র পাড়ি দিয়ে বারবার এই পৃথিবীতে আসা যাওয়া করে মানুষ শুধু মুক্তির জন্যেই। লেখক বিশ্বাস করেন ‘বহুস্তর, বহুগ্রহ, মৃত্যুর পর সেখানে জীবের গতি হয়’ এবং সবকিছুই অদৃশ্যালোকের হাতের ইঁশারায় পরিচালিত হয়, একথা ভেবেই পুষ্পের মুখ দিয়ে বলেন –

“তুমি আমি, স্বর্গ নরক, জন্ম মরণ, দেব দেবী, ঈশ্বর, পাপপুণ্য,

দেশকাল – সবই তাঁর স্বপ্ন।” ৪০

এই ‘স্বপ্ন’ আসলে ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণের মনের অবাস্তব, কল্পনা প্রসূত— যা আধুনিক পরিবেশের সঙ্গে মানানসই নয়। আধুনিক যুগের আধুনিক ঔপন্যাসিক হয়েও সংস্কার, ঐতিহ্য, অবাস্তব, কল্পনাপ্রসূত বিষয় নিয়ে রচিত ‘দেবযান’ উপন্যাসটি লেখকের রুদ্ধদৃষ্টির বা রুদ্ধ মানসিকতারই পরিচায়ক।



উল্লেখপঞ্জি —

- ১। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিভূতি রচনাবলী - জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, ৪র্থ খণ্ড, 'স্মৃতির রেখা' দিনপঞ্জির বর্জিত অংশ, ১৪০৩, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃঃ ৬০৭।
- ২। তদেব — পৃঃ ৬০৯।
- ৩। তদেব — পৃঃ ৬০৯-১০।
- ৪। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিভূতি রচনাবলী - জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, ৩য় খণ্ড, 'স্মৃতির রেখা' ১৪০২, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃঃ ২৫৩।
- ৫। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৬১১।
- ৬। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিভূতি রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, ১ম খণ্ড, পথের পাঁচালী, ১৪০৩, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃঃ ৫২।
- ৭। তদেব — পৃঃ ৫৯।
- ৮। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিভূতি রচনাবলী - জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, ২য় খণ্ড, 'অপরাজিত' ১৪০২, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃঃ ১৬২।
- ৯। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিভূতি রচনাবলী - জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, ৩য় খণ্ড,

‘দৃষ্টিপ্রদীপ’, ১৪০২, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স,  
পৃঃ ২৩-২৪।

- ১০। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিভূতি রচনাবলী – জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, ৬ষ্ঠ খণ্ড,  
‘দেবদান’ ১৪০৩, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃঃ ২৭-২৮।
- ১১। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিভূতি রচনাবলী – জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, ৫ম খণ্ড,  
‘আরণ্যক’ ১৪০৩, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃঃ ১২৭।
- ১২। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিভূতি রচনাবলী – জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, ৯ম খণ্ড,  
‘ইছামতী’ ১৪০৪, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃঃ ৪৭।
- ১৩। তদেব—  
পৃঃ ৯৮।
- ১৪। তদেব—  
পৃঃ ৯৭।
- ১৫। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিভূতি রচনাবলী – জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, ১ম খণ্ড,  
‘চাঁদের পাহাড়’ ১৪০১, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স,  
পৃঃ ৪৪০।
- ১৬। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিভূতি রচনাবলী – জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, ৬ষ্ঠ খণ্ড,  
‘পথের পাঁচালী ও অপরাজিত’ খসড়ার টীকা, ১৪০৩,  
মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃঃ ৭২৩।
- ১৭। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিভূতি রচনাবলী – জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, ৪র্থ খণ্ড,  
সৌরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা চিঠিপত্র, ১৪০৩,  
মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃঃ ৬৩২।

- ১৮। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিভূতি রচনাবলী – জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, ৬ষ্ঠ খণ্ড,  
‘দেবযান’ ১৪০৩, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃঃ ৩৪।
- ১৯। তদেব – পৃঃ ৩৫।
- ২০। তদেব – পৃঃ ৩৪।
- ২১। তদেব – পৃঃ ৪৭।
- ২২। তদেব – পৃঃ ১০২।
- ২৩। তদেব – পৃঃ ৯০।
- ২৪। তদেব – পৃঃ ১০৭।
- ২৫। তদেব – পৃঃ ৩।
- ২৬। তদেব – পৃঃ ২৮।
- ২৭। তদেব – পৃঃ ২৯।
- ২৮। সন্তোষকুমার দত্ত : বিভূতিভূষণ : স্বকাল ও একাল, প্রথম প্রকাশ – ১৯৯৩,  
মহাদিগন্ত, পৃঃ ১৩৬।
- ২৯। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৩৪। ৭
- ৩০। তদেব – পৃঃ ১৩০।
- ৩১। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্র জীবনী-১ম খণ্ড, ১৯৬১, বিশ্বভারতী, পৃঃ ১৪২।
- ৩২। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৬১।
- ৩৩। তদেব – পৃঃ ১১১।
- ৩৪। তদেব – পৃঃ ১১৭।

- ৩৫। তদেব— পৃঃ ১১৮।
- ৩৬। সন্তোষকুমার দত্ত : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১৩০।
- ৩৭। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিভূতি রচনাবলী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, দেবযান, ১৪০৩, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃঃ ১৩২।
- ৩৮। সন্তোষকুমার দত্ত : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১৩৯।
- ৩৯। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১৫৭।
- ৪০। তদেব— পৃঃ ১৬৩।

## উপসংহার

বিশ শতকে বাংলার ঔপনিবেশিক রাজশক্তির করাল গ্রাস থেকে মুক্তির জন্য সমকালীন লেখক সম্প্রদায় বিভিন্ন পথ অবলম্বন করেন। সেই সময়ে কিছু লেখক রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী হয়ে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে ঔপনিবেশিক শক্তির বিরোধিতার নেমে পড়েন। অনেকে আবার ঔপনিবেশিক শক্তির সহযোগিতায় ঔপনিবেশিক আধুনিকতাকে গ্রহণ করে নতুন সমাজ গঠনে মনোনিবেশ করেন। কেউ করেন ঐতিহ্যের স্বীকৃতি, কেউ করেন ঐতিহ্যের পুনর্নির্মাণ। আরেকদল সাহিত্যিক রোমান্টিক জগতে ডুব দেন। ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ সে পথের পথিক না হয়ে এক স্বতন্ত্র ধারার সৃষ্টি করেন। তৎকালীন সময়ের ঔপনিবেশিক শক্তির করাল ছায়া, আধুনিকতা ও ঐতিহ্যকে স্বীকার করেও বিভূতিভূষণ গ্রাম বাংলার প্রকৃতির কাছে আশ্রয় নেন। প্রকৃতিই তাঁর উপন্যাসের মূল চাবিকাঠি এবং প্রকৃতির মধ্যেই তিনি খুঁজে পান মুক্তির দ্যোতনা। তাঁর কাছে আধুনিকতার পরিসরকে প্রকৃতিই চিহ্নিত করেছে।

বিভূতিভূষণের উপন্যাসের কথাবয়নে সমকালীন সমাজ-বাস্তবতা অর্থাৎ উপনিবেশ ও ঔপনিবেশিক মনন, আধুনিকতা, ঐতিহ্যপ্রীতি সমানতালে পরিস্ফুট। উপন্যাসের বয়নে ঔপনিবেশিক চেতনা থেকে আধুনিকতার পথে যাত্রা করলেও তাঁকে অনেকসময় মাঝপথে থমকে দাঁড়াতে হয়েছে। অনেকসময় দীর্ঘদিনের প্রচলিত সংস্কার রীতি-নীতি তথা ঐতিহ্যকে বিনির্মাণ করে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টাও করেছেন। এই প্রচেষ্টার সফলতা থাকলেও বিফলতার সংখ্যাও কম নয়। সংস্কারের গণ্ডিকে অতিক্রম করতে না পেরে রুদ্ধ মানসিকতারও পরিচয় দিয়েছেন।

সর্বোপরি আলোচনা সাপেক্ষে বলা যায়, ঔপনিবেশিক পরিসর এবং তা থেকে মুক্তির প্রয়াস, ঐতিহ্য ও আধুনিকতার দ্বন্দ্ব, আধুনিক মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তি হয়েও ধর্মীয় সংস্কারকে অতিক্রম করতে না পারা— এ সবই ছিল বিভূতিভূষণের উপন্যাসের কথাবয়নের মূল বিষয়বস্তু। এই বহুরৈখিকতা স্বীকার করেই বিভূতিভূষণের উপন্যাসগুলিকে এবং তাঁর মানসিকতার স্বরূপকে পুনর্মূল্যায়ন করা হয়েছে।

বাংলাদেশে ঔপনিবেশিক পরিকাঠামোয় সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে আধুনিকতার হোঁয়ায় নতুন জীবন পরিসরের সৃষ্টি হলেও মানুষের মনে দেখা দেয় দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব। মানুষ তার মনের মণিকোঠায় একদিকে লালন করে রাখে ঔপনিবেশিক চিন্তা ভাবনাকে আবার অন্যদিকে এই চিন্তা-ভাবনা থেকে মুক্তির জন্য চেষ্টা করে। এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব স্পষ্ট প্রকাশ পায় বিভূতিভূষণের ‘আরণ্যক’, ‘আদর্শ হিন্দু হোটেল’, ‘অনুবর্তন’ ও ‘অশনি সংকেত’ উপন্যাসের মধ্যে। ‘আরণ্যক’ উপন্যাসের মধ্যে নায়ক সত্যচরণ ঔপনিবেশিক শাসকের মত উপনিবেশ স্থাপন করার জন্য বন-জঙ্গল ধ্বংস করে নতুন বসতি স্থাপন করে। আবার, নতুন করে গাছ-পালা রোপনের জন্য যুগলপ্রসাদ নামে এক ব্যক্তিকে সত্যচরণ মাসিক মাহিনায় নিযুক্ত করে। প্রকৃতি ধ্বংস করার দুঃখে সত্যচরণ অরণ্যদেবতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। এই সময়ের মধ্যবিন্দু সমাজ পুরোপুরি ঔপনিবেশিকতাকে আত্মস্তু করতে পারেনি তেমনি পারেনি আধুনিকতাকেও গ্রহণ করতে। মধ্যবিন্দু শ্রেণীর প্রতিনিধি সত্যচরণের মনে যে দ্বিবাচনিক সত্তা ফুটে ওঠে, তা আসলে উপন্যাসিক বিভূতিভূষণের মানসিকতার পরিচায়ক। প্রথম অধ্যায়ের অন্যান্য উপন্যাসগুলিতেও স্পষ্ট প্রকাশ পেয়েছে মধ্যবিন্দু সমাজ সত্তার তথা সমকালীন মানবমনের অসীমাংশিত দ্বান্দ্বিক রূপ।

বিভূতিভূষণের ‘পথের পাঁচালী’ ও ‘অপরাজিত’ উপন্যাসদ্বয়ে লক্ষ করা যায় তাঁর মানসিকতা কিভাবে ঔপনিবেশিক মনন থেকে আধুনিক চেতনায় পর্যবসিত হয়েছে। ঔপন্যাসিকের প্রতিকল্প সত্তা অপু গ্রাম-বাংলার প্রকৃতির সঙ্গে একাকার হয়ে যেত। ঔপনিবেশিক শাসকদের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে গ্রাম্যসমাজে ভাঙন ধরে। ভাঙনের অভিঘাতেই অপু পিতা হরিহরের হাত ধরে গ্রাম নিশ্চিন্দীপুর ছেড়ে আধুনিকতার পীঠস্থান কলকাতায় পাড়ি দেয়। প্রকৃতি হচ্ছে বিভূতিভূষণের আধুনিকতার সোপান। প্রকৃতির মধ্যেই তিনি ঔপনিবেশিক পরিসর থেকে মুক্তির বাণী শুনতে পান। ‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাসে অপু নিশ্চিন্দীপুরের প্রকৃতির ডাক শুনতে পায়, যার পরিসমাপ্তি ঘটে ‘অপরাজিত’ উপন্যাসের বয়নের মধ্যে। উপন্যাসটির নায়ক অপু ঔপনিবেশিক মনন থেকে মুক্তির জন্য পুত্র কাজলকে সঙ্গে নিয়ে শহর কলকাতা থেকে বিদায় নিয়ে নিশ্চিন্দীপুর গ্রামের প্রকৃতির সঙ্গে একাকার হয়ে যায়। শহরের গণ্ডিবদ্ধ জীবনকে ত্যাগ করে গ্রাম্য পরিবেশের অতীতচারিতার মধ্যে অপু মুক্তির স্বাদ খুঁজে পায়। এই মুক্তির স্বাদের মধ্যে লেখকের মানসিকতা ঔপনিবেশিক মনন থেকে ফিরে আসে ঐতিহ্যভাবনায়।

কিন্তু লক্ষণীয় লেখক বিভূতিভূষণের মানসিকতা চিরকালীন রীতি-নীতি তথা ঐতিহ্যকে  
বিনির্মাণ করে আধুনিক জীবন পরিসরের দিকে অভিযাত্রার ইঙ্গিতও পাওয়া যায়। যুগ যুগ ধরে  
চলে আসা নিয়ম-নীতিকে উপন্যাসিক মনের মণিকোঠায় স্থবির করে না রেখে সমসাময়িক  
কালপ্রোতে বিনির্মাণ করেন। এই বিনির্মাণের ফলে যে নতুন চেতনার সৃষ্টি হয়, তা-ই ‘দৃষ্টি-  
প্রদীপ’, ‘কেদার রাজা’ ও ‘ইছামতী’ উপন্যাস তিনটিতে উপস্থাপন করেছেন। উনিশ শতক  
কিংবা তার পরবর্তী সময়ে বিশেষতঃ রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও কিছু ইংরেজ কৰ্ত্তাব্যক্তির  
প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ সহযোগিতার বাংলাদেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক স্তরে নব-আলোড়ন বা

নবজাগরণ ঘটে একথা আগেই বলা হয়েছে। এই নবজাগরণের প্রভাব অন্যান্য লেখক-বুদ্ধিজীবীর মত বিভূতিভূষণের মানসিকতাও প্রভাব বিস্তার করে। নবজাগরণের প্রভাবে বাংলায় জাত-পাত-ধর্মের সংকীর্ণ গণ্ডির পরিবর্তে এক উদার সমাজ ব্যবস্থার বা আধুনিক সমাজ গঠনের যে প্রক্রিয়া দেখা যায়— তা-ই লেখক বিভূতিভূষণ অঙ্কিত করেছেন উল্লিখিত উপন্যাস তিনটির বিভিন্ন কুশীলবদের মধ্যে। উপন্যাসিকের মানসিকতায় ধরা পড়েছে সমকালীন সমাজ ব্যবস্থার বাস্তব চিত্র।

পৃথিবীতে মানুষের আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই। কিন্তু জীবন পরিসরে এইসব আকাঙ্ক্ষা অনেক সময় পূরিত হয় না। আবার মানুষ যা চায় না, তা-ই অনেক সময় জীবন পরিসরে ঘটে যায়। ‘বিপিনের সংসার’ উপন্যাসে বিপিন-মানী কিংবা শান্তি জীবনে যা চেয়েছিল— তা পায়নি; তাদের জীবন পরিসরে ঘটে যায় অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা। ঠিক তেমনি নিধু, মঞ্জু কিংবা শশাঙ্কের কাঙ্ক্ষিত জীবনেও একথা সত্য। জীবন কোনও নির্দিষ্ট নিয়মে বা পথে চলেনা; চলে এলোমেলো ভাবেও। এর ফলেই জীবনে দেখা দেয় নানা দ্বন্দ্ব ও জটিলতা। এই তত্ত্বকথাকে বিভূতিভূষণ তাঁর ‘বিপিনের সংসার’, ‘দুইবাড়ি’ ও ‘অথৈজল’ উপন্যাসগুলির বিভিন্ন কুশীলবের মাধ্যমে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

‘দেবযান’-এ আবার লক্ষ করা যায় তার রুদ্ধ মানসিক চেতনা। লেখক সমসাময়িক রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক কিংবা নানা ঘাত-প্রতিঘাত বিধ্বস্ত পৃথিবীর বাস্তব হাওয়া থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার চেষ্টায় তৈরি করেন বিকল্প এক আধুনিকতার পরিসর ; যা প্রকৃতিকে নির্ভর করে প্রতিষ্ঠিত। তেমনি জঞ্জাল, ক্লেশাক্ত জীবন পরিসর থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তৈরি করেন এক কল্পলোকের কাহিনী। এই কল্পলোকের অবস্থান বাস্তব পৃথিবী থেকে



অনেক দূরে। ধর্মীয় চেতনাতেই একমাত্র এই কল্পলোকে যাওয়া সম্ভব। ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ দ্রষ্টাচক্ষু দিয়ে কিংবা পরাদৃষ্টির মাধ্যমে ‘দেবযান’ উপন্যাসে কল্পলোকের সেই কাহিনীকে অঙ্কন করেছেন। ধর্মীয় গোঁড়ামি ও অলৌকিকতাকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের নায়ক যতীন ও অন্যান্য কুশীলব পুষ্প, আশালতা দেবী, জনৈক সন্ন্যাসী ও অন্যান্য দেবতাদের মাধ্যমে ঔপন্যাসিক নিজের মনের কথাকেই উপন্যাসের প্রতিবেদনে তুলে ধরেছেন।

অলৌকিকতার বিষয়ে বিভূতিভূষণের সঙ্গে অন্যান্য লেখক সম্প্রদায়ের মৌলিক পার্থক্যও রয়েছে। অন্যান্যদের মধ্যে কেউ গ্রহণ করেছেন মনস্তাত্ত্বিক বিষয়, বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে কৌতুক ও ব্যঙ্গের ছোঁয়া কিংবা রোমান্স। বিভূতিভূষণের অলৌকিকতা ‘হিন্দুধর্মের সংস্কারমূলক উপাদান’ হিসেবে বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে সংগঠিত। এখানেই বিভূতিভূষণ অন্যান্যদের তুলনায় স্বতন্ত্র। তবে আধুনিকতায় বিশ্বাসী হয়েও ধর্মীয় গোঁড়ামিকে গ্রহণ করে ঔপন্যাসিক দৃষ্টির রুদ্ধতাকেই প্রকাশ করেছেন।

বিভূতিভূষণ তার সাহিত্যে গ্রাম-বাংলার সাধারণ জনসাধারণের চাল-চলন, আচার-ব্যবহারের কথা যেমন বলেছেন তেমনি তুলে ধরেছেন শহুরে সংস্কৃতি ও মানসিকতা। বিশ শতকের ঔপনিবেশিক শাসন প্রক্রিয়ার প্রভাব, সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলনের প্রভাবও তাঁর উপন্যাসের প্রতিবেদনে স্থান পেয়েছে। এছাড়াও বিশ্বযুদ্ধের কথা, মন্বন্তর কিংবা দুর্ভিক্ষ, মধ্যবিভ্র সমাজের জটিল মনের দ্বন্দ্ব, উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ সংঘাত-মিলন তাঁর লেখনীর তুলিতে সুন্দরভাবে পরিস্ফুট।

এসব ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেই মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণের সফলতা ও ব্যর্থতার ছবি এঁকেছেন নিখুঁত ভাবে। আবার ঐতিহ্যকে স্বীকার কিংবা ঐতিহ্যকে বিনির্মাণ করে

‘আধুনিকতা’ নামক পরিসরের দিকে অভিযাত্রার পরিচয়ও তাঁর উপন্যাসের বয়নে প্রতিফলিত। তবে ঔপনিবেশিক পরিসরেই ঐতিহ্যের বিনির্মাণ ঘটিয়ে আধুনিকতার যাত্রা শুরু হয়। এর ফলে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মধ্যে এক-ধরনের দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। এই দ্বন্দ্ব-ই তৎকালীন সমাজচেতনার বাস্তব স্বরূপ যা তাঁর উপন্যাসেও প্রতিফলিত হয়েছে। বিভূতিভূষণ যেমন আধুনিক মননের পরিচয় রেখেছেন তার সাহিত্যে, তেমনি খুব স্বাভাবিক ভাবেই ফিরে দেখেছেন ঐতিহ্যকে। এ জন্যেই বলা যায়, বিভূতিভূষণ সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আধুনিকতার পথে যাত্রা করেও ঐতিহ্যের শেকড় সজ্জানী।

## গ্রন্থপঞ্জি —

ক. মূলগ্রন্থ

বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ : বিভূতি রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ ;

প্রথম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, ১৪০১

দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, ১৪০২

তৃতীয় খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, ১৪০২

চতুর্থ খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, ১৪০৩

পঞ্চম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, ১৪০৩

ষষ্ঠ খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, ১৪০৩

সপ্তম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, ১৪০৪

অষ্টম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, ১৪০৪

নবম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, ১৪০৪

দশম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, ১৪০৪

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কল - ৭৩।

খ. প্রাসঙ্গিক সহায়ক গ্রন্থ (বাংলা)

আচার্য, দেবেশ কুমার (সম্পাদিত)

কবিরাজ, নরহরি

: প্রবন্ধ বিচিত্রা, ২০০৫, বামা পুস্তকালয়, কল - ৭৩।

: স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা, ষষ্ঠ প্রকাশ, ১৯৯৯,

মনীষা গ্রন্থালয়, কল - ৭৩।

- কবিরাজ, নরহরি : উনিশ শতকের বাঙলার জাগরণ তর্ক ও বিতর্ক, ১৯৮৪, কে.পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা।
- কুমার, মদনমোহন : অশনি সংকেত : আলোচনা, ১৪১২, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কল - ৭৩।
- গঙ্গোপাধ্যায়, দুর্গাপদ ও সুনীল কুমার দে : পথের পাঁচালী-যুগ্ম সমীক্ষা, ২০০০, বামা পুস্তকালয়, কল - ১২।
- গঙ্গোপাধ্যায়, পাথজিৎ : প্রসঙ্গ : পথের পাঁচালী, ২০০২, পাণ্ডুলিপি, কল - ৭৩।
- গুপ্ত, ক্ষেত্র : বঙ্কিমচন্দ্র : আধুনিক মন, ১৯৮৯, পুস্তক বিপণি, কল-৯।
- গুপ্ত, রবীন্দ্র : উপন্যাস জিজ্ঞাসা, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৫, গ্রন্থ নিলয়, কল-৯।
- গুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ : উপন্যাস প্রসঙ্গে, ১৯৭১, তুলিকলম, কলকাতা।
- গোলাম, মুরশিদ : হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি, ২০০৬ (পুনর্মুদ্রণ), নয়া উদ্যোগ, কলকাতা।
- ঘোষ, বিনয় : বাংলার বিদ্বৎ সমাজ, ১৯৭৩, প্রকাশভবন, কলকাতা।
- ঘোষ, বিনয় : বাংলার নবজাগৃতি, ১৩৯১, ওরিয়েন্ট লংম্যান, কলকাতা।
- ঘোষাল, জয়ন্ত কুমার : বাংলা উপন্যাসে সমাজ বাস্তবতা, ১৯৯২, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯।
- চক্রবর্তী, দীপঙ্কর : বাংলার রেনেসাঁস এবং রামমোহন, ১৯৯০, পিপলস বুক সোসাইটি, কলকাতা।
- চক্রবর্তী, সাকিন্দ্রীনন্দ : আধুনিক বাংলা ছোটগল্প মূল্যবোধের সংকট, ২০০৪, পুস্তক বিপণি, কল-৯।

- চক্রবর্তী, সুমিতা : উপন্যাসের বর্ণমালা, দ্বিতীয় সং-২০০৩, পুস্তক বিপণি, কল-৯।
- চক্রবর্তী, সুধীর : পথের পাঁচালী উপন্যাস ও চলচ্চিত্র (গ্রন্থপদ, বার্ষিক সংকলন-১০), ২০০৬, পুস্তক বিপণি, কল-৯।
- চট্টোপাধ্যায়, দেবব্রত (সম্পাদনা): বিংশ শতাব্দীর সমাজ বিবর্তন : বাংলা উপন্যাস, ২০০২  
দে'জ পাবলিশিং, কল-৭৩।
- চট্টোপাধ্যায়, ব্রজদুলাল (অনুবাদক): স্বাধীনতা সংগ্রাম, ১৯৭৩, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, নয়া দিল্লী।
- চট্টোপাধ্যায়, সুনীলকুমার : বিভূতিভূষণ : জীবন ও সাহিত্য, প্রথম প্রকাশ- ১৯৯৫,  
সাহিত্যায়ন, কলকাতা-৯।
- চট্টোপাধ্যায়, সুনীলকুমার : বাংলার নবজাগরণে উইলিয়াম কেরী ও তার পরিজন,  
১৯৭৪, রত্ন প্রকাশন, কলকাতা।
- চট্টোপাধ্যায়, সুহাস (সম্পাদনা): মার্কসবাদ ও নন্দনতত্ত্ব, ১৯৯০, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক  
পর্ষদ, কলকাতা-১৩।
- চট্টোপাধ্যায়, হীরেন : বাংলা উপন্যাসের শিল্পরীতি, ১৯৮২, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য  
পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা-১৩।
- চৌধুরী, নীরদ চন্দ্র : বাঙালী জীবনে রমনী, ১৯৬৮, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স  
প্রাঃলিঃ, কলকাতা-৭৩।
- চৌধুরী, ড. বীথিকা : আধুনিক বাংলা ছোটগল্প ও গল্পকার প্রেমেন্দ্র মিত্র,  
২০০০, অক্ষর পাবলিকেশনস্, আগরতলা।
- চৌধুরী, ভূদেব : বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (দ্বিতীয় পর্যায়), তৃতীয় সং- ১৯৬৪,

বুকল্যাণ্ড প্রাঃ লিঃ, কলকাতা-৬।

- চৌধুরী, সিদ্ধার্থ রঞ্জন : শিল্পীর দায় ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৯৫, উবুদ্ধ  
(সম্পাদনা) প্রকাশনী, কলকাতা-১২।
- চৌধুরী, সুজিত : নির্বাচিত প্রবন্ধ, ২০০৩, অক্ষর পাবলিকেশনস, কল-১২।
- জানা, সমরেন্দ্র : আধুনিক যুগদৃষ্টিতে শরৎসাহিত্যের সমস্যাবলী, ১৯৮২, পুষ্টিপত্র,  
কলকাতা-৯।
- দত্ত, ড. অসিতকুমার : ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নবজাগরণ ও রবীন্দ্রনাথ, প্রথম  
প্রকাশ- ১৯৯৭, পুনশ্চ, কলকাতা-৯।
- দত্ত, রমেশচন্দ্র : বাংলার কৃষকসমাজ, ১৪০৩, দীপায়ন, কলকাতা-৯।
- দত্ত, সন্তোষকুমার : বিভূতিভূষণঃ স্বকাল ও একাল, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৩, মহাদিগন্ত,  
কলকাতা-২।
- দাস, উদয়চাঁদ : কবি তারাশঙ্কর ও তারাশঙ্করের কবি, ১৯৯৮, পুস্তক বিপণি,  
কলকাতা-৯।
- দাস, বেলা : বাংলা উপন্যাসের উন্মেষপর্ব, ১৯৯৯, সাহিত্যলী পাবলিশার্স,  
কলকাতা-৯।
- দাস, রঞ্জনকুমার (সম্পাদনা) : শনিবারের চিঠি (রামমোহন সংখ্যা), পুনর্মুদ্রণঃ নাথ পাবলিশিং,  
কলকাতা-২৯।
- দে, অশোক কুমার : বাংলা উপন্যাসের উৎস-সিদ্ধানে, ১৯৭৪, জিজ্ঞাসা, কলকাতা।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিন্দিতা : প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্প মননে ও সৃজনে, ২০০৫, পুস্তক

বিপণি, কলকাতা-৯।

বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণ (সম্পাদক) : শতবর্ষের আলোকে বিভূতিভূষণ, ১৯৯৬, উথক প্রকাশনী,  
কলকাতা-৬০।

বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিত : বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, ১৯৯০, মডার্ন বুক এজেন্সী  
প্রাঃ লিঃ, কলকাতা-৭৩।

বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিত : বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর, ১৯৯১, দে'জ পাবলিশিং, কল-৭৩।

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার : বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, ১৯৯২, মডার্ন বুক এজেন্সী  
প্রাঃ লিঃ, কলকাতা-৭৩।

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার : বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা (আধুনিক যুগ), ১৪০০ ওরিয়েন্ট  
বুক কোঃ, কলকাতা-৭।

বন্দ্যোপাধ্যায়, চৈতালী : উপন্যাসে আঙ্গিক বিভূতিভূষণ ও তারাকঙ্কর, ১৯৯০, রত্নাবলী,  
কলকাতা-৯।

বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়ন্ত : শরৎ সাহিত্যে ব্যক্তি ও সমাজ, ১৪০৬, বঙ্গপ্রকাশনী, কলকাতা-৯।

বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম : উপন্যাস রাজনৈতিক : বিভূতিভূষণ, ১৯৯২, র্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন,  
কলকাতা-৯।

বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম : উপন্যাসের সমাজতত্ত্ব, ১৯৯৪, র্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কল -৯।

বন্দ্যোপাধ্যায়, রণজিৎ : উনিশ শতকে নারীমুক্তি আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য, প্রথম  
প্রকাশ - ১৯৯৯, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯।

বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ : বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, ১৯৮৮, দে'জ পাবলিশিং, কল -৭৩।

- বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ : বাংলা উপন্যাস : দ্বন্দ্বিক দর্পণ, ১৯৯৬, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা  
আকাদেমি, কলকাতা।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. সুকুমার : বাংলা উপন্যাসে মনস্তাত্ত্বিকতা, ১৯৯৪, জিজ্ঞাসা এজেন্সিজ  
লিমিটেড, কলকাতা-৯।
- বসু, স্বপন, : বাংলার নবচেতনার ইতিহাস, তৃতীয় সং, ২০০৩, পুস্তক বিপণি,  
কলকাতা-৯।
- বসু, স্বপন : উনিশ শতকে স্ত্রী শিক্ষা, ১৪১২, কলীর সাহিত্য পরিষদ, কল - ৬।
- বসু, স্বপন : সমকালে বিদ্যাসাগর, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৩, পুস্তক বিপণি,  
কলকাতা-৯।
- বসু, স্বপন ও ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী (সম্পাদিত): উনিশ শতকের বাঙালি জীবন ও  
সংস্কৃতি, ২০০৩, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯।
- বসু, স্বপন ও হর্ষ দত্ত (সম্পাদিত): বিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি, ২০০০, পুস্তক  
বিপণি, কলকাতা-৯।
- বিশী, শ্রী প্রমথনাথ : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প, ১৩৭৮।
- বেবেল, আগষ্ট (মূল) : নারী অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, ১৯৯০, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি,  
কলকাতা-৭৩।
- বোভেয়ার, সিমন্ দ্য, ভাবান্তর - লতিকা গুহ : স্ত্রীলিঙ্গ, ২০০১, দীপায়ন, কলকাতা-৯।
- ভট্টাচার্য, অসিতকুমার : বাংলার নবযুগ ও বকিমচন্দ্রের চিন্তাধারা, ১৯৬৪, গ্রন্থ জগৎ,  
কলকাতা।



- ভট্টাচার্য, উপেন্দ্র চন্দ্র : ভারতের নারী, ১৩৭৬, মডার্ন বুক্‌স্‌ অ্যাং প্রাঃ লিঃ, কলকাতা-১২।
- ভট্টাচার্য, তপোধীর : আধুনিকতা : পর্ব থেকে পর্বান্তর, ১৯৯৫, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯।
- ভট্টাচার্য, তপোধীর : উপন্যাসের ভিন্নপাঠ, ১৪১২, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-৯।
- ভট্টাচার্য, তপোধীর : প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব, ১৯৯৭, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, মেদিনীপুর-০১।
- ভট্টাচার্য, তপোধীর : বাখতিন তত্ত্ব ও প্রয়োগ, ১৯৯৬, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯।
- ভট্টাচার্য, তপোধীর : নিবিড় পাঠের নন্দন, ২০০২, অক্ষর পাবলিকেশনস্‌, আগরতলা।
- ভট্টাচার্য, তপোধীর : মিশেল ফুকো, তাঁর তত্ত্ববিশ্ব, ১৯৯৭, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, মেদিনীপুর-০১।
- ভট্টাচার্য, দেবীপদ : উপন্যাসের কথা, ১৯৮২, ১ম পর্ব, ২য় জি.এ.ই সংস্করণ।
- ভট্টাচার্য, ড. নরেন্দ্রনাথ : ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, তৃতীয় মুদ্রণ ১৯৯১, জেনারেল প্রিঃ র্যাঃ পাঃ প্রাঃ লিঃ, কলকাতা-১৩।
- ভট্টাচার্য, নৃপেন্দ্র : বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস, ২য় সংখ্যা ১৩৯০, মডার্ন বুক্‌স্‌ এং প্রাঃ লিঃ, কলকাতা-৭৩।
- ভট্টাচার্য, ব্রজেন্দ্র চন্দ্র : সাহিত্য ও পাঠক, বামা পুস্তকালয়, কলকাতা-৭৩।
- ভট্টাচার্য, মালিনী : নির্মাণের সামাজিকতা ও আধুনিক বাংলা উপন্যাস, ১ম দেহজ সং, ১৯৯৬, দেহজ পাবলিশিং, কল-৭৩।

- ভট্টাচার্য, সুকুমারী : প্রাচীন ভারতের সমাজ ও সাহিত্য, ১৩৯৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-৯।
- ভট্টাচার্য, সুতপা : কথা সাহিত্যের একলা পথিক বিভূতিভূষণ, ১৯৯৫, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯।
- মজুমদার, ড. বিশ্বজীবন : রবীন্দ্র উপন্যাস দেশ ও কাল, ১৩৮৮, পপুলার লাইব্রেরী, কলকাতা-৬।
- মজুমদার, সমীরণ : আধুনিকতা শিল্প ও সাহিত্যে, ১৯৯৬, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, মেদিনীপুর-০১।
- মণ্ডল, সুধাংশুশেখর : উপন্যাস পরিক্রমা : বিভূতিভূষণের অশনি সংকেত, ২০০৫, বামা পুস্তকালয়, কলকাতা-৭৩।
- মল্লিক, দীপঙ্কর : বিভূতিভূষণের অশনি সংকেত, ২০০৫, দে'জ পাবলিশিং, কল-৭৩।
- মাজি, ড. উমা : উনিশ শতকের প্রথমপাদে বঙ্গসমাজ ও সাহিত্যে ভাব-সংঘর্ষ, ১৯৯৭, দে'জ পাবলিশিং, কল-৭৩।
- মামুন, মুনতাসীর (সম্পাদক) : চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাঙালি সমাজ, পরিবর্তিত নতুন সংস্করণ, ২০০২, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।
- মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার : মধ্যাহ্ন থেকে সায়াহ্নে - বিংশ শতাব্দীর বাংলা উপন্যাস, ১৯৯৪, দে'জ পাবলিশিং, কল-৭৩।
- মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার : কালের প্রতিমা, ১৯৯১, দে'জ পাবলিশিং, কল-৭৩।
- মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার : রবীন্দ্র জীবনী-১ম খণ্ড, ১৯৬১, বিশ্বভারতী, কলকাতা-৭।

- মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার : রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য, ১৩৯৪, বিশ্বভারতী  
গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা-৭।
- মুখোপাধ্যায়, সুবোধকুমার : বাংলার আর্থিক ইতিহাস (বিংশ শতাব্দী), ১ম প্রকাশ-১৯৯১,  
কেঃপিঃ বাগচী অ্যান্ড কোঃ, কলকাতা।
- মুখোপাধ্যায়, সুবোধকুমার : মধ্যবিত্ত ও তার মানসলোক, প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা।
- রায়, অর্জুন (সম্পাদিত) : তিনভুবন (বিভূতিভূষণ পর্ব), ১৯৯৯, প্রয়াস, কলকাতা-৩৭।
- রায়, অন্নদাশঙ্কর : বাংলা সঙ্কলন গ্রন্থ - 'যুগ জিজ্ঞাসা' প্রবন্ধ, কলকাতা  
বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ. কোর্সের জন্য।
- রায়, অপূর্ব কুমার : উনিশ শতকের গদ্য সাহিত্য : ইংরেজি প্রভাব, ১৯৮৯, জিজ্ঞাসা,  
কলকাতা।
- রায়, দেবেশ : উপনিবেশের সমাজ ও বাংলা সাংবাদিক গদ্য, ১৯৯০, প্যাপিরাস,  
কলকাতা।
- রায়, দেবেশ : উপন্যাস নিয়ে, ১৯৯১, দে'জ পাবলিশিং, কল-৭৩।
- রায়, দেবেশ : উপন্যাসের নতুন ধরনের খোঁজে, ১৯৯৪, প্রতিক্ষণ, কলকাতা।
- রায়, প্রদীপ : উনিশ শতক : প্রথমার্ধ কলকাতা সমাজ দ্বন্দ্ব ও মিলন,  
১৯৮২, বুক ট্রাস্ট, কলকাতা-৯।
- রায়, সত্যেন্দ্রনাথ : বাংলা উপন্যাসে আধুনিকতা, ১৩৯৩, গ্রন্থালয়, কলকাতা।
- রায়, সত্যেন্দ্রনাথ : বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০০,  
দে'জ পাবলিশিং, কল-৭৩।

- রায়, সত্যেন্দ্রনাথ : শিল্প সাহিত্যে দেশকাল, ১৯৮১, দে'জ পাবলিশিং, কল-৭৩।
- রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ : বিভূতিভূষণ : মন ও শিল্প, ১৯৯৬, দে'জ পাবলিশিং, কল-৭৩।
- রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ : বাংলা কথাসাহিত্যে প্রকরণ ও প্রবণতা, ১৯৯১, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯।
- লাহা, ভাগৎ : সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ২০০৫, বঙ্গা পুস্তকালয়, কলকাতা-৭৩।
- লাহিড়ী, কার্তিক : বাস্তবতা ও বাংলা উপন্যাস, ১৯৭৪, সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা।
- লাহিড়ী, কার্তিক : বাংলা উপন্যাসের রূপকল্প ও প্রযুক্তি, ১৩৭৯, সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা।
- লাহিড়ী, কার্তিক : সৃজনের সমুদ্র মন্ডন, ১৯৮৪, অন্বেষা, কলকাতা-৪২।
- শ, ড. রামেশ্বর : আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি ও বিবিধ প্রসঙ্গ, প্রথম প্রকাশ - ২০০৬, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯।
- শাস্ত্রী, শিবনাথ : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, ১৯৮৩, নিউ এজ পাবলিশার্স, কলকাতা-৭৩।
- সরকার, সুশোভন : বাংলার রেনেসাঁস, ২০০৪, দীপায়ন, কলকাতা-৯।
- সান্যাল, অরুণ (সম্পাদক) : প্রসঙ্গ বাংলা উপন্যাস, ১৯৯১, ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা।
- শিকিয়ার, অশ্রুঙ্কুমার : সাহিত্যের সমাজ, প্রথম প্রকাশ-২০০৫, পুস্তক বিপণি, কল-৯।
- সেন, অঞ্জন ও উদয় নারায়ণ সিংহ (সম্পাদক) : উপন্যাসের সাহিত্যতত্ত্ব, ১৩৯৭, গাঙ্গেরপত্র, কলকাতা।

- সেন, অরুণ (সম্পাদ্য) : বিভূতিভূষণ : আধুনিক জিজ্ঞাসা, দ্বিতীয় সং ২০০৩, সাহিত্য  
অকাদেমি, জীবনভারা, কলকাতা-৫৩।
- সেন, রুশতি : বিভূতিভূষণ : স্বপ্নের বিন্যাস, ১৯৯৩, প্যাপিরাস, কলকাতা।
- সেন, সুকুমার : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৩য় খণ্ড), প্রথম আর্নল্ড সং  
১৪০১, আঃপাঃপ্রাঃলিঃ, কলকাতা-৯।
- সেন, সুনীল ও প্রদীপ সিংহ (সম্পাদ্য) : বাংলার আর্থিক ও সামাজিক ইতিহাস, ১৯৭৪,  
চ্যাটার্জী পাবলিশার্স, কলকাতা।
- সুর, নিখিল : ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পটভূমি, ১৯৮৯, পশ্চিমবঙ্গ  
রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা-১৩।
- হালদার, গোপাল : বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা, দ্বিতীয় খণ্ড-১৩৬৫, এ. মুখার্জী  
অ্যান্ড কোং, প্রাঃলিঃ, কলকাতা-১২।
- হাসান, বদরুল : উনিশ শতক : নবজাগরণ ও বাঙলা উপন্যাস, প্রথম প্রকাশ-  
১৯৯০, জগৎমাতা পাবলিশার্স, কলকাতা-৯।
- গ. ইংরেজি
- Chatterjee, Sisir : The Novel As the Modern Epic.
- Clark, T.W. : The Novel in India, Its birth and Development ;  
1970, London, George Allen & Unwin.
- Duttgupta, Bela : Contemporary Social Problem in India ; 1964,  
Calcutta.

- Eliot, George : An Introduction to the English Novel , Vol:1.
- Forster, E.M. : Aspects of the Novel ; 1982, Penguin Books, Newyork.
- Fox, Ralph : The Novel and the People, 1954, Moscow Ed.
- Nehru, Jawaharlal : An Autobiography ; 1949, London.
- Sen, Amit : Notes on the Bengal Renaissance ; 1957, National Book Agency, Calcutta.
- Sen, Priyaranjan : Western Influence in Bengali Literature ; 1996, Accademic Publishers.

ঘ. প্রবন্ধ - পত্রিকা

১. প্রমা, কলকাতা, ত্রয়োদশবর্ষ, ১ম সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর নব্বই, মার্চ, ১৯৯১; প্রবন্ধ, দত্ত বসু, শর্মিলা - 'নারীর আত্মস্বাতন্ত্র্যবোধ : বাংলা উপন্যাস' (১৮৬৪ - ১৯৪১)
২. রবিবাসরীয়া, আনন্দবাজার পত্রিকা, কল - ২৮-৮-৮১ ; প্রবন্ধ - ভট্টাচার্য, শঙ্করলাল : উপন্যাসের আকার ও প্রকার।
৩. 'মৈত্রয়নী' প্রথম সংখ্যা, উঃ বঃ বিঃ, ২য় বর্ষ, ১৩৯৬, প্রবন্ধ - মুখোপাধ্যায়, সুবোধ কুমার :-বাঙালী মধ্যবিত্ত : উদ্ভব ও জন্মবিকাশ।
৪. রায়চৌধুরী, সমীর (সম্পাদক) : পোস্টকলোনিয়ালিজম : উত্তর ঔপনিবেশিকতা, হাওরা উনপঞ্চাশ, প্রথম প্রকাশ - ১৯৯৬, কল-৭৩;
৫. আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৬.৮.০৫, পৃঃ ৪ ; প্রবন্ধ- সেন, শিন্যাদিত্য : পথের পাঁচালী ।

### ঙ. অভিধান

- চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ (সম্পাদনা) : বাংলা কী লিখবেন কেন লিখবেন, আনন্দবাজার পত্রিকা  
ব্যবহার বিধি, ১৯৯৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট  
লিমিটেড।
- মিত্র, সুবলচন্দ্র (সংকলিত) : সরল বাঙ্গালা অভিধান, ১৯৭১, নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাঃ  
লিঃ, কলকাতা।